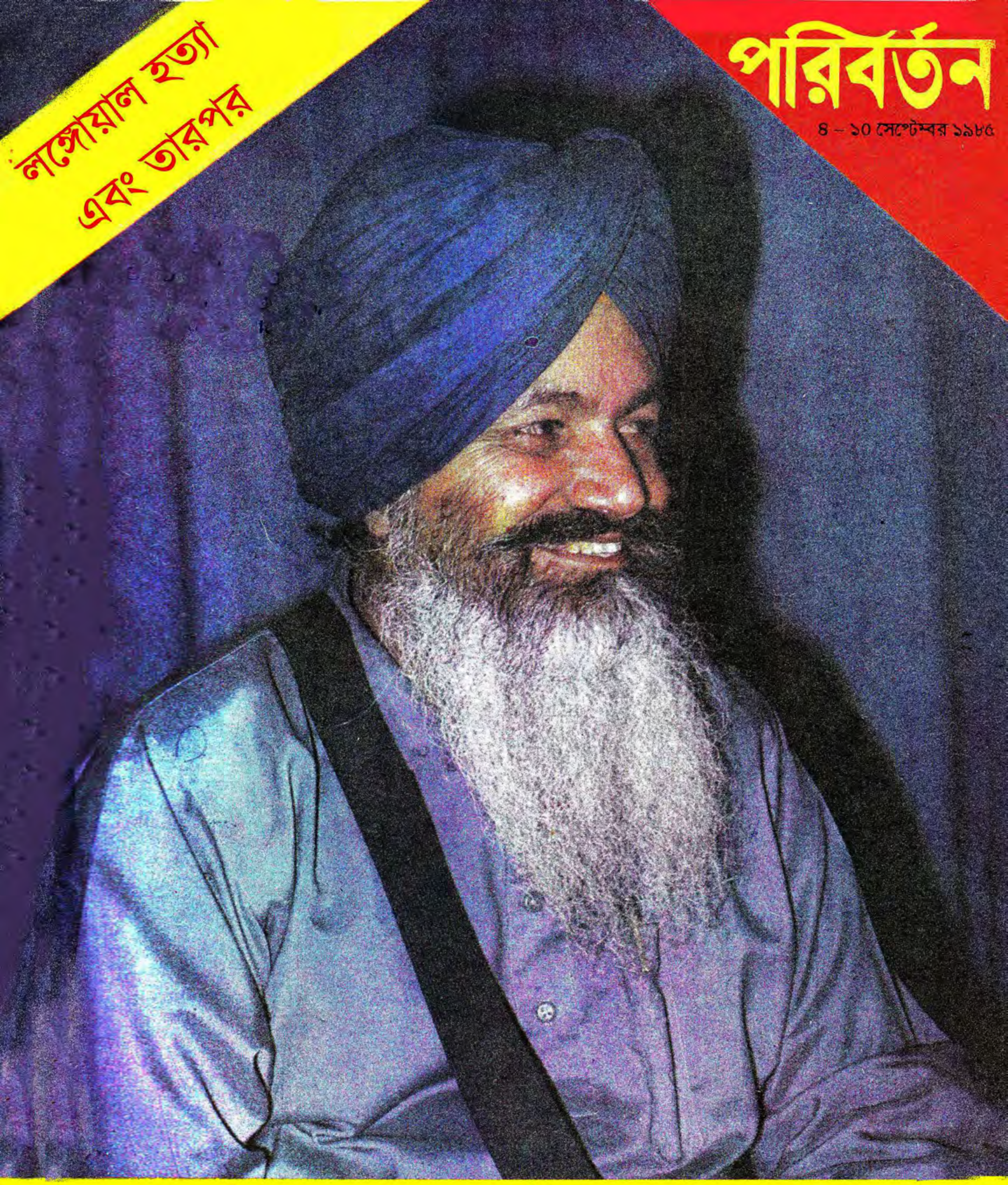
পরিবর্তন

৪ – ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

লঙ্গোয়াল হত্যা এবং তারপর



মস্কো যুব উৎসবে ১৭জন ভারতীয় গ্রেপ্তার হলেন কেন?

কাশীর বিধবারা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


খাটা খাটনি তো সবার লেগেই আছে! আমার স্বামীর অফিস, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, আর আমার হাট-বাজার করা। তাই আমরা নিয়ম করে অন্তত হরলিকস টুকু রোজ সবাই খাই।
হরলিকস আমাদের পরিবারের সকলেরই সাথী।
হরলিকস ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
Piccadily Restaurant
KAMAL READYMADE
HTD-HMM-8072BEN

আপনার সন্তানকে জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ করবার একমাত্র পন্থা

চিলেড্রন্স নলেজ ব্যাংক

খন্ড ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫

ছোটদের বৌদ্ধিক বিকাশ তখনই ভাল হতে পারে যখন পাঠ্য পুস্তক পড়া ছাড়া তার কিশোর মনের মধ্যে জাগা 'কেন?' এবং 'কি করে?' এই ধরনের শত সহস্র প্রশ্নের সমুচিত উত্তর তাকে ঠিক সময় উপলব্ধ করাতে পারা যায়।



চিলেড্রন্স নলেজ ব্যাংক
খন্ড ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫



ডবল ক্রাউন সাইজ
প্রতিটিতে ২৩২ পৃষ্ঠা

Price
Rs 20/- each
Postage
Rs 4/-

'ছোটদের জন্য বিশেষভাবে খুঁজে খুঁজে একত্রিত করার নিমিত্ত এক দল বিশেষজ্ঞ এই কাজে নিযুক্ত আছেন।'

আনুমানিক প্রত্যেকটি খন্ডে ২০০টি প্রশ্ন আছে, তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্নের নমুনা ঃ

বল পেন কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল? ● চীনামাটি কি জিনিষ? ● আমাদের ক্ষুধা পায় কেন? ● পৃথিবীর সব থেকে কর্ম ব্যস্ত বিমান-বন্দর কোনটি? ● আগুন নেভানো হয় কেমন করে? ● নরমাংসভোজী মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছে কি? ● খেলোয়াড় পেলেকে 'কালো হীরে' বলা হয় কেন? ● পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং কোনটি? ● তিমিমাছ মাছ নয় কেন? ● আমরা ১লা এপ্রিলকে 'ফুলসডে' বা বেকার দিন বলি কেন? ● সমুদ্রের জল শুকিয়ে যায় না কেন? ● 'ডিজনী ল্যান্ড' কোথায়? ● তাজমহল কেন নির্মীত হয়েছিল? ● কস্তুরী-মৃগ কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ● বাঁশের পরিচয় কি গাছ না ঘাস? ● ব্রহ্মান্ড জন্মাল কোথা থেকে? ● পৃথিবীটা কত পুরানো? ● মানুষ বুড়ো হয় কেন? ● এলার্জি কি জিনিষ? ● ক্যালান্ডার তৈরি হল কী করে? ● রুশ বিপ্লব কী ছিল? ● মূল্যবান রত্ন কি কি? ● হাসপাতাল কখন থেকে চালু হয়েছিল? ● শরীরে শিরা ও ধমণীর কাজ কী? ● গভীর সমুদ্রে ডুবুরীরা কিভাবে কাজ করে? ● অন্তঃসলিলা নদী কাকে বলে? ● উড়ন্ত বিমানের উচ্চতা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? ● 'অতি বেগুণী' রশ্মি' কাকে বলে? ● 'পরমাণু ঘড়ি' কাকে বলে? ● 'ভারশূন্যতা' কাকে বলে? ● 'মাইক্রোফোন' কিভাবে কাজ করে? ● 'টেলিপ্রিন্টার' কিভাবে কাজ করে?



Postage FREE on any 2 Books

Also on Sale
English Edition of
Vol. I, II, III, IV & V
Price and
Pages same
Double crown size
Approximately **240** Pages each

AVAILABLE AT leading bookshops. A.H. Wheeler's and Higginbothams Railway Book stalls throughout India or ask by V.P.P. from.

PUSTAK MAHAL Khari Baoli, Delhi-110006

New Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi-110002

TELEX: 031—61790 SBP IN



"আপনি কি আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসেন? দাড়ান! দাড়ান। ভুল বুঝবেন না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রেসার কুকার নিয়ে আর সেটা আপনার স্ত্রীর-ই সুরক্ষার জন্যে। যদি আপনার স্ত্রীকে অল্প ভালবাসেন, তাহলে যে কোন প্রেসার কুকার কিনে দিতে পারেন। যদি তার থেকে একটু বেশীই ভালবাসেন তাহলে আরও ভাল প্রেসার কুকার কিনে দিন। কিন্তু যদি আপনার প্রাণের থেকেও তিনি প্রিয় হন, তাহলে নিশ্চই প্রেস্টীজ প্রেসার কুকার কিনে দিতে হবে।

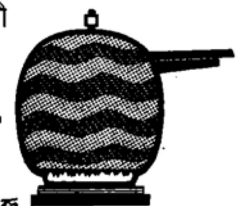


এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রেস্টীজই বা কেন?



এইজন্য যে গাস্কেট রিলীজ সিস্টেম নতুন প্রেস্টীজকে ১০০% নিরাপদ করেছে। এই অভিনব গাঃ রিঃ সিঃ কিভাবে কাজ করে দেখুন।

যদি খাবার জমে ওয়েট – ভালভের মুখ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ প্রেসার কুকারে স্বাভাবিকের বেশী প্রেসার তৈরী হয়ে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু নতুন প্রেস্টীজে, যদি সেফটি-ভালভ ও অকেজো হয়ে যায়, তাহলেও ভেতরের অতিরিক্ত ভাঁপ গাঃ রিঃ সিঃ দ্বারা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং আপনি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। সেজন্য নতুন প্রেস্টীজকে নিয়ে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই।"



যদি বৌকে সত্যিই ভালবাস
তাহলে প্রেস্টীজই নিয়ে এস



প্রেস্টীজ

ttk উৎপাদন

Prestige 25 SILVER JUBILEE 1984-85

শুধুমাত্র প্রেস্টীজই ১00% নিরাপদ। একমাত্র প্রেস্টীজেই আছে গাঃরিঃসিঃ।

MAA (S) TTP 3C BEN 85

পরিবর্তন

৪—১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১০

প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা

বিমান মাশুল ঃ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা



বার্ধক্যে বারাণসী। বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি



মস্কো যুব-উৎসবে ভারতীয় যুব-প্রতিনিধি

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদে লঙ্গোয়ালের রঙিন ফটো ঃ অশোক বসু

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অশোক চৌধুরী

সম্পাদক ঃ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-উপদেষ্টা ঃ নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস ঃ ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিন্সেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭২

চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ ঃ সি এইচ বসু, কলকাতা

দিললি অফিস ঃ জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন ঃ ওয়াই এ শেঠি। জনসংযোগ ঃ শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০ ০০১, ফোন ঃ ৩৩১-৭০২৪

বোম্বাই প্রতিনিধি ঃ ভি সত্যমূর্তি ঃ ফ্ল্যাট নং ১, বিল্ডিং নং ৪, টুইনকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেমবুর, বোম্বে ৪০০ ০৭১, ফোন ঃ ৫৫১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২

নিবেদনমিদং

পরিবর্তন-এর আরেকজন লেখিকা মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। প্রিয়দর্শিনী, স্বল্পভাষিণী মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীর কর্মসূত্রে বোম্বাই-এ থাকতেন। স্বামী কিছুদিনের জন্য কলকাতায় বদলি হওয়ায় তিনিও এসেছিলেন কলকাতায়। সে সময় তিনি আসতেন পরিবর্তন অফিসে। নিরলস সাহিত্যচর্চা করে গেছেন অসুস্থ হবার আগের দিন পর্যন্ত। বইও লিখেছেন অনেকগুলি। তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আপনাদের সম্পাদকও গিয়েছিলেন।

পরিবর্তন-এর নিয়মিত লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকের একটি যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়। লেখক ও সম্পাদক উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করাটাই সম্পাদনার বড় কথা। অবশ্য আমাদের সম্পাদকীয় দফতরে কাজের চাপ ও দর্শনার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে, এখানে লেখকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলা মুশকিল হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু যাঁরা আসেন, লেখেন এবং পরিবর্তন-এর কথা ভাবেন, স্বভাবতই তাঁরা পরিবর্তন-এর বিরাট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সেদিক থেকে মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণ স্বভাবতই আমাদের ব্যথিত করেছে।

এবার আমাদের পরিকল্পনার কথা বলি। নানা কারণে পরিবর্তন-এর প্রকাশ এখনও এক সপ্তাহের ওপর পিছিয়ে আছে। আমরা আশা করছি পুজোর পর থেকে আবার নিয়মিত হব। পুজো সংখ্যার আগে সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের আরও তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ও কলকাতা শহরতলীতে কীভাবে মস্তানি বেড়ে গেছে এবং খুনের রাজনীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার একগুচ্ছ প্রতিবেদন থাকছে। ১১ সেপ্টেম্বর আসামে সাম্প্রতিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আসামের বাঙালিদের ওপর এক প্রতিবেদন। আমাদের প্রতিবেদক সঞ্জয় সিংহ সম্প্রতি ঘুরে এলেন বারাণসী থেকে। বারাণসীতে অসহায় বিধবা নারীদের কী দুঃসহভাবে দিন কাটছে তার এক মর্মন্তুদ কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, ছাত্রদের পড়াশোনার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কব্জা করাই যে রাজনীতিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠছে—এ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রতিবেদন থাকছে ১১ সেপ্টেম্বর। সঞ্জয় সিংহ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। তা প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর।

আসাম চুক্তি সম্পর্কে আমাদের সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশ হচ্ছে। আমরা চাই আসাম চুক্তি সম্পর্কে জনমত আরো জাগ্রত হোক। আসাম চুক্তি নিয়ে আমরা আমাদের পাঠকদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে চাই। অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখে পাঠান। প্রয়োজন হলে আমরা সেগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। তবে কোন বক্তব্য যেন পাঁচশো শব্দের বেশি না হয়। অলমিতি,

পা. চ.

পরিবর্তন ১১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার আকর্ষণ



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে বিক্ষোভ, মিটিং, মিছিল। উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে এই অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে সত্যিই কি কোন যুক্তি আছে? নাকি এসব নেহাতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা? এর উত্তর-সন্ধান এবং সেই সঙ্গে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লেখা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎকারসহ প্রতিবেদনগুচ্ছ:

বিশ্ববিদ্যালয়, না রাজনীতির ঘাঁটি?

আসাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সেখানকার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যে চুক্তি করলেন, তার ফলে কি সে রাজ্যে সত্যিই শান্তি ফিরে আসবে? বিদেশি বাছাই-এর বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতই বা কী হবে? কোন পথে চলেছে আসাম?

আসাম চুক্তি, না মৃত্যুবাণ?

ইংরেজিতে প্রবাদ আছে, ডাণ্ডা না মারলে ছেলে গোল্লায় যাবে। আধুনিক যুগে শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যখন আগেকার ধ্যানধারণার পরিবর্তন হচ্ছে তখন এই প্রবচন কতখানি সত্যি? আপনার সন্তান অন্যায় করলে, তাকে বোঝাবেন, না মারধোর করবেন?

আপনি কি আপনার সন্তানকে মারেন?

মেদিনীপুরের সি পি আই (এম) নেতা তাঁর কন্যা রেশমীকে বিয়ে দিয়েছিলেন কম বয়সেই। কিন্তু সম্প্রতি শ্বশুরবাড়িতে সে কন্যাটির রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তা নিয়ে সরজমিন প্রতিবেদন:

সি পি আই (এম) নেতার কন্যার শ্বশুরবাড়িতে রহস্যজনক মৃত্যু

ধারাবাহিক লেখা:

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর চীনের আকাশে নতুন তারা

এ ছাড়া নিয়মিত ফিচার

সম্পাদকীয়

সন্ত লঙ্গোয়ালের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আমরা মর্মাহত। সন্ত লঙ্গোয়াল একজন প্রাজ্ঞ ও শান্তিকামী শিখ নেতা ছিলেন। সন্ত বুঝেছিলেন যে, পাঞ্জাবে পরিস্থিতি যেভাবে ঘোরাল হয়ে উঠছে তাতে করে এখুনি রাশ টেনে না ধরলে পাঞ্জাবের নেতৃত্ব উগ্রপন্থীদের হাতে চলে যাবে। সন্ত তাই পাঞ্জাব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার আগুন একবার জ্বালালে তা নেভান কঠিন। পাঞ্জাবে প্রথম দিন থেকেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস আর গুপ্তহত্যা দিয়ে। এই হত্যার পিছনে কারা সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু অকালি নেতারা সেদিন নীরবে এইসব হত্যাকাণ্ড দেখেছেন অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব স্খালন করেছেন। তাঁরা যদি প্রথম থেকেই হিংসার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতেন, তাহলে হিংসার আগুন এইভাবে পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ত না এবং সন্ত লঙ্গোয়ালকেও এইভাবে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হত না। সন্ত নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, ভারতের ঐক্য এবং অখণ্ডতাই ভারতবাসীর জীবনে সবচেয়ে বড় মন্ত্র। জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।. রাজনৈতিক ক্ষমতা, তুচ্ছ রাজ্য ভাঙাগড়া, সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভারতীয় ঐক্য। সন্তের প্রতি শিখ সম্প্রদায়ের যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তাঁর চিতাভস্মের সামনে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক শিখ শপথ নেবেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার।

আজ ভারতবর্ষের সামনে বিরাট সঙ্কট। ভারতবাসীর নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মত মানুষ নিহত হন। নিহত হন ললিত মাকেনের মত প্রভাবশালী নেতা। শেষ পর্যন্ত সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়ালের মত বিরাট ব্যক্তিত্বকেও আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হল। এই হত্যাকারীরা আজ বিশ্বজোড়া জাল পেতেছে। তাদের হাত থেকে খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁর পিছু ছাড়েনি। শুধুমাত্র অসীম মনোবল ও নিয়তির ওপর ভরসা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দিল্লি থেকে পাঞ্জাব জুড়ে সর্বত্র আতঙ্ক। এই আতঙ্কের পরিবেশে কী করে দেশ গড়ার কাজ চলতে পারে? এই সম্পাদকীয় লেখার সময় জানা গেছে, পাঞ্জাবের এই হিংসাত্মক কাজকর্মে মদত দিচ্ছে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ধৃত উগ্রপন্থীরা সরকারের কাছে কবুল করেছে যে, তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে ঐ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। পাঞ্জাবের সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা এবারের স্বাধীনতা দিবসে কাশ্মীরে প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশি কাশ্মীরে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকাকে অপমানিত করে তোলা হয়েছে কৃষ্ণ পতাকা। পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা থাকলেও তাদের সংখ্যা বেশি নয়। পাঞ্জাবের বৃহত্তর জনগণ দেশপ্রেমিক, শান্তিপ্রিয় এবং ভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। আমরা বারবার একথা বলে আসছি, কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ সমগ্র পাঞ্জাবের মনোভাবের প্রতিফলন নয়। যে জন্য এখনও পাঞ্জাবে কাশ্মীরের মত কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু কাশ্মীরে আজ প্রকাশ্যেই চলেছে দেশদ্রোহিতা। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে পুলিশ পাহারায় আর দেশদ্রোহীরা সেই সভায় ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে এ ঘটনা ভাবাই যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রয়োজনে স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য পাঠাতে পারেন, তাহলে কাশ্মীরের ঐ দেশদ্রোহীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তাঁরা দ্বিধা করছেন কেন? পৃথিবীর সমস্ত দেশই দেশদ্রোহীদের চরম দণ্ড দিয়ে থাকে। কিন্তু হয়ত দেখা যাবে একদিন এদেরই সঙ্গে সরকার আলোচনায় বসেছেন। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের কালো হাত শক্ত হাতে গুঁড়িয়ে না দিতে পারলে ভারতকে কিছুতেই আর ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে না। শ্রীমতী গান্ধী এটি বুঝেছিলেন বলেই তিনি নিজের জীবন দিয়েও শক্ত হাতে সমস্ত অশুভ শক্তির মোকাবিলা করে গেছেন। সন্ত লঙ্গোয়ালের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে সেই শুভবুদ্ধিই পাঞ্জাবকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে অবিলম্বে যদি লঙ্গোয়ালের মত দেশপ্রেমিক মানুষের সন্ধান না মেলে এবং সরকার যদি দ্বিধাগ্রস্ত হন, তাহলে কাশ্মীরের ভাগ্যে কী আছে তা আমাদের জানা নেই।

সাত-পাঁচ

চোরাচালানকারীর সম্পত্তি

চোরাচালানকারীরা নাকি এরোপ্লেন থেকে কোকেন ফেলে দিত প্রায়ই। নিচে তাদের লোক থাকত। একবার ধরা পড়ার ভয়ে মেক্সিকো উপসাগরের কাছে প্লেনটাকে চলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে প্যারাসুটে ঝাঁপ দেয়। তাদের এরোপ্লেনটি পরে ধ্বংস হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনী পুরো দলটিকে ধরে। ফ্লোরিডায় চোরাচালানকারী দলটি ধরা পড়ার পর তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ২ লাখ ডলার, তাদের সম্পত্তি হিসাবে ২৮ হেক্টর জমি—এই জমিতেই তারা এরোপ্লেন থেকে কোকেন ফেলত। সেই সঙ্গে দেড় লাখ ডলার দামের একটি বাড়িও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নতুন একটি বিল আনার ফলেই চোরাচালানীদের সম্পত্তি এভাবে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে। নেশার ওষুধপত্র যাতে গোপনে দেশে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি হিসাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছে এরোপ্লেন, যন্ত্রচালিত নৌকো, জমিজমা, বাড়ি ইত্যাদি।

এইসব সম্পত্তির পরিমাণ বড় কম নয়। জমি বলতে প্রচুর পরিমাণ, বাড়ি বলতে প্রাসাদ বলা যায়। এক একটার দাম কম করে ৫ লাখ ডলার। এইসব সম্পত্তি পুলিশের পক্ষ থেকে নীলাম করে বিক্রি হয়। বিক্রির টাকা ব্যয় হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজে। তবে ইদানীং সমাজকল্যাণেও ব্যয় করা হচ্ছে। সমাজকল্যাণ বলতে, স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিশুদের শেখান হচ্ছে, মাদকদ্রব্য অত্যন্ত খারাপ জিনিস।

চোরাচালানকারীরা যে ব্যাপক হারে মাদকদ্রব্যের গোপন লেনদেন করে যাচ্ছে, তা ঠেকাতে গেলেও প্রচুর খরচ হবার কথা। যেমন মাদকদ্রব্যরোধকারী বাহিনীর জন্য ১৯৮৪ সালে খরচ হয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার. শুল্ক বিভাগের খরচ হয়েছে ২ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। এই ব্যয়ভার কিছুটা মেটান যাবে ধরা পড়া চোরাচালানীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকেই।

সুৎলজ-এর এক টুকরো ভালবাসা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দশ সহস্রাধিক অধ্যাপকই নাকি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী। এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছে সে দেশেরই একটি দক্ষিণপন্থী সংস্থা। তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বামপন্থী শক্তি সমাবেশ করা হয়েছে কোন বিশেষ পক্ষের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই।

এই সংস্থাটি তাদের প্রচারপত্রে এমন কয়েকজন অধ্যাপকের নামধাম সহ পরিচিতিও দিয়েছে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সল লন্দাউ-র কথা বলা যায়। তিনি কয়েকদিন আগে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন, যাতে কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোকে একটি মহৎ চরিত্রের মানুষ বলে দেখান হয়েছিল।

এই সংস্থাটি এখন দৈনিকে বা টেলিভিশনে বারবার বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিতে চাইছে। এরা বলছে, এইসব অধ্যাপকদের অনেকেই সুইডিশ, বৃটিশ বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

এমন প্রচার চালানর কারণ—এই সংস্থাটি মনে করে বিদেশ সচিব জর্জ সুৎলজ বামপন্থীদের প্রতি অত্যন্ত নরম এবং সেজন্যই তাঁকে তাঁর দায়িত্ব থেকে এ মুহূর্তে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া (কারণ টাকা)

পরিবর্তন ১৭-২৩ জুলাই '৮৫ সংখ্যাটি বাংলায় ভ্রমণ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করে ভ্রমণেচ্ছু বাঙালির ধন্যবাদ পাবার কাজ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভ্রমণ সংখ্যা বার করার পর ভ্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ হলেও কজন মধ্যবিত্ত বাঙালি বেড়িয়ে আসতে পারলেন এ সম্পর্কে যদি একটা সমীক্ষা চালান, তাহলে হয়ত দেখা যাবে, শতকরা পাঁচজনও বর্তমান যুগে এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

ভ্রমণ যতই রোমান্টিক হোক, ইতিহাসের সামনাসামনি দাঁড়াবার সুযোগ এনে দিক, তবু তা বিনা পয়সায় যেহেতু হয় না, তাই মধ্যবিত্ত বাঙালিকে যা প্রথমেই ভাবায় তা হল তার আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা।

সরকার যে সমস্ত টুরিস্ট লজ করেছেন তা সাধারণ লোকের জন্য নয়—ধনীদের জন্য। যে সমস্ত হোটেলের কথা পরিবর্তন-এ পাওয়া গেছে, তাও সাধারণ লোকের পকেটের দৌড়ের বাইরে।

তাহলে ভ্রমণ করেন কারা? আমি একজন সরকারি চাকুরে। মেঘে মেঘে বেলাও অনেক হল, কিন্তু ভ্রমণ—মানস ভ্রমণ ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। কারণ একমাত্র দারিদ্র্য। এটা খালি আমার বিধিলিপি নয়—লক্ষ লক্ষ বাঙালির এটা খেদ।

সরকার পর্যটন বিভাগ থেকে কি এমন ব্যবস্থা করতে পারেন না যে, যাঁরা আমার মত স্বল্প আয়ের মানুষ তাঁদের ভ্রমণেচ্ছা পূরণের জন্য সরকারি তত্ত্বাবধানে এবং সহজে পরিশোধযোগ্য ঋণ মঞ্জুর করে দেশ ভ্রমণ করিয়ে আনবেন। বা এই উদ্দেশ্যে যদি বেসরকারি সংস্থা গড়ে ওঠে তাহলে বাণিজ্যিক দিক থেকে সেটা মুনাফা করবে বলে আমার বিশ্বাস এবং পরোক্ষভাবে তা পর্যটনশিল্পকেও উন্নত করবে। না হলে আমরা চিরকাল যেমন করে এসেছি এখনও এই বলে সান্ত্বনা লাভ করব যে, পর্বতমালা বা সিন্ধু কিছুই দেখিনি, কিন্তু ঘরের পাশের মাঠে ঘাসের ওপর শিশির বিন্দু দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

রামকুণ্ডল বন্দ্যোপাধ্যায়
আনারা, পুরুলিয়া

সমীপেষু

একটি উল্লেখযোগ্য ভুল



রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর মাঝে রবীন্দ্রনাথ

উল্লেখযোগ্য বলিতেছি এই কারণে যে, যে বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনায় এই ভুলটি ঘটিয়াছে তিনি জানিতেন ইহা ভুল, তথাপি ইহা চলিত করিয়াছেন। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার রচনা সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও জানিতেন যে ইহা ভুল, তথাপি ইহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই অথবা এই ভুলটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণও করেন নাই।

ভুলটি ঘটিয়াছে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় একটি বালিকার পরিচয় লইয়া। বালিকাটি এক গুজরাটী দম্পতির কন্যা। ডাক নাম 'পুপে'। ঠাকুর বাড়ির প্রদত্ত নাম 'নন্দিনী'। তাহার পিতা বালিকাটিকে শিশু বয়সেই ঠাকুর বাড়িতে রাখিয়া যান এবং রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী তাহাকে পালন করেন।

বালিকাটিকে শিশু বয়সেই আমি দেখিয়াছি, অতি সুশ্রী; সৌম্যেন্দ্রনাথ নীচের তলায় যে ঘরে বসিত তাহার সামনের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইত। একটু বড় হইলে তাহার পিতা তাহাকে লইয়া যান এবং নিজের সমাজে বিবাহ দেন।

রবীন্দ্রনাথের ইটালী ভ্রমণের সময় (১৯২৬) অন্যান্যের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও এই মেয়েটি তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইহার পরিচয়ে 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন:

'একেবারে শেষ মুহূর্তে বাবার আদেশ এল যে—প্রতিমা, আমাদের মেয়ে নন্দিনী এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।'

রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন যে মেয়েটি পালিতা কন্যা, 'আমাদের মেয়ে' নহে।

ইংরাজীতে প্রকাশিত রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থের নাম—'On the Edges of Time.' এই গ্রন্থে ইতালী ভ্রমণের বর্ণনা করিতে গিয়া রথীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:

'At the last moment father insisted that my wife, our daughter Nandini and myself should also go with him.'

এখানেও রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন যে, কন্যাটি পালিতা কন্যা, তিনি তো উল্লেখ করিলেনই না, অধিকন্তু গ্রন্থের শেষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের যে বংশলতিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে দেখানও হইয়াছে রথীন্দ্রনাথ প্রতিমার কন্যা নন্দিনী রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী—

'Rabindranath— Rathindranath — Nandini
m. Mrinalini | m. Pratima born—1922

রথীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থের সম্পাদক পুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্র—বিশেষজ্ঞ বলিয়া তিনি প্রখ্যাত। রথীন্দ্রনাথের ইংরাজী গ্রন্থের প্রকাশক তো বিশ্বভারতী নিজেই। তৎসত্ত্বেও এই রকম একটা ভুল কি করিয়া চালু হইতে পারিল ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি।

এই দুইটি গ্রন্থের প্রমাণদৃষ্টে ভবিষ্যতের লেখকেরা হয়ত সন্ধান করিয়া বেড়াইবেন রবীন্দ্রনাথের যে একটি পৌত্রী ছিল—'নন্দিনী', সে গেল কোথায়?

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
কলকাতা

সে কী, আপনি জানেন না?

জুন ৮৫-এর ১৫ তারিখে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলাম কলকাতায়। পরিবর্তন-এর অফিসে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনটাও একই সঙ্গে সেরে ফেলেছিলাম।

ভদ্রলোক অত্যন্ত চমৎকার। বলতে গেলে, মুহূর্তের মধ্যে আমাকে আপন করে নিলেন। চা সিগারেট অর্ডার হল। হঠাৎ দেখলাম একটা প্যাকেট। জিগ্যেস করতেই বলে উঠলেন, সৌজন্য সংখ্যায় 'পরিবর্তন'।

তার মধ্যে বহু কপি দেখলাম। তাতে একটা জিনিস দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল।

২-৮ জানুয়ারি '৮৫ সংখ্যা রাজসাহীর জনাবা সুবর্ণা নাসরিন 'পরিবর্তন চাই' শিরোনামে পরিবর্তন চেয়ে পাঠিয়েছেন।

জনাবা নাসরিন বোধহয় জানেন না যে, বাংলাদেশের আনাচেকানাচে এখন পরিবর্তন-এর বহুল প্রচার। এল সি করে পত্র-পত্রিকা ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে পরিবর্তন নিয়ে আসছেন। বাড়িতে প্রতিদিন যে হকার খবরের কাগজ দিয়ে যান, তাঁকে বললেই তিনি হাসিমুখে এক কপি পরিবর্তন জনাবা নাসরিনের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন। **মহম্মদ আলী**
এম এম আলী রোড, যশোর

ঝেড়ে কাসুন

১৭-২৩ জুলাই ৮৫ সংখ্যার পরিবর্তন-এ 'নারীর অবস্থা আমাদের দেশে ক্রমশই খারাপ হচ্ছে, ইঁদুর মৃত্যু তার সাম্প্রতিক প্রমাণ' এই প্রতিবেদনে সুদীপ মজুমদার এক জায়গায় লিখেছেন—'ছেলে বেকার হোক, লম্পট হোক অথবা বাইরে রাত কাটিয়েই ফিরুক, পরিবারে তার প্রতি ততটা রোষ হবে না। কিন্তু একটি মেয়ে যদি…।' আমার প্রশ্নটা শুধু বেকারত্ব নিয়ে। প্রতিবেদক কি বলতে চান যে, একটি ছেলে যদি বেকার হয়, পরিবারের অন্যান্যদের উচিত তার উপর রুষ্ট হওয়া, তাকে ক্ষমা, ভালবাসার চোখে না দেখা? আশা করি, সুদীপবাবু বা সম্পাদক মশাই ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবেন। **দীপঙ্কর বক্সী**
ধর্মনগর, ত্রিপুরা



আহা কী বাহার,
কী রেশমকোমল চুল...
কী হাল্কা অচিন্ সুরভী...
কী মনভরানো আবেশ!
ধন্য হেলো শ্যাম্পু।

কত রকমের হেলো আছে দেখুন :

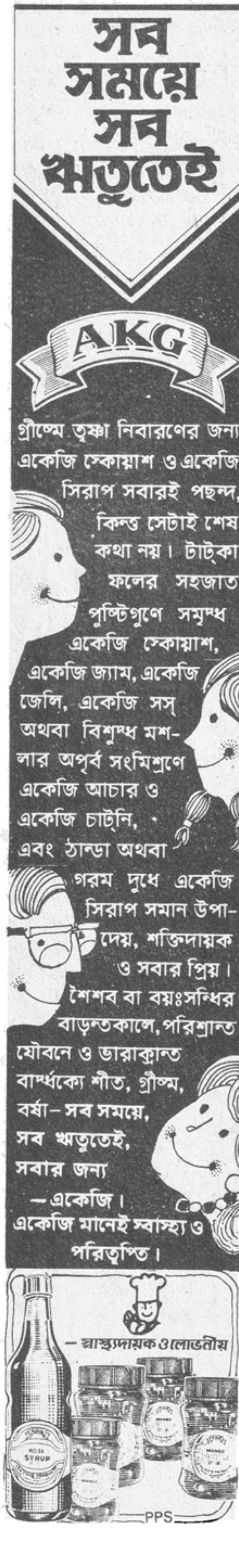
হেলো
এগ শ্যাম্পু।
প্রোটিন দিয়ে
চুলের পুষ্টি যোগায়॥

নতুন হেলো
গ্রীন অ্যাপেল
শ্যাম্পু।
যেমন চমৎকার
গন্ধ, তেমনই
চমৎকার যত্ন!

নতুন হেলো
হার্বাল শ্যাম্পু।
প্রকৃতির
নিজগুণে ভরা॥

**হেলোর আবেশে
আহা মন ভরে যায়!**

B83.29 BN



আপনার অঞ্চল, আপনার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গপন্থী

পশ্চিমবঙ্গের নতুন নামকরণ কী হতে পারে, এই নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানারকম মতামত প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটিকে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন। আমার মনে হয় যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ নামটিকে বহাল রাখার আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের প্রস্তাবই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আমি গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি তাতে সকলের মতামত থেকে একটা ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি যে, এই ধরনের সরল-সাদাসিধে নামই তাঁদের বেশি পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গ নামটির মধ্য দিয়ে তার সত্যিকার স্বরূপটি ফুটে ওঠে। তাই পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের অর্থ পশ্চিমবঙ্গকে বিস্মৃত হওয়া। সুতরাং এ রাজ্যের নতুন নামকরণের প্রশ্নটা নিছকই অর্থহীন।

অরূপ মণ্ডল
খানো, বর্ধমান

ঝাল্লার মাঠ ঃ পরিবর্তন- এর বক্তব্য

৩১ জুলাই—৬ আগস্ট '৮৫ সংখ্যার পরিবর্তন-এ 'ঝাল্লার মাঠের বাসিন্দারা মস্তানদের ভয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে সাহস পান না' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একটি মন্তব্য ছিল 'যুবক সংঘ ক্লাবে নিয়ে গিয়ে একটি ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে এক মস্তান।'

এ সম্পর্কে টালীগঞ্জ যুবক সংঘের সম্পাদক শ্রীহারাধন সাহা জানান, 'আমাদের ক্লাবে কোন সন্ত্রাস নাই। আমরা এই বস্তি অঞ্চলে সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ, যুবকদের খেলাধূলা ও চরিত্র গঠনের কাজ করিয়া আসিতেছি।'

এ সম্পর্কে পরিবর্তন-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য, যুবক সংঘ ক্লাব অর্থে টালীগঞ্জ যুবক সংঘকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। তবু তা সত্ত্বেও টালীগঞ্জ যুবক সংঘের সদস্যরা যদি মনে করে থাকেন ঐ রিপোর্টে তাঁদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাহলে এই বিবৃতির মাধ্যমে পাঠকদের জানাতে চাই, ঐ খুনের ঘটনার সঙ্গে টালীগঞ্জ যুবক সংঘের কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পাদক

রাস্তা কার ? রিক্সা যার

আমাদের এই ছোট্ট শহরে অসংখ্য এবং ক্রমবর্ধমান ত্রিচক্র–যান হয়ে উঠেছে এক দারুণ সমস্যা যা হওয়া উচিত ছিল না মোটেই। মফস্বলে যানবাহনের এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ জুড়ে আছে এই রিক্সা। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া, বিশেষ করে মধ্য শহর থেকে বহু দূরে হসপিটাল, যেখানে জরুরি যাওয়া আসা নিত্য-নৈমিত্তিক, আমাদের রিক্সার ওপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু তাই বলে রিক্সাচালকদের অমানবিক ব্যবহারের কাছে ক্রমান্বয়ে সহনশীলতার দক্ষতা দেখিয়ে যেতে হবে!

নির্ধারিত ভাড়া বলে এখানকার রিক্সা সমাজে কোন কথা জানা নেই। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জোরে এ'রা বুঝতে পারেন কোন যাত্রী এই প্রথম এখানে এলেন, কোন যাত্রী রিক্সা ছাড়া চলাফেরায় শারীরিকভাবে অক্ষম, কোন যাত্রী যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারেন কোন যাত্রী···এই-সবের তুল্যমূল্য বিচারে চাওয়া হয় ভাড়া। রেটবুক দেখাতে বললে এ'রা হাসেন।

স্টেশন সংলগ্ন প্রধান রাস্তাটি সবসময় হর্নের আর্তনাদে মুখর। ইদানীংকালের পরিসংখ্যান নিলে হয়ত দেখা যাবে প্রতি একজন মানুষ পিছু দুটি করে রিক্সা। বলা বোধহয় বাহুল্য যে এদের মধ্যে নব্বই শতাংশের লাইসেন্স নেই। কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় উদার মনোভাবকে প্রশংসা না জানিয়ে পারছি না। তিনটি প্রধান রাস্তার সঙ্গমস্থলে মাঝে মাঝে একজন শীর্ণকায় ট্র্যাফিক পুলিশকে দেখা যেত, আজকাল তাও নেই। প্রতি চার হাত অন্তর একটি করে রিক্সাকে ড্রিবল করতে করতে পথ চলতে হয় আমাদের। চলন্ত অবস্থায় অনেক সময়েই মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে পিঠে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে পাশে সরিয়ে দেন চালকরা, প্রতিবাদ মানেই কিছু অশ্রাব্য গালাগালি।

একথা সত্য যে সব রিক্সাচালকরাই একরকম নন। কিন্তু পূর্ববর্ণিতদের সংখ্যা এতই বেশি যে পরবর্তীদের বিশ্বাসের আওতায় আনা যায় না। মানতে হবে যে এ'দেরও ঘর-সংসার, স্ত্রী, পুত্র আছে এবং শ্রমের বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে হয়। আবার একথাও মানতে হবে যে ঘিঞ্জি এই মফস্বল শহরে কাদাভর্তি রাস্তায় গিজ গিজ করা রিক্সা এবং তার চালকদের দাপটও মধ্যবিত্ত আরোহীরা একদিন প্রচণ্ড ক্ষোভে চূর্ণ করে দিতে পারেন। সেই অনিবার্য সংঘাত এড়ানর জন্যে কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন পরিকল্পনা নেই?

রীনা মুখোপাধ্যায়
স্ট্যাণ্ড রোড, রানাঘাট, নদীয়া

হাতে হ্যারিকেন

পরিবর্তন ৩১ জুলাই—৬ আগস্ট ৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কঁহা গয়ো রে, কঁহা গয়ো রে তড়িৎবাবু মেরা?' শিরোনামের চিঠিটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হল না যে, বামফ্রন্ট সরকার এই রকম কত গ্রামকে অবহেলিতের দলে ফেলে রেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি লেখক অরূপ ও সামু মণ্ডলকে জানাই যে, দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ, আমিও আপনাদের মত একজন মফস্বলের (বার্ণপুর) বাসিন্দা। তাই আমি মনে করি যে, আমরাও আপনাদের মত একই পথের পথিক। কারণ, এখানে বেশিক্ষণ আলো জ্বালাটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। শুধু আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা হল আপনারা লোককে বলতে পারছেন না যে, আপনাদের বিদ্যুৎ আছে আর আমরা সেটা বলতে পারছি। কিন্তু আপনারা বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হয়েও আমাদের থেকে সুখে আছেন। কারণ, এত লোডশেডিং-এর পরেও মাসের শেষে দেখা যায় যে, একটা মোটা রকমের 'ইলেট্রিক-বিল' এবং সেই সঙ্গে কেরোসিনের খরচ তো আছেই।

আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, আপনি বরং যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ নেই সেই সব গ্রামে বিদ্যুতের বদলে 'ন্যায্য দামে' যদি কেরোসিন এবং লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সেই সব গ্রামের অধিবাসীরা অনেক বেশি উপকৃত হবেন।

মনোজকুমার চক্রবর্তী
বার্নপুর, বর্ধমান



অম্লমধুর

ইলেকট্রিকের বিল
নেই হিসাবের মিল
যেন ভূতের কিল
ভেবেই হই কাহিল।



কাঁধে ঝুলি মুখে বুলি
'বাবু দুটো পয়সা দিন'
সুযোগ পেলে এরাই বলে,
বাট্টা দিয়ে খুচরা নিন।

*

জ্যোতিষীতে বিধান দিলেন
দেখে আমার হস্ত
নিতে হবে নীলা, গোমেদ
ফাঁড়া আছে মস্ত।
যোগ আছে পরকে নিয়ে
বৌমা হবে ঘর ছাড়া,
আঁতকে বলি, বলেন কীস্রব!
বৌমা গেছে কবে মারা!

মল্লিকা সিকদার

বুঝলে, ভায়া, সার বুঝেছি ঃ
আসল জিনিস হল—খুঁটি!
নিজের ডানা থাক বা না থাক
খুঁটির জোরেই শূন্যে উঠি;
নিজের ছাতি হোক না বাইশ—
বুকে হাতি তুললে মামা



লেংটি পরে এমন নাকি
লোকে ভাবে ঃ আমিই গামা।

*

থানার ও. সি. গড়িমসি
করছে এবং করবে,
চোরের মাসি, খুনের পিসি—
সে কার টিকি ধরবে!

শুভেন্দু পালিত

গর্জে ওঠেন দেরি হলে
অধস্তনের ওপর,
কার দায়িত্ব কতখানি
তার ওপর দেন জোর।
কিন্তু বক্তা নিজেই অফিস
আসেন, রোজই লেটে,
তারপর ওর বাড়ির গপ্পেই—
সময় যায় কেটে।
নিজের কাজ ফেলে রাখেন
'পরে করব' বলে,
এভাবেই তো সরকারি—
অফিসে কাজ চলে।

অজিতকুমার দাস



বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে
গহনা খুলে যান।
নথ পরলে নাকটি যাবে,
দুল পরলে কান।

মধুসূদন পাল

খেলার মাঠে যাওয়ার আগে
'বুলেট প্রুফ পরুন গায়
নইলে ক্ষুরে ঝরবে রক্ত
খেলা যে এখন 'খেলা' নয়।

নারায়ণ রতন দত্ত

আপনার বাচ্চাকে
দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি!





চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও দরকার। আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি।

পুষ্টিকর গুণমান ঃ সেরেল্যাকের প্রতিটি ফীডের মধ্যেই আছে সব কিছু যা আপনার বাচ্চার পুষ্টির জন্যে দরকার। এতে আছে পোটিন. কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। বাচ্চাদের জন্যে ঠিক যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম অবস্থায় থাকে।

অল্প সময়ে তৈরী ঃ বাচ্চার খিদে পাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী। এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে। আপনি শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন!

খেতে ভাল ঃ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেরেল্যাকের স্বাদ বাচ্চাদের খুব পছন্দ। অতএব এটা দিয়ে সুরু করাই ভাল। তৈরী করার যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্টি যোগান।

বিনামূল্যে শিশুর বৃদ্ধিসূচী ঃ
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান-
সেরেল্যাক, পোস্ট বক্স ৩
নিউ দিল্লী ১১০০১৮

Nestlé



রাজধানীর চিঠি

আসাম চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কুড়ি লক্ষ মানুষ

নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমদার

এবার স্বাধীনতা দিবসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল ধারণাতীত কড়া। এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লার র‍্যামপার্টে বুলেট-প্রুফ কাঁচের ঘরের ভেতর থেকে বক্তৃতা করলেন। ভোর প্রায় তিনটে পর্যন্ত জেগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করেন রাজীব গান্ধী তাঁর নিজের বাড়িতে। প্রধানমন্ত্রীর রেস কোর্সের বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই কর্ম-ব্যস্ততা। সকালবেলা গুয়াহাটি থেকে স্পেশাল প্লেনে করে আসাম আন্দোলনের আরও অনেক নেতাদের দিল্লিতে আনান হয়েছে। শেষে অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতা প্রফুল্ল মহান্ত ও ভৃগু ফুকন আর গণ সংগ্রাম পরিষদের বিরাজ শর্মার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল যার কথা প্রধানমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টা পরে লাল কেল্লার ওপর থেকে ঘোষণা করলেন। 'আজ থেকে মাস দশেক আগে অনেকেই বলত যে ভারত একটা দেশ থাকবে না, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে', রাজীব গান্ধী বললেন, 'আজ আর সেই প্রশ্ন ওঠেই না।'

পরদিন লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শঙ্কর চহ্বান এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। পাশে বসেছিলেন রাজীব গান্ধী। বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা চুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে স্পীকার বলরাম জাখর কোনরকম আলোচনা করার দাবি নাকচ করে দেন।

এই মাসের মধ্যে নতুন সরকার দুটি বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করেছেন। হাজার পাঁচেক মানুষের মৃত্যু হয় পাঞ্জাব সংক্রান্ত হিংসায়। এবং সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা। সেই গনগনে সমস্যাটাকে ঝুঁকি নিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করলেন রাজীব গান্ধীর সরকার গত জুলাই মাসে। অকালি নেতা লঙ্গোয়ালের সঙ্গে সমঝোতা করে। এর তিন সপ্তাহের মধ্যেই এল আসাম চুক্তি। দুটি আন্দোলনের প্রকৃতি যদিও ভিন্ন ছিল কিন্তু প্রাণহানির বেলায় কোনটা কোনটা থেকে কম নয়। গত ছ'বছরে আসাম আন্দোলনে ৫০০০-এর মত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। চুক্তি হবার দরুণ অনেকেই আশা করেছেন যে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসবে। আশারই কথা, কিন্তু চুক্তি হবার উল্লাসে যদি আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া হয় তাহলে আবার নতুন করে একই বিপদ ডেকে আনা হবে।

তখন দেশে জনতা পার্টির সরকার। আসামের নেতারা ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। গণ-সংগ্রাম পরিষদ –এর জন্ম ১৯৬১ সালে। ১৯৭৯ সালের আন্দোলন গণসংগ্রাম পরিষদ ও আসু যৌথভাবে পরিচালনা করে। আসাম-এর সঙ্গে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্য ও বাংলাদেশের সীমান্ত একেবারে খোলামেলা ছিল বহুদিন ধরে। এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই শুরু হয়ে যায় আসামে নানান পরিবেশ থেকে মানুষের আনাগোনা। একটা অনুমান পাওয়া যেতে পারে নিম্নোক্ত সংখ্যা থেকে। আসামের জনসংখ্যা গত সত্তর বছরে দারুণভাবে বেড়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বভারতীয় হার ছিল গত সত্তর বছরে শতকরা ১২৯। কিন্তু আসামের বেলায় এই হার শতকরা ৩৪৪। সমস্যাটা এত বিকট হয়ে দাঁড়ায় যে ১৯৫০ সালে আসাম বিধানসভা **Illegal Immigrants Expulsion From Assam Act** প্রণয়ন করে এই অন্তঃপ্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে।

দেশ বিভাগের সময়ও প্রচুর মানুষ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন। তারপর ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ও বহু রিফিউজি এদিকে এসে আশ্রয় নেন। আসামের অর্থনীতিই শুধু নয় বরং সংস্কৃতিও প্রভাবিত হতে থাকে। নয়া দিল্লির সব কটি সরকারই দূরের এই রাজ্যগুলির প্রতি অবহেলা দেখিয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক বিকাশ মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব অথবা হরিয়ানার মত রাজ্যগুলির মত হতে পারেনি। বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল। এমন সময় ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। আসামের আন্দোলনকারীরা নির্বাচনী তালিকা থেকে বিদেশিদের বাদ দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই দাবিগুলো মেনে নেননি। পরে চরণ সিং-এর কেয়ারটেকার সরকার কয়েকটি মিটিং-এর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর আসাম বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়। স্কুল কলেজ অফিস কাছারী ছেড়ে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। এমনকী মহিলারাও সক্রিয় ভূমিকা নিতে থাকেন আন্দোলনে। ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় ও বিধানসভা সাসপেণ্ড করা হয়।

দুলিয়াজান তয়েল ইণ্ডিয়ার টেকনিক্যাল ম্যানেজার রবি মিত্রকে গাড়ি থেকে টেনে বার করে কুপিয়ে মারা হয়। ১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল পুরো আসামকে 'ডিসটার্বড এরিয়া' বলে ঘোষণা করা হয়। আন্দোলন যতই তেজী হয়ে উঠতে থাকে সরকারও কঠোর হতে থাকে। প্রথম দিকে আন্দোলনে বাঙালি-বিরোধী মনোভাব থাকে পরে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান রিফিউজিরা এই আন্দোলনের লক্ষ্য হন। আসামের বড় বড় জমির মালিকরা ভাগচাষে কাজ করাতেন। শরণার্থীদের অনেকেই এ কাজে লেগে পড়েন। আস্তে আস্তে আসামের অর্থনীতির সঙ্গে এ'রা জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের টানাপোড়েনে সমস্যাটা আরও জটিল হয়। ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন ঘোষণা করেন আর আন্দোলনের নেতারা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন। তাঁদের দাবি নির্বাচনী তালিকা থেকে বাংলাদেশীদের বাদ না দিয়ে নির্বাচন করান অন্যায়। কিন্তু নির্বাচন হল। আন্দোলন ততদিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়ে যায়। কামরূপ ও লখিমপুর জেলায় দাঙ্গা। তারপর সেই কুখ্যাত নেলী ম্যাসাকার। কয়েক হাজার গরিব নিরপরাধ স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশু নিহত হয়।

কিন্তু তবুও আসামের সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শুধু তাই নয় আসামের তৎকালীন গভর্ণর এল পি সিং ১৯৬৭-কে কাট-অফ তারিখ বলে আন্দোলনকারীদের সমর্থন জোগাড় করেন এবং একটা চুক্তি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা নাকচ করে দেন এবং বলেন যে ১৯৭১-কেই কাট-অফ ডেট মানা হবে। এদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলো ও কিছু মুসলিম কংগ্রেসী নেতা আসামে গিয়ে প্রচারে নামেন। সমস্ত আবহাওয়া কলুষিত হয়ে যায়। চারজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহুবার আলোচনা করা সত্ত্বেও মতৈক্য হয়নি।

রাজীব গান্ধী আলাদা প্রক্রিয়া পছন্দ করেন। আধুনিক ম্যানেজমেন্টের পক্ষে বলে তিনি ফল চান। মিডলম্যানদের বাদ দিয়ে একমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চহ্বানকে সমঝোতা করার দায়িত্ব সঁপে দেন। ফল হল চুক্তিটি। এর দ্বারা ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আসা সব শরণার্থীর ভোট দেবার ক্ষমতা থাকবে না ১০ বছর। এবং তারপর ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁরা গণ্য হবেন। আর যাঁরা ১৯৭১ সালের পরে এসেছেন তাঁদের বহিষ্কৃত করা হবে। প্রায় পনের থেকে বিশ লক্ষের মত মানুষ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বাংলাদেশ ওদিকে ঘোষণা করেছে যে ওদেশে বহিষ্কৃত কাউকে স্বীকার করতে রাজী নয়, কেন না এ'রা কেউই বাংলাদেশী নন, একথা ঢাকা মনে করে। সমস্যা এখন দাঁড়াবে তাহলে এতগুলো মানুষ যাঁদের বেশির ভাগই গরিব তাঁদের কী হবে? চুক্তি করে আন্দোলন তো সমাপ্ত হল। কিন্তু রাজীব গান্ধীর দূরদর্শিতা তখনই প্রমাণ হবে যখন এই মানবিক সমস্যাটার একটা সমাধান খুঁজে বার করা হবে। □

সিটু নেতারা এখন দায়ে পড়ে সুব্রত মুখার্জিকে খোশামোদ করছেন

নিশীথ দে

বামফ্রণ্ট বকলমে আবার বনধের রাজনীতিতে নেমেছে। একটা বনধ পাট চাষীদের স্বার্থে, আর একটা শিল্প সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে। দুটো বনধেরই মূল লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বনধের রাজনীতির খুব একটা ধার আছে? মানুষকে বোকা বানানর রাজনীতি আর কতদিন চলে।

শিল্প সংস্থার ধর্মঘটে সামিল হয়েছে আই এন টি ইউ সি। যার নেতৃত্ব সুব্রত মুখার্জির হাতে। কংগ্রেসের কিছু লোক সুযোগ খুঁজছিলেন সুব্রত মুখার্জিকে কী করে বেকায়দায় ফেলা যায়। সুব্রতবাবু কেন সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বনধ ডাকছেন? সুতরাং সুব্রতবাবুর শাস্তি চাই।

যেহেতু সিটুর সঙ্গে আই এন টি ইউ সি হাত মিলিয়েছে, অতএব কংগ্রেসের জাত গেল। সিটু বা অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আই এন টি ইউ সি কি এই প্রথম যুক্ত আন্দোলনে নামছে? এর আগে বহু আন্দোলন হয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেস আর আই এন টি ইউ সি এক নয়। কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল, আই এন টি ইউ সি একটা আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। যদিও সিটু পুরোপুরি সি পি আই (এম)-এর নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্ট, সি পি আই (এম) বা বামফ্রণ্ট সরকারের কোনরকম বিরোধিতা দূরের কথা, সমালোচনা করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

শিল্পে বনধ ডাকার ব্যাপারে কংগ্রেসীরা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির একটা ছুতো পেয়েছে। তবে চিৎকার-চেঁচামেচিই সার হবে। কংগ্রেস এমন একটা দল যে দলে গণতন্ত্রের কোন বালাই নেই। রাজীব গান্ধীই শেষ কথা। তবু নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি না হলে কংগ্রেসকে কংগ্রেস বলে চিনতে অসুবিধা হয়।

কিন্তু সি পি আই (এম)-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে এক আসনে বসলেন কী করে? সি পি আই (এম)-এর নেতারা তো আকছার বলেন, কংগ্রেস হল গুণ্ডা, সমাজবিরোধীদের দল। আর সুব্রতবাবু সেই দলের নেতা। সিটু নেতা মনোরঞ্জন রায় কিছুদিন আগেও বলেছেন, আমরা আই এন টি ইউ সি-কে বাদ দিয়েই যুক্ত আন্দোলন করতে পারি, শিল্পে বনধ ডাকতে পারি। আই এন টি ইউ সি শ্রমিক শ্রেণীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সিটু আজকে প্রচণ্ড শক্তিশালী।

আজকে সিটুর হঠাৎ দুর্গতি হল কেন যে সুব্রতবাবুর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে? একে বলে ঠেকে শেখা। সিটু নেতারা এখন হালে পানি পাচ্ছেন না। তাঁরা শ্রমিক কর্মচারীদের বোকা বানাবার যে মতলব করেছেন সেটাও ধোপে টিঁকবে না। তাঁরা আন্দোলন করবেন কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের গায়ে আঁচড় লাগবে না, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মুনাফা লুঠবেন—এটা কি এত সোজা! সিটু নেতারা সুব্রত মুখার্জির হাতে তামাক খেতে চাইছেন, সুব্রতবাবুর দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন।

ক্ষমতায় আসার পর সি পি আই (এম) প্যাঁচে পড়েছে। শ্রমিক কর্মচারীরা মার খাচ্ছে, ব্যাপকভাবে ছাঁটাই হচ্ছে, কোন নতুন কলকারখানা তো হচ্ছে না, সম্প্রসারণও এ রাজ্যে হচ্ছে না। সি পি আই (এম) নেতারা বলছেন, এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের শিল্পনীতি। যদি তাই হয় তাহলে অন্য রাজ্যে হচ্ছে কী করে? অন্য রাজ্যে তো কেন্দ্রের আলাদা শিল্পনীতি নেই।

এখানে বলা হচ্ছে, বেকারদের চাকরি দেবার দায়িত্ব কেন্দ্রের, রাজ্যের নয়। কিন্তু অকংগ্রেসী রাজ্য তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটকে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় চাকরি হচ্ছে শুধু নয়, প্রতি বছর বাড়ছে। আর পশ্চিমবঙ্গে কমছে, ছাঁটাই বাড়ছে।

আসল কথা হল, পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বেকাররা চাকরি পাচ্ছেন না, উপরন্তু কলকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা নতুন করে বেকার হচ্ছেন। সরকারি সংস্থায় ছাঁটাই হচ্ছে না কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের একটা বড় অংশকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে, লোকসান বাড়ছে। সরকার পরিচালিত প্রতিটি সংস্থায় লোকসান বেড়ে চলেছে।

বন্ধ কলকারখানা চালু হলেই যে চলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তারপর হল, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা যে সবাই কাজ পাবেন তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। আসানসোলের বন্ধ কারখানা হিন্দুস্থান পিলকিংটন নিয়ে তো অনেক টানাপোড়েন চলছে। একজন ব্যবসায়ীর হাতে তুলেও দেওয়া হয়েছিল; তারপর আবার বন্ধ। শোনা যাচ্ছে, ওই ব্যবসায়ী নতুন করে কোন মূলধন বিনিয়োগ করেননি। বরং দেড় কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ১৯৮৪ সালের মে থেকে কর্মীরা বেতন পাচ্ছে না। অন্তত পঞ্চাশ জন কর্মী অভাব-অনটনে মারা গিয়েছেন।

বামফ্রণ্ট সরকার একটা নীতি ঠিক করল, ১৯৭৭-৭৮ সালে ঠিক হল, বেসরকারি মালিকানা কিংবা বহুজাতিক সংস্থাকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পজগতে নতুন করে ঠাঁই দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা উঠে পড়ে লাগলেন, শিল্প সংস্থায় আধুনিকীকরণ চলবে না। যেখানে গোটা পৃথিবী আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে চলেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখব? আধুনিকীকরণে বাধা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বামফ্রণ্ট নেতারা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতিবাবু আজকে যৌথ উদ্যোগের জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এটা এক সর্বনাশা নীতি কিনা কে জানে। মূলধন, বাজার, সবকিছু সরকারের, আর পরিচালন ব্যবস্থা থাকবে বেসরকারি হাতে। এর ফল কী হতে পারে?

যাই হোক প্রসঙ্গটা হল, শিল্প ধর্মঘট নিয়ে। ধর্মঘট যুক্তিযুক্ত কিনা সেটা আলোচনার বিষয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ কারখানা খোলা এবং শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থান নিয়ে ভাবা দরকার। বেকার সমস্যা নিয়ে; নতুন কলকারখানা খোলা, কেন্দ্রের অর্থ বিনিয়োগের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে একটা আন্দোলনের দরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোক সেন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দাবি করতে পারেন, বন্ধ কলকারখানা খোলা, কেন্দ্রের উদ্যোগে নতুন শিল্প স্থাপনের দাবিতে অশোক সেন নেতৃত্ব দিন। তিনি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বন্ধ কারখানা খুলে দেবেন। এখন কোথায় গেলেন?

সুব্রতবাবু এগিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের অনেক নেতা হৈ চৈ করছেন, সুব্রতবাবু আই এন টি ইউ সি-কে কেন সিটুর সঙ্গে কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনে নামাচ্ছেন? নেতারা রাজীব গান্ধীর হুকুমে চলতে পারেন, কিন্তু সাধারণ গরিব মানুষ, শ্রমিক কর্মচারীরা কেন চলবেন? এটা শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্যা, যে সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র এগিয়ে আসছেন না। শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে পার্টি এবং বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ দেখতে গিয়েই আজ সিটু কোণঠাসা। সিটু প্রায় কোন বড় ইউনিয়নেই আগের মত শক্তিশালী নয়। সিটুর ব্যর্থতাই আই এন টি ইউ সি-কে শক্তিশালী করেছে। রাজীব গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন নেতার ইমেজে দলের প্রভাব বাড়তে পারে, কিন্তু শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোন ট্রেড ইউনিয়ন টিঁকে থাকে না। শ্রমিকদের স্বার্থে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিত। সুব্রতবাবু কংগ্রেস নেতাদের কাছে যত অপরাধই করুন, শ্রমিক কর্মচারীরা তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন। তবে সি পি আই (এম)-এর নেতারা যদি ভেবে থাকেন, এই সুযোগে একটা কেন্দ্রবিরোধী হাওয়া তুলে বামফ্রণ্ট সরকারের ব্যর্থতা চাপা দেবেন, তাহলে ভুল হবে। শ্রমিক কর্মচারীরা এখন মুখোশধারীদের চিনতে পারেন। □

ওহো! নোভিনো

আমি চাই সঙ্গীত গম্‌গমে
... খুশিমত বয়ে নিয়ে ...
শুনবো না থেমে!



আমরা জাপানী...
আমরাই তো জানি
এর সব কৌশল দিতে ভরে ...
যাতে সবার মন ভরে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের মত নিখুঁত যত্নে ব্যাটারি বানাতে আর কেইবা পারে!

আমাদের নিখুঁত কাজের লম্বা ফিরিস্তিটা স্বচক্ষে দেখুন : প্রথমেই তো সেরাজাতের ৩৫ রকম কাঁচা মাল বাছাই...তারপরে ১১৭-টি সেরা কম্পোনেন্টের আলাদা-আলাদা নিখুঁত পরখ-যাচাই ..এরপরে তো আছেই ১১০০-টি নির্ধারিত গুণমানের লম্বা ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে পরখ করে, ৬৭-টি কঠিন পরীক্ষার ধাপ সগৌরবে উত্তীর্ণ হবার বড়াই। এতসব মিলিয়ে যেটি হাতে পান, তা তো হবেই সেরা গুণবান। আর এইরূপ ৮৭৫-টি ব্যাটারি বেরোচ্ছে—প্রতি মিনিটেই। প্রতিটি-ই পরীক্ষা করা... এক-এক করে!

আরো কি, আমরা এইসব নিখুঁত ব্যাটারি বানাই জাপানের সুবিখ্যাত ন্যাশনাল প্যানাসোনিক-এর সহযোগিতায়—যাদের সেরা গুণমানের যশগান সারা বিশ্বময়।

তাহলে, আশ্চর্যের আর কি আছে বলুন ?... নোভিনো ব্যাটারি সেরা, কারণ, এর যে আছে এইসব অশেষ গুণ:

শক্তিশালী বেশী···চলেও বেশী···
লীক প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশী···আর মজুত থাকেও বেশীকাল।

সেইজন্যেই জনে-জনে সবাই বলে,
ওহো! অশেষ গুণের নোভিনো!



নোভিনো

সেরাজাতের ব্যাটারি

লখনপাল ন্যাশনাল লিমিটেড
বড়োদ্রা, গুজরাত।

জাপানের **ন্যাশনাল প্যানাসোনিক**-এর মিলিত সহযোগিতার এক যৌথ উদ্যোগ।

Sista's/LNL/154/85 BEN A

বার্ধক্যের বারাণসীতে বিধবাদের শোষণ করা হচ্ছে



শেষ শ্রাবণের অপরাহ্ণ। গঙ্গা উত্তাল উদ্দাম বেগে উত্তরাভিমুখী। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল দশাশ্বমেধ ঘাট ডুবিয়ে উপরের রাস্তা ছুঁইছুঁই। তারই মাঝে চলছে শ্রাবণী মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের পুণ্যস্নান। পুণ্যার্জনের পথে সকলেই দেহ-মন পবিত্র রাখতে চান। তীর্থযাত্রীদের উপলক্ষ করে ভিখারির মেলা বসেছে গোধূলিয়া থেকে দশাশ্বমেধের পথে। বাবার বাহনদের গদাই-লস্করি চলন, সাইকেল রিক্সার বেপরোয়া স্পর্শ বাঁচিয়ে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ভিখারি, কানা খোঁড়াদের পাশেই বসে গেছেন বাঙালি বিধবারা—দু-মুঠো চাল বা পাঁচ-দশটা পয়সার আশায়। এইসব অশীতিপর, অশক্ত, অসুস্থ বৃদ্ধার দল দেব-মহিমান্বিত বারাণসীতে এসেছিলেন—জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটাবেন এই আশায়। কিন্তু মাসে ষাট টাকা 'বিধবা ভাতা'য় পেট চলে না। তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের পথে বসে গেছেন বাঙালি বিধবা রমণীরা।

সঙ্গী ফটোগ্রাফার পাহাড়ী রায়চৌধুরী সেইসব করুণাপ্রার্থী বিধবাদের ফটো তুলতে ক্যামেরার অ্যাপার্চার ঠিক করতে ব্যস্ত। হঠাৎ বাবার বাহন, অগণিত মানুষ, সাইকেল-রিক্সা, টাঙ্গার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে সার্কাসের কায়দায় মোটর বাইক চালিয়ে রাস্তা সাফ করতে করতে হাজির হলেন নিকটবর্তী থানার এক পুলিশ অফিসার। এই পুলিশ অফিসারের সামনেই পড়লেন এক সহায়-সম্বলহীনা বাঙালি বিধবা। সজোরে বুটপরা ডান পায়ের লাথি পড়ল বিধবার অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ান পানীয় জলভর্তি ঘটিতে। একটুর জন্য পাহাড়ী রায়চৌধুরীর ক্যামেরার লেন্স বেঁচে গেল ছিটকে ওঠা ঘটির আঘাত থেকে। কিন্তু ঘটির জলে ভিজে গেলেন পাহাড়ী। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওই পুলিশ অফিসারটির কাছে। বললাম, এটা কী হচ্ছে? দুর্বিনীত এই অফিসার ভিখারি খেদাতে খেদাতে বললেন, 'সাফা করলে।' উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিশ্ব-ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আসছেন বারাণসীতে। পথঘাট পরিষ্কার করা দরকার। তাই পুলিশ অফিসারটির এমন বেপরোয়া মেজাজ। ওদিকে সন্ত্রস্ত বিধবার দল কাঁপতে কাঁপতে ভিক্ষের ঝুলি থেকে ছড়িয়ে পড়া চাল-ডাল তুলে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্য ব্যস্ত।

আমরাও একটু সরে গিয়ে দাঁড়াই বাঙালিটোলার মুখে। গলির মুখে বসেছিলেন শিশিরবালা দেবী। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে-ছিলেন সামনের ফুটপাতে বিক্রির জন্য রাখা লাল শাকপাতার দিকে। এক আঁটি আট আনা। খুব ইচ্ছে কেনার। কিন্তু মাসিক ষাট টাকা পেনশনের থেকে কুড়ি টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে আট আনা দিয়ে কি লাল শাক কেনা যায়? তাই শিশিরবালা প্রতীক্ষা করেন ফুটপাতে বসে। যদি কেউ দয়া করে কিনে দেয়! দুটো শশা, আর এক আঁটি লাল-শাক হাতে তুলে দিয়ে শিশিরবালা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাশীতে কতদিন আছেন? হাঁফানিতে আক্রান্ত শিশিরবালা আস্তে আস্তে বললেন, 'তা বাবা, পনের বছর তো বটেই।' থাকেন কাশীর বাঙালিটোলার কুকুর গলিতে। কুকুর গলির আসল নাম কেবল গলি। এককালে নাকি প্রচুর কুকুর থাকত, তাই লোকমুখে নাম হয়েছে কুকুর গলি। কুকুর গলিতে বছর পনের আগে দিদির সঙ্গে এসেছিলেন বিধবা শিশিরবালা। কেন কাশীতে এসেছি? ডাঁটিভাঙা চশমার দড়িটা ঠিক করতে করতে বিধবা শিশিরবালা বললেন; 'আমার শ্রীরামপুরে নিজের বাড়ি ছিল বাবা। প্রথমে উনি গেলেন, তারপর ছেলে গেল। বউ তখন বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। আমি তখন আর কী করব বাবা, দিদির সঙ্গে এখানে চলে এলাম। আজ বছর-চারেক হল দিদিও মারা গেছে। সম্বল শুধু তিন মাস অন্তর পেনশনের ১৮০টি টাকা।' জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন পেনশন পাচ্ছেন? 'তা বছর চারেক হবে। আগে তো আমি পেনশনের জন্য দরখাস্ত করিনি। কারণ একটা বাড়িতে রান্নার কাজ করতাম। চলে যেত কোনরকমে। কিন্তু শরীরটা যেই খারাপ হয়ে গেল, তখন ওঁরা আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। এখন তো বাবা চোখে ভাল দেখি না, কানে শুনি না, শরীরে বড় কষ্ট। দু-মুঠো খাওয়াও জোটে না। ভগবান নিয়েও নিচ্ছেন না।' কান্নার আবেগ চাপতে পারে না অশীতিপর বৃদ্ধা।

গলির মুখ ছেড়ে ঢুকে পড়ি বাঙালি-টোলার ভিতরে। কিছু আলু ও পটল সওদা করে ঘরের পথে পা টিপে টিপে এগোচ্ছিলেন এক বাঙালি বৃদ্ধা বিধবা। থাকেন নারদঘাটে। নিজে থেকেই আলাপ করলাম। দশ বছর হল কাশীর বাসিন্দা। এই বিধবা বৃদ্ধার স্বামী মৃত্যুকালে স্ত্রীর জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেননি। পুত্রকন্যা কেউ নেই। আত্মীয়স্বজনও সুযোগ বুঝে সরে গিয়েছিল। উপায়ান্তর না দেখে বৃদ্ধা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কাশীধামে। শুনেছিলেন এখানে বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় দুবেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থান হয়ে যায়। কিন্তু হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত ভরসা উত্তরপ্রদেশ সরকারের দেওয়া 'বিধবা ভাতা' মাসিক ষাট টাকা, যা তিনমাস অন্তর একসঙ্গে ১৮০ টাকা হিসাবে বিধবারা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন। তবে নারদঘাটের এই বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু বাবা সবসময় এই টাকা সময়মত পাই না।' অভিযোগ, যিনি নারদঘাট, চৌষট্টিঘাট, দশাশ্বমেধঘাট এবং বাঙালি টোলার বিধবাদের পেনশনের টাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, স্থানীয় লোকের ভাষায় সেই 'দালালবাবু' সময় সময় বিধবাদের প্রাপ্য টাকা আটকে দেন। তাছাড়া আরও অভিযোগ তিনি নিজের 'বখরা'ও কেটে রাখেন। নারদঘাটের ওই বৃদ্ধা আমার হাত ধরে বললেন, দোহাই বাবা, এমন কিছু লিখ না যাতে আমরা যাও বা টাকা পাচ্ছি তাও

না আবার বন্ধ হয়ে যায়। ও লোক বড় সাংঘাতিক। এমনিতেই পিওনের সঙ্গে কথা বলে টাকা আটকে দেয়। আমরা খোঁজ করতে বললে বলে, টাকা আসে নাই। তখন এই শরীর নিয়ে ছুটি ডি এম-এর পেনশন অফিসে। তাঁরা বলেন, হ্যাঁ, আপনার নামে তো টাকা চলে গেছে। তখন ওঁর ('দালালবাবু') হাতে পায়ে ধরে বলি, দাও বাবা, আমার টাকা কটা। তখন পুরো পাই না। কিছু পাই। কিন্তু তিরিশ টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে, কটা টাকা থাকে যে দু মুঠো দুবেলা রোজ পেটে দেব! দেখ না, না খেয়ে খেয়ে শরীর ভেঙে যাচ্ছে। কতদিন শুধু আটাগোলা জল খেয়ে থাকা যায় বল তো বাবা! একমাস বিছানায় পড়েছিলাম, এই দশ-বারদিন হল উঠেছি। ওষুধ-বিষুধও কিছু পাইনি। কেউ নাই যে একটু সাহায্য করবে।' লাঠির উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধা। পকেটের মানিব্যাগ হাতে রাখি। বৃদ্ধা বুঝতে পারেন। ম্লান হেসে বলেন, 'তুমি তো বাবা আমাকেই শুধু দেবে। আমার মত সবাইকে কি দিতে পারবে? তার চেয়ে থাক।' লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। হঠাৎ কানে এল ঠক, ঠক, ঠক। তাকিয়ে দেখি. রুগ্ন বিধবা মহিলাটি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে প্রায়ান্ধকার শীর্ণ বাঙালিটোলার একটা বাঁকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

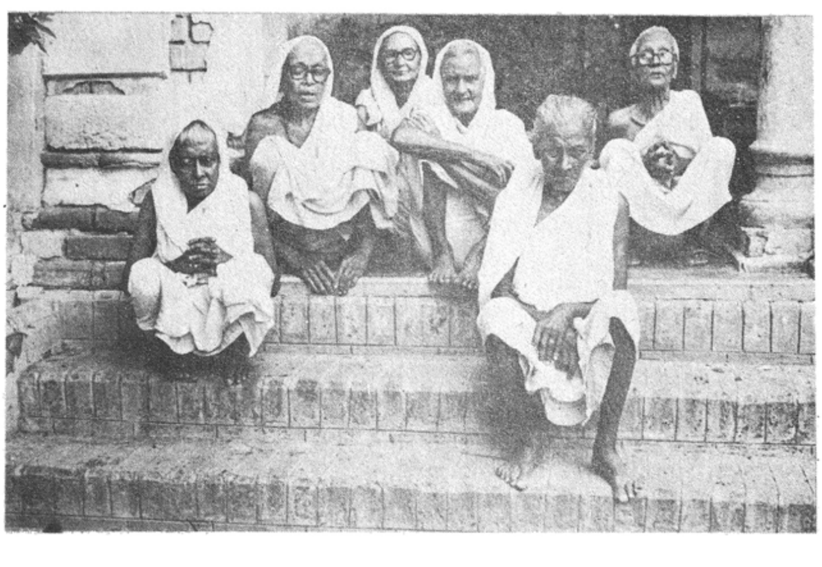
বিধবাদের শোষণ করা হচ্ছে

স্বামী বিবেকানন্দর কাছে এই ভারতের সমাজ ছিল, 'আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী'—সেই বারাণসীতেও ভারতের তথাকথিত সমাজ-ব্যবস্থায় নিঃস্ব রিক্ত আত্মীয়পরিজন পরিত্যক্তা বিধবাদের পর্যন্ত শোষণের হাত থেকে মুক্তি নেই। মাসিক বরাদ্দ মাত্র ষাট টাকাও তাঁদের কপালে সময় সময় জোটে না। 'দালালবাবু'-দের বদান্যতায় সেই সামান্য 'পেনশন'-এর টাকাতেও 'ভাগ বসান' হয়। কেন এটা হয়? এই প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হরিজন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক কর্মী জানালেন যে, প্রথমত সেইসব বিধবাদেরই পেনশন দেওয়া হয়, যাঁদের বয়স ষাট এবং সংসারে যাঁদের কেউ নেই। কিন্তু কীভাবে এ'রা 'উইডো পেনশন স্কিম'-এর আওতায় আসেন? ওই ভদ্রলোক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কথায় জানতে পারি, প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 'পেনশন অফিস' থেকে দরখাস্ত করার 'ফর্ম' নিতে হয়। সেই ফর্মে পেনশনের জন্য আবেদনকারিণী বিধবার আলোকচিত্র লাগিয়ে স্থানীয় এম এল এ, এম এল সি, এম পি বা যেকোন প্রথমশ্রেণীর গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে 'অ্যাটেস্টেড' করিয়ে নিয়ে, তা 'পেনশন অফিসার'-এর কাছে জমা দিতে হয়। এরপর চিফ মেডিক্যাল অফিসারের তরফে 'মেডিক্যাল টেস্ট' করা হয়। বেনারসের জনৈক সমাজসেবীর অভিযোগ, এই মেডিক্যাল টেস্টের জন্যও বিধবাদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা পয়সা নেওয়া হয়। বিধবারাও যে করে হোক দিয়ে দেন। কেননা নাহলে টেস্টের রিপোর্ট পাস হবে না।' মেডিক্যাল টেস্টের পর রিপোর্ট যায় জেলা তহশীলদারের অফিসে। সেখান থেকে আবার আরেক প্রস্থ 'ভেরিফিকেশন' হয়। জানা গেল, এখানেও নাকি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট 'পাস' করানর নামে নানান অব্যবস্থা চলে। সবশেষে সমস্ত 'ভেরিফিকেশন' রিপোর্ট যায় ডি এম-এর পেনশন অফিসারের দপ্তরে। তাঁরা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে, পেনশন দেবার অনুমতি দিলেই বিধবারা তিনমাস অন্তর ১৮০ টাকা করে ভাতা পান। স্থানীয় এক রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবী বললেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিধবারা হন অশিক্ষিত ও বয়েসের ভারে ন্যুব্জ! বেশি চলাফেরা করতে পারেন না। এত নিয়মকানুনও বোঝেন না। তারই সুযোগ নেন স্থানীয় দালালরা।' কাশীর এক বৃদ্ধ আইনজীবী অভিযোগ করলেন, 'অবস্থাটা এখন কী হয়েছে জানেন, যেই বিধবারা এসে গেল. দালালরা অমনি পেছনে পেছনে এসে গেল। অলিখিত একটা চুক্তিও হয়ে গেল —তুমি যা পাবে তার থেকে ১০-২০ টাকা আমায় দেবে। অনেক সময় পোস্টম্যানরাও এই দালালদের খবর দিয়ে দেয়, অমুক পাড়ায় তমুক নামে বিধবা এসেছে, পাত্তা লাগাও। আবার কখনও দালালরা নিজেরাই পিওনের পেছন পেছন এসে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে।'

এই শহরের পাতালেশ্বর অঞ্চলের এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ওই ভদ্রলোক জানালেন, তাঁর পাড়াতেই একজন নামকরা দালাল থাকে, যার আয়ের উৎসই হল বিধবাদের প্রাপ্য ভাতা থেকে 'পার্সেন্টেজ' আদায়। সারা বারাণসীতে নাকি প্রায় ১০০০ বাঙালি বিধবা আছেন, যাঁরা এই 'বিধবা ভাতা' পান এবং তিন চারজন দালাল আছে, যারা এইসব বিধবাদের শোষণ করে বেঁচে আছে।

বিধবা ভাতা নিয়ে সারা বারাণসীতে আজ প্রচণ্ড দুর্নীতি চলছে। স্থানীয় একদল বাঙালি যুবক জানালেন, 'এই দুর্নীতি বন্ধ করতে কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা আন্দোলনে নামছি। কারণ আজ থেকে বছর দুই আগে তৎকালীন ডি এম এই ব্যাপারটি নিয়ে এনকোয়ারিতে নেমেছিলেন, পেপারেও ফ্ল্যাশ হয়েছিল বিষয়টি। বর্তমান ডি এম আর এস টোলিয়াও এই বিষয়ে জানেন এবং উনিও ব্যাপারটি বন্ধ করতে আগ্রহী। আর আমরা স্থানীয় মানুষ যদি এগিয়ে না আসি তাহলে ডি এম-এর একার পক্ষে তো সম্ভব নয় এটা বন্ধ করা। কারণ পাড়ার কোন এক বিধবা বুড়ির কাছ থেকে কোন পিওন পাঁচ টাকা নিয়ে নিল. কী কোন দালালবাবু ২০ টাকা কেটে রাখল. তা তো ডি এম-এর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।'

স্থানীয় অনেকের কাছ থেকে জানা গেল. এই বিধবা ভাতার নামে বহু সঙ্গতিসম্পন্ন বিধবাদেরও পেনশন পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকী সধবা ও কুমারীরা পর্যন্ত এই পেনশন নাকি পাচ্ছেন। যদিও অভিযোগকারীরা



দুর্গাকুণ্ডের বিধবা গৃহে কয়েকজন বৃদ্ধা

নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আমাদের দিতে পারেননি। তবে বহু বিধবার সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখেছি, এইসব সহায়-সম্বলহীনা বৃদ্ধাদের কীভাবে দিনের পর দিন শোষণ করা হয়। কোন কারণে কোন বিধবা এক মহল্লা ছেড়ে অন্য মহল্লায় বাসা বাঁধলে, পুনরায় ভাতা পেতে তাঁকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক কৃচ্ছ্র-সাধন করতে হয়। অনেক সময় বিধবাদের সঙ্গে এমন 'এগ্রিমেন্ট' বা চুক্তি করা হয় যে, টাকা পেলে প্রথম মাসের টাকাটা 'দালালবাবু'কে তাঁর 'ফিস' হিসাবে দিতে হবে। কিংবা প্রতিবার কিস্তির টাকা এলে 'পিওন' ভাইকে পাঁচ টাকা এবং 'দালালবাবু'কে কুড়ি টাকা করে দিয়ে যেতে হবে। 'কেস' অনুযায়ী এই 'কমিশন'-এর 'রেট' ওঠানামা করে। এছাড়াও সধবা বা কুমারী অথবা সঙ্গতিপন্ন বিধবাদের ভাতা পাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে মোটা অঙ্কের 'কমিশন' মেলে 'দালাল' ও পিওনদের। আর নিরাশ্রয় নিরুপায় বৃদ্ধার দল, তাঁরা পুলিশের লাথি, ষাঁড়ের গুঁতো এবং তীর্থযাত্রীদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে শেষের সেদিনের জন্য প্রহর গুণে চলেন।

'খুব সুখে আছি বাবা'

কিন্তু একটা সময় ছিল, বার্ধক্যের বারাণসীতে বিধবারা এসে মোটামুটি সুখেই দিন কাটাতেন। পুজোআর্চা, সাধন ভজন ও দুবেলা দু মুঠো অন্ন এবং চলনসই একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলে যেত। তাই চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকী ষাটের দশকেও নাকি বছরে দু'হাজারের মত বিধবা এই কাশীধামে এসে আশ্রয় নিতেন। তবে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতায় বর্তমানে এই বিধবাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্থানীয় একটি পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক জানালেন, 'এখন শুধু বাঙালি নন, অবাঙালি বিধবারাও কেউ সাধ করে কাশীতে আসেন না। আর আগে যেমন অনেক বাঙালি একটা বাড়ি ভাড়া করে বিধবা মা, পিসীমা, মাসীমাদের রাখার বন্দোবস্ত করতেন, এবং মোটামুটি শ দেড়েক



ভিক্ষার পাত্র হাতে এক হতভাগিনী বৃদ্ধা

টাকা মাস গেলে ফেলে দিতেন। এখন অবস্থাটা অন্যরকম। তাই খামোখা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করতে, সাধ করে কষ্ট মাথায় নিতে কেউ কাশীতে আসেন না।'

তবে একটা সময় ছিল, যখন ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিধবারা স্বেচ্ছায় আসতেন, বাসস্থান ও দুবেলা অন্নসংস্থানও হয়ে যেত। কিন্তু আজ বিধবাদের সেইসব আবাসস্থল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ, মনুষ্যবাসের অযোগ্য। যেমন, কোচবিহারের মহারাজার কালীবাড়িতে এককালে প্রায় একশোজন বিধবা থাকতেন। বর্তমানে এই 'এস্টেটে'র রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন ট্রাস্ট-এর হাতে ন্যস্ত। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ কোচবিহারের সেই কালীবাড়ির ভগ্নদশা। এককালে বিধবারা অন্য যে সব বাড়িতে বাস করতেন, সেইসব বাড়িরও শুধু কাঠামোটাই রয়েছে, আর সব ভগ্নস্তূপে পরিণত।

কোচবিহার কালীবাড়ি ছেড়ে বেশ খানিকটা এগোতেই দুর্গাকুণ্ড। এই দুর্গাকুণ্ডেই রয়েছে একটি বিধবা আশ্রম। নাম 'বাংলাদেশের বৃদ্ধ অশক্ত মহিলা গৃহ। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হরিজন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই 'হোম' প্রথমে ভারত সরকারের পরিচালনাধীন ছিল। বর্তমানে এই 'হোম'-এর ইন্সপেক্টর ওঙ্কারনাথ খান্নার কাছ থেকে জানা গেল, প্রথমে এই বিধবা আশ্রমে তৎকালীন পূর্ব-বাংলা থেকে আগত প্রায় ৬০ জন বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে আশ্রিতা বিধবার সংখ্যা মাত্র ১৭। যেখানে কাশীর রাস্তায় ভিখ্যারি বিধবার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, সেখানে এই আবাসস্থলে বিধবার সংখ্যা এত কম শুনে প্রশ্ন করলাম, এর কারণ কী? ওঙ্কারনাথবাবু বললেন, 'এখানে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান মানে এখনকার বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালি হিন্দু বিধবাদেরই থাকতে দেওয়া হয়। যাঁরা প্রথমে এখানে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন, নতুন করে আর কাউকে নেওয়া হয়নি।'

এই আশ্রমের বিধবাদের সরকার থেকে মাসিক ৭৫ টাকা করে খাওয়া খরচ, পাঁচ টাকা করে কাপড় কেনার জন্য দেওয়া হয়। ওঙ্কারনাথবাবু জানালেন, 'এছাড়া এ'দের রেশন তুলে দেবার জন্য একজন চাপরাশি আছে। খাট, বিছানা ও মশারিও দেওয়া হয়েছে।' মারা যাবার পর, সৎকারের ব্যবস্থাও এ'রা করে থাকেন। তাছাড়া ওঙ্কারনাথবাবু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানীয় লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব এবং সত্য সাইবাবা আশ্রমের সহায়তায় মাঝে মাঝে এখানকার বিধবাদের জন্য অন্নদান, বস্ত্রদান এবং কীর্তন ও ভজন গানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কিন্তু এখানকার বিধবারা কেমন আছেন? ১৭ জন বিধবার মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা রঙ্গবালা দেবী ব্যঙ্গ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা খুব সুখে আছি, এত বড় বাড়ি দেখলিই হবে। আমাদের কোন অসুবিধাই নাই। খালি সুবিধা হচ্ছে আমাদের অসুখ-বিসুখ করলি পরে মেট্রোন হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান না।' তবে এই প্রসঙ্গে দুর্গাকুণ্ডের একজন অ্যাসিস্টেন্ট মেট্রোন বললেন, 'আসলে ও'রাই হাসপাতালে যেতে চান না।'

রঙ্গবালা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মাসিক ৭৫ টাকা খাওয়া খরচ যে পান, তাতে কি চলে?' এবার রঙ্গবালা দেবী খুবই ধীরে ধীরে বললেন, 'হয় না বাবা। চল্লিশ টাকার কয়লাই মাসে লাগে। একটা লোকের রান্না করতে তো ৫০০ গ্রাম তেল লাগেই। সেখানে ২৫০ গ্রামে কাজ চালাতে

হয়। তাতে কীরকম রান্না হয় বুঝতে পারছ? কালকে মুসুর ডাল এনেছি ৬ টাকা কেজি। ২৫০ গ্রাম দেড় টাকা লেগে গেল। পটলের কেজি ৬ টাকা। তা এই ৭৫ টাকায় কীভাবে হয় বল? জান বাবা, যখন আমার বয়স ষোলটোল হবে, তখন মুকুন্দ দাস গান গাইতেন 'সোনার ভারত হবে রে শ্মশান।' তখন মনে হত সে আবার কী? মনে হত সোনার ভারত আবার শ্মশান হয় কেমনে? কালে কালে তাই হয়ে গেল বাবা! ধরান্দর লোককে কাটতে লাগল স্বামী গেল, ছেলে গেল! সব গেল।' রঙ্গবালার দুচোখে জলের ধারা। মনে হল রঙ্গবালার চোখের জল বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকেই ব্যঙ্গ করল।

শুধু দুর্গাকুণ্ড নয়, সারা বেনারসে এইরকম আরো কয়েকটি বিধবা আশ্রম বা 'হোম' আছে। কিন্তু সব জায়গাতেই বিধবাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তবে 'হোম' বা এইরকম আশ্রমের বাইরে বিধবারা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তার তুলনায় এইসব আশ্রমের আবাসিক বিধবাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই এক সংবাদ সংস্থার অফিসে বসে স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক বলছিলেন, 'আজ থেকে বছর



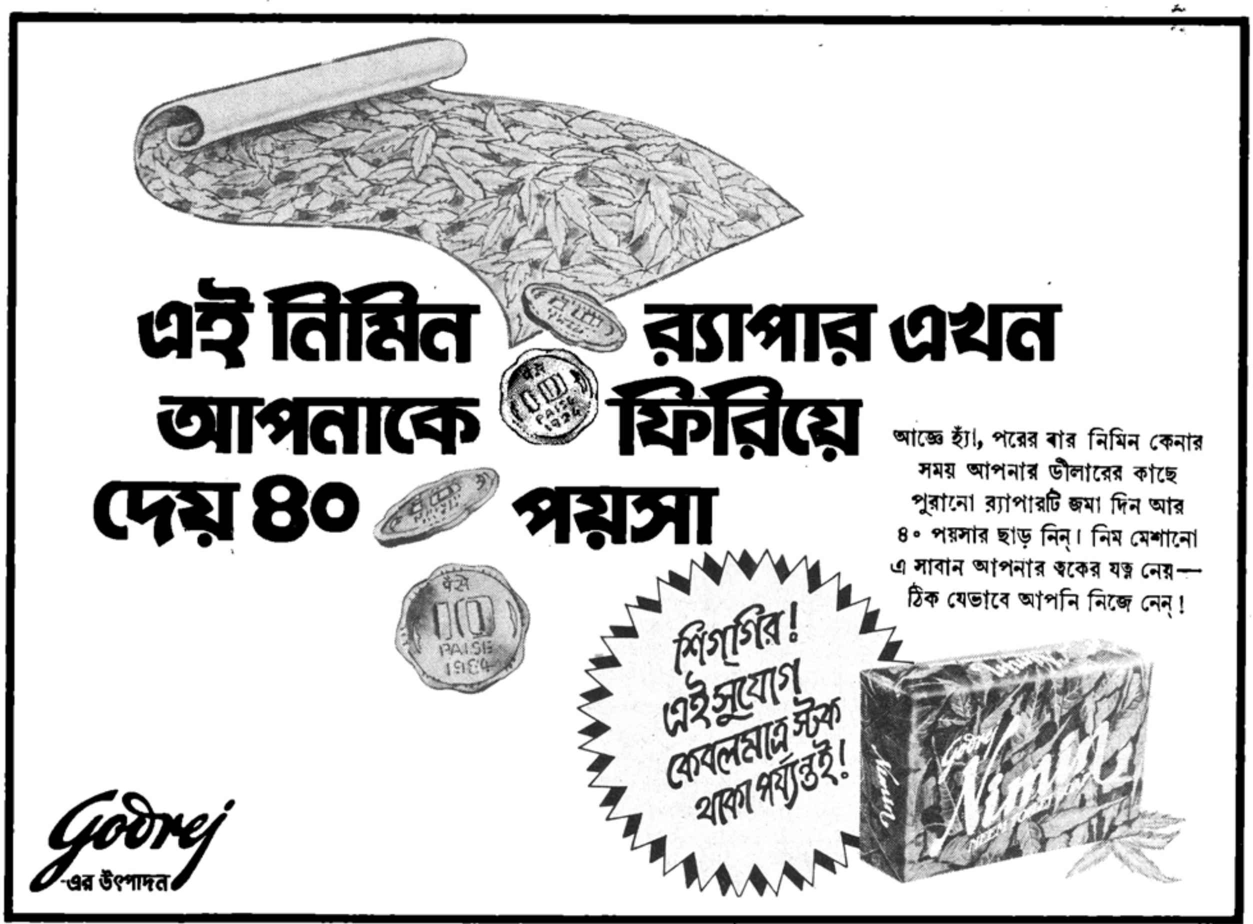
'কানে শুনি না বাবা' : শিশিরবালা

দুই আগেও মীরঘাটে প্রতিদিন একটা কীর্তনের আসর বসত। যেখানে বহু বাঙালি বিধবা গানবাজনা করে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই কীর্তনের আসর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিধবাদের ভিক্ষা ছাড়া কোন গতি নেই। এমনও হয়েছে, সাংসারিক অশান্তি সহ্য করতে না পেরে যে সব বিধবা এখানে এসেছিলেন, তাঁরা অবস্থা দেখে ফেরৎ চলে গেছেন।'

হরি দিন তো গেল......

মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মিথিলা, এমনকী নেপাল থেকেও অল্প-বয়সী বিধবাদের স্থানীয় আড়কাটিদের মাধ্যমে নতুন করে বিয়ে দিয়ে ঘর সংসার পাতার স্বপ্ন দেখিয়ে কাশীতে নিয়ে আসা হত, তারপর এ'দের স্থান হত ডালমণ্ডীর বাঈজী পাড়ায়। কিন্তু ডালমণ্ডীতে এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, এ'দের কেউ কেউ চলে যান শহর থেকে বেশ দূরে শিউদাসপুরে। সেখানে বাঈজীর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ভেতরে ভেতরে চলে আদিম ব্যবসা।

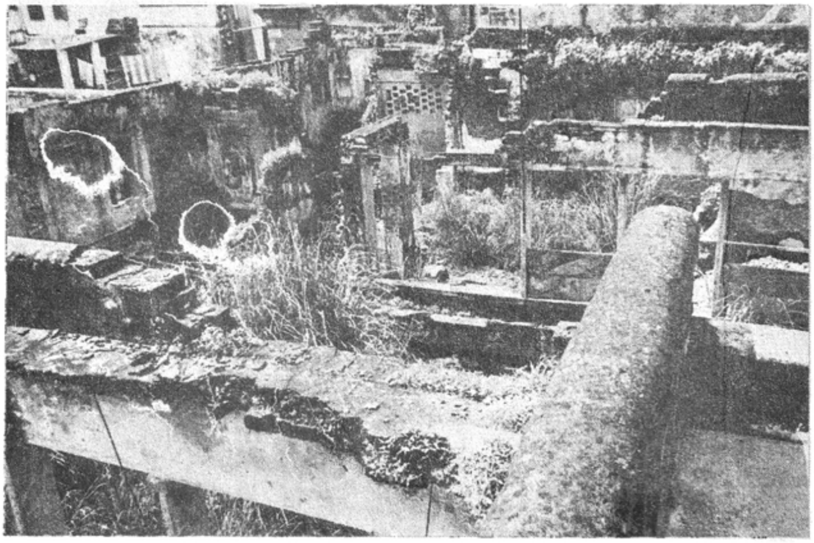
স্থানীয় লোকদের কাছে শোনা যায়, ১৯৭১ সালে ওপার বাংলা থেকে বেশ কিছু নিরাশ্রয় মহিলার আগমন ঘটেছিল বারাণসীতে। যাঁরা বয়েসে নবীন, স্বামী মৃত না হলেও খোঁজ ছিল না, এইসব যুবতীদের পরিচয় ছিল বিধবা। এ'দের কেউবা নিয়েছিলেন বারাণসী ঘাটে ভেড়া নৌকোর থেকে বালির ঝা'কা নামানর কাজ. কেউবা হয়েছিলেন শিউদাসপুরের 'কামানেওয়ালি'। কেউবা নিয়েছিলেন বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ। আর অন্যরা ভিড় জমিয়েছিলেন



CHAITRA-B G 342 BEN

মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের ভিখারিদের লাইনে।

আর কেউবা ৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় থেকে এঘাটে-সেঘাটে জীবনের তরী ভিড়িয়ে, শেষে লোকমুখে শুনে শুনে হাজির হয়েছিলেন বাবা বিশ্বনাথের থানে। কিন্তু জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে রামেশ্বরী দেবীর মত তাঁদের সকলেরই মনে হয়, সব স্বপ্ন তাঁদের ভেঙে গেছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে পেটে ক্ষুধার আগুনের জ্বালায়। রামেশ্বরী দেবীর মত আজ কাশীর সব বিধবাদের মুখেই একই বিলাপ শোনা যায়, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে।'



কোচবিহার কালীবাড়িতে বিধবাদের ভেঙে পড়া ঘর

'শুধু মরণের দিন গোনা'

শোনা যায়, কাশীতে বিধবাদের অবস্থা চিরকালই এমন শোচনীয়। একদা নাকি এই বিধবাদের ভিড়ে মিশে থাকতেন কলকাতার বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী, মা, পিসিমা বা নিকট আত্মীয়া। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কথায় জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের একজন মরমী কথাশিল্পীর পিসিমাকেও শেষ জীবনে এখানে ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। ওই ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনরা নাকি পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। ভদ্রমহিলা ভয়ে বেনারসে পালিয়ে এসে বাঈজীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তারপর জীবন-সায়াহ্নে বেঁচে থাকার জন্য ভিক্ষা করতেন কাশীর পুণ্যসলিলা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। তবে আমরা এইরকম কোন মহিলার সন্ধান পাইনি। কিন্তু যাঁদের সন্ধান পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি, এ'দের পরিবারের অবস্থা এক সময়ে ভালই ছিল। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সুখের সংসার ছিল। অবস্থার বিপাকে আজ তাঁদের কপালে জুটছে 'দালালবাবু'দের প্রতারণা, তীর্থযাত্রীদের কৃপণ হাতের দান আর আধপেটা খাওয়া।

পাণ্ডে ঘাটের একটি বাড়িতে বাস করেন পেনশনভোগী কয়েকজন বিধবা। জীর্ণ বসন, রুগ্ন শরীর নিয়ে এগিয়ে এলেন যামিনী দেবী। একদা বাড়ি ছিল ২৪ পরগণা জেলায়। কোথায় এবং কোন পরিবারের মানুষ ছিলেন, যামিনী দেবী তা বলতে চাইলেন না। শুধু বললেন, 'কী হবে এসব জেনে? পেনশনের যে কটা টাকা পাই তাতে চলে না।' যামিনী দেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করছিলাম ওঁদের থাকার ঘরটি। জানলাহীন, চারিদিকে ঝুল, জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে, যেকোন মুহূর্তে আরো খসবে, বিপজ্জনক অবস্থায় সেইসব ঘরে সিমেন্টের সুর্কির চাঙড় ফুলে ফুলে আছে। তাই বললাম, 'এই ঘরে থাকেন কীভাবে?' ঘর থেকে বেরিয়েই ছাদ। সামনে গঙ্গা। ফুলে ফুঁসে উঠছে ঢেউ। একটা ছুটন্ত ঘূর্ণির দিকে তাকিয়ে যামিনী দেবী বললেন, 'কোথায় আর যাব! মাসে এক টাকা চার আনা ভাড়ায় আর কোথায় থাকতে পাব? এখানে থাকা মানে তো মরণের দিন গোনা।'

যামিনী দেবীর সঙ্গে কথা শেষ করে বাড়ির ভিতরে ঢুকি। অন্ধকার সব ঘর। এমন পয়সা নেই হাতে যে, একটু কেরোসিন তেল কিনে আলো জ্বালাতে পারেন। নব্বই বছর বয়স্কা বিধবা শান্তিমণি বণিক প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলেন। বার্ধক্যজনিত অসুখ ও হাঁপানিতে আক্রান্ত শান্তিমণি বললেন, 'আর পারি না বাবা, ভগবান কেন আমায় নিচ্ছেন না? একটু ওষুধ পাই না। একটু ভাত পাই না। মাত্র দেড়শোটা টাকা তিন মাসে চলে কীভাবে বল! দুটো মানুষ আমরা।' দেখলাম ঘরে শান্তিমণির ছেলে এক কোণায় বসে আছে। ছোটবেলা থেকেই নাকি মস্তিষ্ক বিকৃত। দেড়শো টাকা মাত্র হাতে পান। অথচ পাওয়া উচিত একশো আশি টাকা। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক বললেন, 'অর্ধেক দিনই মা ছেলে না খেয়ে থাকে। আমরা যে যা পারি একটু দিই। কিন্তু আমাদেরই বা সঙ্গতি কতটুকু!'

শান্তিমণি দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ছাদে। আলসের ধারে বিধবা রামেশ্বরী দেবী দু'হাত জড়ো করে বসে। চোখের দৃষ্টি উদাস। সামনে বয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। সামনে এসে দাঁড়ালেন যামিনী দেবী। জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা যে এসব কথা লিখবে, এতে কি আমাদের মাসোহারা বাড়বে বাবা?' উত্তর দিতে পারিনি। শুধু দু-হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলি, 'আজকে আসি তাহলে।' প্রতিনমস্কার জানিয়ে যামিনী দেবী বললেন, 'এসো বাবা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তাড়াতাড়ি যেন মরি।' ☐



'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' : শান্তিমণি

সঞ্জয় সিংহ

ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী



আরও ফ্লেভার! আরও স্বাদ! প্রতিদিন!
“মা, আমাকে আরও একটু দাও!”
হ্যাঁ ! প্রতিদিন রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিলে বাড়ীর সবাই আরও চাইবে। ম্যাগী কিউবস্ আপনার রান্নায় আরও ফ্লেভার, আরও স্বাদ এনে দেবে। ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে রান্না করা খুবই সহজ।
বিনা নুনের রান্না প্রায় হয়ে এলে ম্যাগী কিউবস্ গুঁড়ো করে খাবারের ওপর ছড়িয়ে দিন। (মাথা পিছু একটি কিউব দিলেই চলবে) তারপর ভাল ভাবে নাড়ুন আর রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু আঁচে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।
ম্যাগী কিউবস্ চিকেন এবং ভেজিটেরিয়ান প্যাকে পাওয়া যায়। একটি অথবা সাশ্রয়ী তিনটির প্যাকে পাবেন।
আজই রান্নায় ম্যাগী কিউবস্ দিয়ে দেখুন।
MAGGI
CHICKEN CUBE
MAGGI
CUBE
100% VEGETARIAN
MAGGI®
কিউব
কেবল মাত্র বাছা বাছা শহরে পাওয়া যাচ্ছে।

চীনের আকাশে নতুন তারা—৩

মানুষের মুক্ত চিন্তার অধিকার চীনে আবার স্বীকৃতি পাচ্ছে

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

লাঞ্চের পর আমরা নদীর ওপারে গোয়াংচো রেফ্রিজারেটর কর্পোরেশনের কারখানা দেখতে গেলাম।

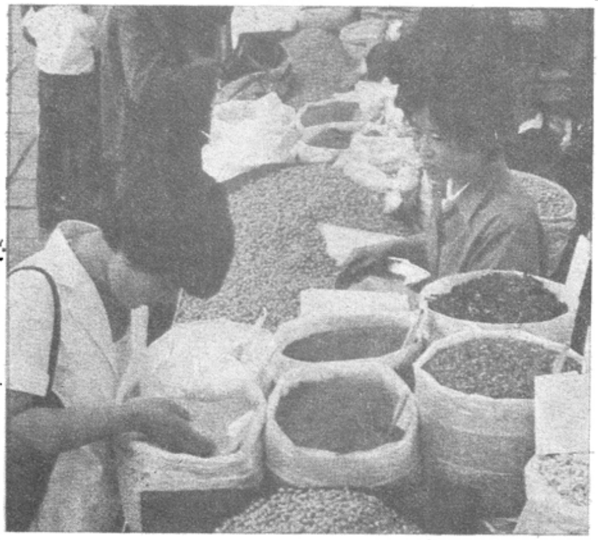
চীনের অফিস বাড়ি, কলকারখানা আমাদের দেশের মতই সাদামাটা। তবে বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মারা নেই। সিঁড়িতে পানের পিক নেই। ইদানীং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জোর প্রচার চলছে। চীনাদের পথে ঘাটে থুতু ফেলা অভ্যেস বলে আইন করা হয়েছে থুতু ফেললে জরিমানা হবে। প্রকাশ্য রাস্তার ধারে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসে পড়া চীনে কেউ কল্পনাও করতে পারেন না।

কারখানার অফিসে লাউঞ্জে আমরা বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রথামত সুদৃশ্য কাপে করে পাতা চা এল। সেই সঙ্গে লিচু। জুলাই মাস লিচুর সময়। আর ক্যান্টনের লিচু বিখ্যাত। খেতেও অত্যন্ত সুস্বাদু। মিষ্টি। বিচি খুবই ছোট।

জেনারেল ম্যানেজার দেন ঝাও ঝেন এলেন। চীনে মানুষের জীবনযাত্রা এত অনাড়ম্বর যে পোশাক দেখে বোঝা যায় না কে কোন কাজ করেন। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে লালিত হওয়ায় উচ্চপদের লোকদের আচার আচরণে কোন অভিজাততন্ত্রের ছাপ পড়ে না। দেনকে দেখে একজন সাধারণ শ্রমিক বলেও মনে হতে পারত।

এদের দুটো কারখানায় বছরে তিন লক্ষ রেফ্রিজারেটর তৈরি হচ্ছে। সব শুদ্ধ আটটি কারখানা এই গ্রুপের। একটি কারখানায় ৫০ হাজার ফ্রিজার ও ৫০ হাজার এ সি মেশিন তৈরি হয়।

১৯৮১ সাল থেকে এই কারখানায় ফ্রিজ তৈরি হচ্ছে। তার আগে চীনে ফ্রিজ তৈরি হত না। ফ্রিজ ব্যবহার আগের জমানায়



চীনের খোলা বাজার। ফটো: সংগৃহীত

বুর্জোয়া-সুলভ বিলাস বলে গণ্য হত।

এখন চীনে বছরে ১০ লক্ষ ফ্রিজ তৈরি হচ্ছে। আগে ফ্রিজ ব্যবহার হত শুধু হাতপাতালে। এখন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ফ্রিজ বিক্রি হচ্ছে। এ পর্যন্ত গোয়াংচো শহরের শতকরা দশ জনের ফ্রিজ আছে। তবে ফ্রিজ কিনতে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে কেনা যায় না। ফ্রিজ কেনার জন্য নাম লিখিয়ে বসে আছেন সারা চীনে ৫২ লক্ষ লোক। একটা ওয়ালবু ফ্রিজের দাম ৯০০ ইউয়ান অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা।

দেন বললেন: ফ্রিজ তৈরির জন্য যে দক্ষ কারিগরি বিদ্যার দরকার তা আমাদের দেশে এখনও পর্যাপ্ত নেই। নতুন ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হচ্ছে। তাই উৎপাদন ত্বরান্বিত হচ্ছে না। আমরা এখন একশো টেকনিশিয়ানকে জাপানে পাঠিয়েছি তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে আসার জন্য। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ডাকছি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

দেন বললেন: আমাদের এখানে সর্বনিম্ন বেতন ১৫০ ইউয়ান এবং সর্বোচ্চ বেতন ২৮০ ইউয়ান যেটি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট পান (এক ইউয়ান = ৫ টাকা)। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। একদিন ছুটি। সাত বছর চাকরি না করলে অর্জিত ছুটি বা ক্যাজুয়াল লিভ নেই। এর মধ্যে অনুপস্থিত হলে বেতন কাটা যায়। বোনাসও কাটা যায়। সাত বছর কাজ করার পর তবে অর্জিত ছুটি পাওয়া হয়। যিনি যত বছর চাকরি করেন সেই অনুপাতে অর্জিত ছুটি জমে। সিনিয়ররা বছরে ১৫ থেকে ২৫ দিন অর্জিত ছুটি ভোগ করেন। এটাই সর্বোচ্চ ছুটি। বিয়ে করলে ও অসুস্থ হলে ছুটি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য কারণে অনুপস্থিত দিনগুলিতে ছুটি মেলে না। মেয়েরা তিন মাসের মেটার্নিটি লিভ পান। কিন্তু সেটি প্রথম সন্তানের বেলায়। চীনে পরিবার পরিকল্পনা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখন সরকারি নীতি হল: এক বাচ্চা, ঔর বাস। দ্বিতীয় বাচ্চা হলেই নানা মুশকিল। তখন আর মা তিন মাসের ছুটি পাবেন না। তাঁকে দেড় মাসের ছুটি নিতে হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় বাচ্চা হলে ধরে নেওয়া হয় তিনি সরকারি নীতির বিরোধিতা করলেন। এজন্য কোন কারণে (যদি প্রথম বাচ্চা প্রতিবন্ধী হয় বা মারা যায়) যদি দ্বিতীয় বাচ্চা কেউ চান তাহলে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

দেন বললেন: বিয়ের পর বাচ্চা কাচ্চা হলে দম্পতিকে একটু ভাল ফ্ল্যাট দিতে হয়। আমাদের প্রতি বছর এজন্য কোটা করা থাকে। যাঁরা বিয়ে করতে চান তাঁদের বিয়ের আগে ও বিবাহিতদের বিয়ের পরে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা ক্লাস নিয়ে থাকি। ওই ক্লাসে ঠিক করা হয় কোন বছর কার ছেলেপুলে হবে। কারণ যে সন্তান আসছে সে যাতে ভালভাবে থাকতে পারে তা দেখার দায়িত্বও আমাদের। এক বাচ্চার পরিবারেরা সরকার থেকে নানাভাবে উৎসাহ পান। যেমন ফ্ল্যাট, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, বাচ্চার শিক্ষা সমস্ত কিছুর জন্য কারখানা ব্যবস্থা রাখে। দ্বিতীয় বাচ্চা হলেই আর এইসব সুবিধা মেলে না।

দেন বললেন: আমার কারখানার কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনার দিকটা দেখার দায়িত্বও আমার। যদি আমার কারখানার কর্মীদের অপরিকল্পিত বে ছেলেমেয়ে হয় তাহলে তার জন্য দায়ী হব আমি। আমাকে সরকার জরিমানা করবে। তখন আবার আমাকে জরিমানা করতে হবে অবাধ্য কর্মীদের। তবে এখনও পর্যন্ত আমাদের কারখানার সব কর্মী আমাদের অনুশাসন মেনে চলছেন।

এই কঠোর অনুশাসনের ফলে চীনে এখন তরুণ দম্পতিদের একটির বেশি বাচ্চা দেখা যায় না। ওয়ান-চাইল্ড ফ্যামিলি' এখন বেশ গর্ব করে বলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের চীনা ছেলেমেয়েদের আর কোন ভাই বা বোন থাকছে না। তারা মানুষ হচ্ছে কিণ্ডারগার্টেনে আরও সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ছুটির দিনে মা বাবাই তাদের বন্ধু। এর ফলে এক সন্তান হবার যে সব মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তা প্রকট হয়ে উঠছে। কিন্তু চীনের মানুষ মনে করছেন দেশকে যদি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এভাবে পরিবার

পরিকল্পনার কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অনুশাসনও খুব কড়া। চীনেও কোন কর্মীকে ছাঁটাই করতে গেলে এমনকী ওভারটাইম প্রবর্তন করতে গেলে ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়া উপায় নেই। শ্রমিক অসন্তোষ ওদেশে বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে না। অথবা ধর্মঘট বা কাজ বন্ধ একেবারে অশ্রুত ঘটনা। কিন্তু মানুষ যখন, তখন অসন্তোষ তো থাকবেই। দেন বললেন: আমাদের বোনাস প্রথা চালু করার ফলে এখন আর শ্রমিকদের মধ্যে কোন অসন্তোষ নেই। তাঁরা খুশি।

চীনে এখন ধীরে ধীরে সরকারি কারখানাগুলিকে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এতদিন ধরে কারখানাগুলির ওপর ব্যুরোক্রাটিক নিয়ন্ত্রণ প্রবল ছিল। ম্যানেজাররা নিজেরা কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিতে উৎপাদনশীলতা কমে আসছে এই অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে। চীন এখন এর কুফল বুঝতে পারছে। এখন ডাইরেক্টরদের আরও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ডাইরেক্টররা এখন কর্মীদের কত বেতন হবে, তাঁদের কী সুবিধা দেওয়া হবে তা ঠিক করতে পারেন। চীনে কারখানার ডাইরেক্টররা নির্বাচিত হন কর্মীদের ভোটে। ম্যানেজার প্রফেশনাল ব্যক্তি। তিনি ডাইরেক্টরদের নীতিকে প্রতিফলিত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ডাইরেক্টররা যেহেতু কর্মীদের ভোটে নির্বাচিত, সেহেতু সরকার ও কারখানা কর্মীদের মধ্যে কোন নীতিগত বিরোধ উপস্থিত হলে তাঁরা কর্মীদের দিকেই ঝুঁকছেন। সরকার চাইছেন কারখানাগুলি রাষ্ট্র নির্দেশিত পথেই চলুক। শ্রমিকরা স্বভাবতই তাঁদের স্বার্থকে বড় করে দেখছেন। এমন দোটানার মধ্যে ডাইরেক্টররা কোনদিকে ঝুঁকবেন—সরকারের দিকে, না কর্মীদের দিকে? এ নিয়ে এখন যথেষ্ট বিতর্ক হচ্ছে। আমি থাকতে থাকতে চায়না ডেইলিতে একটি প্রবন্ধ দেখলাম। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার কার লোক? সরকারের—যে সরকার নাকি কারখানার আসল মালিক, না বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের—যারা শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি? চায়না ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টর্স ওয়ার্কস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন কয়েকজন ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টরের মতামত নিয়েছেন। তাঁরা এক একজন এক একরকম বলছেন। কেউ বলছেন সবার ওপরে স্টেটই প্রধান। আবার কেউ বলছেন যদি কারখানা কর্মীদের স্বার্থ উপেক্ষা করা হয় তাহলে স্টেটের স্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব নয়। একজন ডাইরেক্টর বলেছেন: নতুন নিয়মের ফলে ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টদের হয়েছে শ্যাম রাখি না কুল রাখি গোছের অবস্থা। আমাদের এখন সরকার ও কর্মী সবাইকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আগে কোন কারখানায় বোনাস দেওয়া হবে কিনা, ওয়েলফেয়ার দেওয়া হবে কিনা, এ সবই ঠিক করত সরকার। এখন সব দায়িত্ব বর্তেছে ডাইরেক্টরদের ওপর। শ্রমিকরা চটতে পারেন এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া তাঁদের পক্ষে এখন মুশকিল। কারণ শ্রমিকদের সহযোগিতা ছাড়া উৎপাদন বাড়ান যাবে না। উৎপাদন না বাড়লে লাভ বাড়বে না। সেই সঙ্গে এটাও নিয়ম করতে হবে যে কোম্পানির লাভ বাড়লে যেন কর্মীদের সুযোগ সুবিধা বাড়ে। এই সব থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চীনে এখন প্রকাশ্যে যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে সরকারি নীতির সমালোচনা করা যাচ্ছে। নিজেদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে, আগের মত ওপর থেকে একটা নীতি জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে ক্ষমতাকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রতিদিন 'চায়না ডেইলি' পড়লেই বোঝা যায় চীন এখন এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এতদিন বদ্ধ জীবনের পর মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। অনেকে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে। কিন্তু চীনে রাষ্ট্রব্যবস্থাই এমন যে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে একদিনের মধ্যে স্বাধীনতার সমস্ত অপব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিবেদন করি।

সমাজতান্ত্রিক দেশ মানেই স্বর্গ আর ধনতান্ত্রিক দেশমাত্র নরক একথা যাঁরা বলেন আমি তাঁদের দলে নেই। তবে সমাজতন্ত্রে ধনতন্ত্রের মত শোষণ নেই। এই সমাজে সাধারণ মানুষের জীবনের উৎকর্ষ তুলনামূলকভাবে বেশি। দুর্নীতিও কম। কিন্তু একবারে সব কিছু দূর হয়ে গেছে একথা বলার কোন মানে হয় না। ও'রাও তা বলেন না। মানুষ মানুষই। মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে না। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষ কখনও কখনও পশুতে পরিণত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এমন এক আদর্শ পরিবেশ রচনা করতে চায় যাতে করে পরিবেশের চাপে মানুষ পশু না হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের জন্মগত প্রবণতা থাকে লোভ-পাপ আর অন্যায়ের দিকে হাত বাড়ানর। ধনবাদী সমাজে আবার ঈশ্বর বলে একটি বস্তু আছে, পরলোক আছে, পাপ-পুণ্য বোধ এবং ভয় আছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সে বিশ্বাস তো নেই। আমি ঘুষ নেব না—ঘুষ খাওয়া পাপ বা ঘুষ খেলে ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবেন এই বোধ তো সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। কারণ জড়বাদী দর্শন তো বলেই দেয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তবে সাধারণ নীতিবোধ তো আছে. দেশপ্রেম আছে। আছে আবাল্য শিক্ষা—আমার যা প্রয়োজন তার বেশি আমার নেবার অধিকার নেই। অধিকাংশ লোক এই নীতি বোধ দ্বারা চালিত হন। কিন্তু কেউ কেউ নাও হতে পারেন। কাজেই কিছু সংখ্যক লোভী মানুষ আরও পাবার আশায় সমাজতান্ত্রিক সমাজেও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

চীনে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিছু কিছু লোক তার অপব্যবহার করেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু কিছু নেতা হাতে ক্ষমতা পেয়ে এমন অপব্যবহার করতে শুরু করলেন যে সমস্ত মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠলেন।

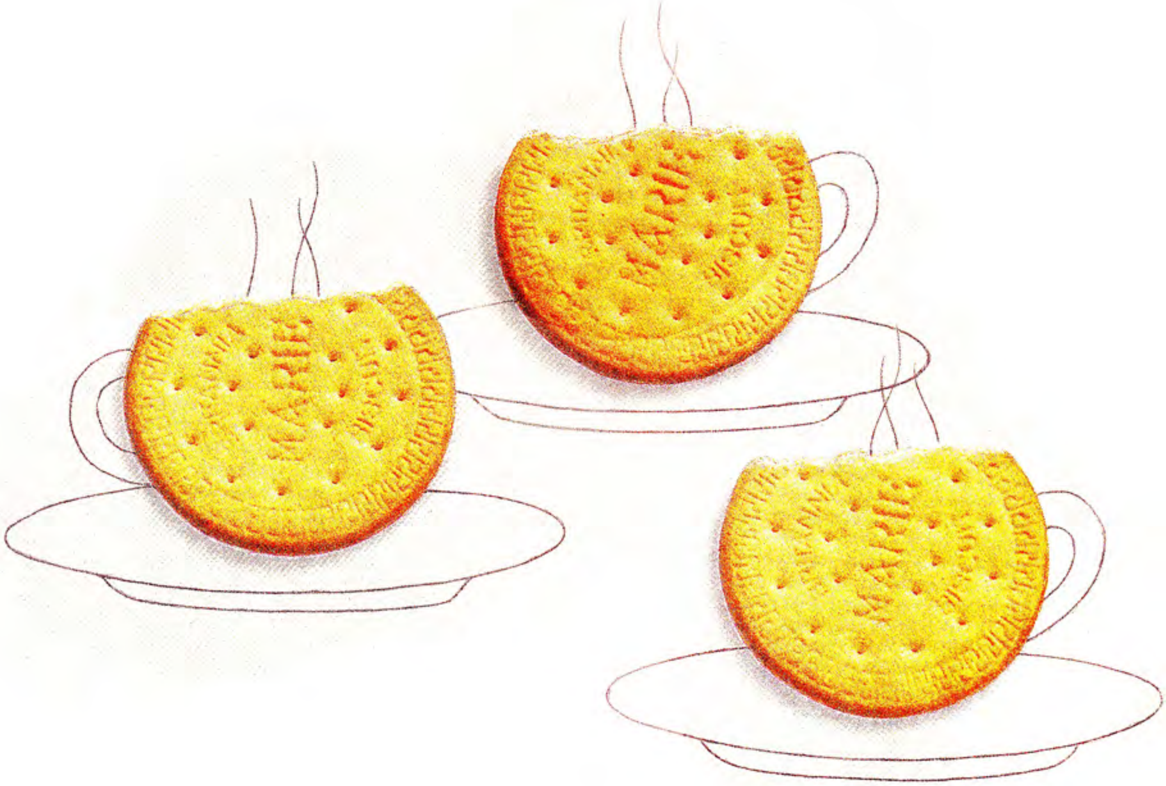
সমাজতান্ত্রিক দেশে আর একটি প্রবণতা থাকে, যেহেতু দেশে এক দলের শাসন, জনসাধারণ শান্ত ও সংযত সেহেতু এস্ট্যাব্লিশমেন্ট বেশ শক্তিশালী। তারা অন্যায় করলেও বলার কেউ নেই। এর ফলে অন্যায় করার প্রবণতা অনেক সময় বৃদ্ধি পেতে পারে। চীনের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উদাহরণ দিই। ঘটনাটি আমি থাকতে থাকতেই 'চায়না ডেইলি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

জিলান ফেরাস অ্যালয় ফ্যাক্টরি চীনের বৃহত্তম ফেরাস অ্যালয় কারখানা। ছহাজার লোক কাজ করেন সেখানে। এই কারখানার নজন নেতৃস্থানীয় অফিসার নিজেরাই নিজেদের প্রমোশন দিয়ে দিলেন। অল্প সময়ের ভেতর লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেদের বেতন পাঁচগুণ করে দিলেন তাঁরা। ডেপুটি ডাইরেক্টর চেন চি ১৯৮২ সালে এই কারখানায় যোগ দেন। এর মধ্যে তাঁর ছবার প্রমোশন হয়। তাঁর মাসিক বেতন ৬৬ ইউয়ান থেকে ১৪১ ইউয়ানে দাঁড়ায়। তাঁর বেতন বৃদ্ধির হার ৭'৫ গ্রেড। অন্যদিকে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ১.৫ গ্রেড। কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া হয়েছে ৪০০ ইউয়ান। সে জায়গায় নেতারা বোনাস পেয়েছেন প্রত্যেকে ১৮০০ ইউয়ান করে। একজন পার্টি সেক্রেটারি যিনি চার মাস হল জয়েন করেছেন, তিনি বোনাস পেয়েছেন ৯০০ ইউয়ান। কারখানার এই কর্তাব্যক্তিরা নানা ছলছুতো করে ১৮ রকমের নগদ পুরস্কার নিয়েছেন। যেমন উৎকর্ষ পুরস্কার, বিদ্যুৎ বাঁচানর পুরস্কার, শৃঙ্খলা পুরস্কার ইত্যাদি। আর কর্মীদের ভাগ্যে পুরস্কার জুটছে সামান্যই।

পার্টি কমিটি এই সব নেতাদের এখন নিন্দা করছেন। পার্টি এখন বলছে ডাইরেক্টররা দুবছরে দুটোর বেশি প্রমোশন পেতে পারেন না। তাই তাঁরা যে সব টাকা নিয়েছেন, এখন সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হোক। ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়ার ব্যাপারেও শিল্পগুলি আশ্চর্যভাবে - পুঁজিপতি দেশের শিল্পপতিদের মত আচরণ করছে।

চীনে শহরাঞ্চলের শিল্পগুলির বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ আর গ্রামীণ শিল্পের বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ। অনেক শিল্প তাদের লভ্যাংশ লগ্নি না করে আবার ব্যাঙ্ক ঋণ নিচ্ছে। ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে একটা শৃঙ্খলা আনার জন্য ব্যাঙ্ক অব চায়না বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নানা নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশের একটা মাত্র অর্থ: চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঋণ দেবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন



চায়ের মজা জমে ভারী, থাকলে তার সাথে ব্রিটানিয়া মারী!



ব্রিটানিয়া
মারী
বিস্কুট

ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না—গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ নেই, চীনে ঠিক তার উল্টো। এদেশে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি হোর্ডিং। সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি জানাচ্ছে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে তার সারমর্মটি একবার পড়ে নেওয়া দরকার। দেখা দরকার তার ভেতরে কোন মিথ্যা দাবি বা অশ্লীল কিছু আছে কিনা। থাকলে তা বাদ দিতে হবে।

কনজিউমারিজম আসার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সমাজে পার্থিব জিনিসের জন্য লোভ বাড়ে। অমুকের ফ্রিজ আছে, আমারও একটা ফ্রিজ চাই। অমুকের টি ভি আছে, আমারও টি ভি চাই। আমার সাদা-কালো টি ভি আছে। যতক্ষণ না রঙিন টি ভি কিনতে পারছি মনে সন্তুষ্টি নেই। আমেরিকায় দেখেছি একটা ভাল গাড়ি দেখলে লোকে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। তুলনায় তখন তাঁদের নিজেদের গরিব মনে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে কনজিউমারিজম এসেছে। হাঙ্গেরিতে একটা গাড়ি কেনার টাকা জমাবার জন্য মহিলারা গর্ভপাত ঘটান। কারণ ছেলেপুলে হলেই খরচ, গাড়ি কেনার টাকায় হাত পড়বে। অথচ হাঙ্গেরিতে লোকসংখ্যা কম। সরকার চাইছে লোকসংখ্যা বাড়ুক। চীনে এতদিন দারিদ্র্য বণ্টন করে সকলে সমান সুখে বা দুঃখে ছিল। এখন দেশ আরও শিল্প-সমৃদ্ধ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভোগ্যপণ্য কিনতে পারছেন। এইবার চাঞ্চল্য জাগছে। আগে চীনা মেয়েরা কসমেটিক্স ব্যবহার করতেন না বললেই চলে। এখন কসমেটিক্সের দোকানে দারুণ ভিড়। আগে মেয়েদের পোশাক ছিল সাদাসিধে। এখন মেয়েরা রকমারি পোশাক পরছেন।

ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসক্তি খারাপ বলে আমি মনে করি না। কারণ আমি আধুনিক মানুষ। মানুষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করবে। এতেই তার সহজাত আনন্দ। বিজ্ঞান তার হাতে এই সুখ ও আনন্দের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ভোগ্যপণ্যেরই একটা ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। একটি মেয়ে নিশ্চয়ই ভাল সাজগোজ করবেন। কারণ এই সাজগোজের মধ্যে ফুটে ওঠে তাঁর রুচি, মানসিকতা, সৌন্দর্যবোধ। তাঁর জীবনযাত্রার জন্য নিশ্চয়ই দরকার ফ্রিজ, কুকিং রেঞ্জ, ওয়াশিং মেশিন, টি ভি। এমনকী তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি থাকাও দরকার। কারণ গাড়ি তাঁকে দেবে মুক্তি। কিন্তু এহ বাহ্য। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য কোয়ালিটি অব লাইফ অর্থাৎ জীবনের উৎকর্ষ বাড়ান। আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরাও এই জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কথা বলে গেছেন। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারাও এই কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন, মানুষ যখন আদর্শ মানুষে পরিণত হবে তখনই তৈরি হবে কম্যুনিস্ট সমাজ। ভারত বলছে জীবনের উৎকর্ষ বাড়াতে গেলে ত্যাগ করতে হবে। ভোগ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগ। সমাজতন্ত্র বলছে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি না ঘটালে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন না ঘটালে কখনই মানুষ মুক্ত হবে না। আগে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দাও, মানুষকে চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ কর। তাহলেই দেখবে মানুষ আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করছে না। সব কিছু চলছে শৃঙ্খলার সঙ্গে। এই আদর্শ অবস্থার নামই কম্যুনিস্ট সমাজ।

আমাদের ঋষিরা ও কার্ল মার্ক্স সকলের লক্ষ্যই এক : মানুষকে উন্নত মানুষে পরিণত করা। পথ নিয়ে শুধু মতভেদ।

ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এখন জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে ধনবাদী দেশগুলিকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। এখন একজন রুশী এঞ্জিনিয়র ও একজন আমেরিকান এঞ্জিনিয়রের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে তফাৎ এমন কিছু নয়। এঁর হয়ত দুটো গাড়ি, ওঁর একটি। ইনি হয়ত বাংলোতে থাকেন, উনি হয়ত তিন রুমের কামরায়। ইনি হয়ত দুশো ডলারের স্যুট পরেন, উনি হয়ত দেড়শো ডলারের।

চীন এখন দ্রুত কনজিউমার সমাজে পরিণত হতে চাইছে। খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা প্রথম জীবনে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শেখেন, দারিদ্র্য ভোগ করেন, তাঁরা বড় হয়ে স্বভাবতই চাইবেন একটু ভালভাবে থাকি। আর পাঁচজনের মত আমার জীবনযাত্রার মান বাড়ুক। কিন্তু জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি মানেই যে জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি নয় একথা অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। চীনের এই দ্রুত আর্থিক সমৃদ্ধি, তার এই ভোগবাদ সামাজিক লক্ষ্যের পক্ষে সহায়ক হবে কিনা, তা নিয়ে চীনের অনেক চিন্তাবিদ সংশয় প্রকাশ করছেন।

আমি ১৯৮৫ সালের ১৮ জুলাই 'চায়না ডেইলি'তে প্রকাশিত, এক চীনা লেখক তোং গাং-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। তোং যা যা লিখেছেন তা হুবহু উদ্ধৃত করলাম :

'আজ চীনের পরিবর্তিত জীবনধারার বিষয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে। জনসাধারণকে বোঝান হচ্ছে যে এই সব সংস্কার চীনা জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য।

একথা সত্যি যে এই সংস্কার চীনের জনগণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যখন ফ্রিজ, রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় আরও বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে যেন অবহেলা করা হচ্ছে : এর বদলে আমাদের এই আধুনিকতা আন্দোলনে জীবনযাত্রার মানের প্রতি বেশি জোর দেওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি না, জীবনযাত্রার মান বাড়লেই বহু লোকের প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাত্রা উন্নত হবে। উন্নত জীবন জীবনযাত্রার মান ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

'চায়না ডেলি'তে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রবন্ধ। তাতে বলা হয়েছে গত ছবছর ধরে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটছে। শহরের চেয়ে গ্রামের লোকদের আয় বেড়েছে। কিন্তু ওই প্রবন্ধে জীবনের অন্যদিকগুলির কথা বলা হয়নি। জীবনযাত্রার মান যদি টাকা দিয়ে মাপা হয় তাহলে সেটি বিভ্রান্তিকর। জনসাধারণের হাতে এখন আগের তুলনায় বেশি খরচ করার মত টাকা এসেছে। এটা খুবই সুখের কথা। এখন আর পশ্চিমী স্যুট আর ওয়েলকাট ড্রেস নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ নয়। আর একজনের আয় থেকে খরচ করা হিডনিজম বা ভোগবাদ বলে গণ্য হচ্ছে না। কিন্তু বিপথচালিত কনজিউমারিজম থেকে পাগলের মত যে কেনাকাটা চলছে তাতে করে সামাজিক দায়-দায়িত্বকে উপেক্ষা করে অনেকে শুধু টাকা রোজগারটাকেই মুখ্য করে তুলছেন। জাল মাল তৈরি, প্রতারণা, তছরুপ এই সবের আবির্ভাব হয়েছে। চীন বিরাট দেশ। জনসংখ্যাও প্রচুর। আধুনিকতার জন্য পশ্চিমকে অর্থনীতির দিক থেকে নকল করা খুব অবিজ্ঞোচিত কাজ।

মোটর গাড়ি শিল্পের কথা ধরা যাক। আমেরিকাকে এই শিল্প গতি এনে দিয়েছে। জীবনযাত্রার পক্ষে তা পরিণত হয়েছে এক অপরিহার্য সামগ্রীতে।

আজ বেইজিং ও সাংহাই-এর রাস্তার যা অবস্থা তাতে প্রত্যেক লোকের দূরে থাক, প্রত্যেক পরিবারের একটি গাড়ি থাকলে কী অবস্থা হবে!

গত অক্টোবর মাসে কম্যুনিস্ট পার্টি বর্তমান সংস্কারের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলে : 'সংস্কৃতিসম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। আধুনিক উৎপাদনশীল শক্তির ও সামাজিক প্রগতির প্রয়োজন মেটান এর উদ্দেশ্য।

তাই যদি হয়, তাহলে আমরা জীবনযাত্রার মানের চেয়ে জীবনের উৎকর্ষের কথাই বেশি করে বলব।

উন্নত দেশের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে বৈষয়িক প্রগতির দিকে বেশি জোর দিতে গিয়ে তাদের নানা সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাদের সামাজিক সম্পদের বিরাট অপচয় হচ্ছে এবং বহু লোকের জীবনে আধ্যাত্মিক শূন্যতা এসেছে।

এগুলো পরিহার করার উদ্দেশ্যে আধুনিকতার কর্মসূচি কতখানি সফল হল তা বিবেচনার জন্য জীবনের উৎকর্ষকেই বিচারের প্রধান মানদণ্ড করে তুলব। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গণমাধ্যম কেন, সমস্ত ব্যক্তিরই সমর্থন করতে এগিয়ে আসা উচিত।'

চীনের সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে এই সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। এর দ্বারা যেমন প্রমাণিত হয় আধুনিকতার সম্ভাব্য সঙ্কট সম্পর্কে চিন্তাবিদরা কতখানি উদ্বিগ্ন, তেমনি প্রমাণিত হয় মানুষের মুক্ত চিন্তার অধিকার আজ চীনে আবার স্বীকৃতি পাচ্ছে। □

(চলবে)

শিক্ষকদিবস উপলক্ষে

শিক্ষকদের এত সুযোগ সুবিধা ভারতের আর কোথাও নেইঃ কান্তি বিশ্বাস

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন স্মরণে প্রতি বৎসর 'শিক্ষক দিবস' পালিত হয়। শিক্ষকরা যেহেতু জাতিগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছেন সে কারণে তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি দেওয়া জাতীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেদিক দিয়ে অনেকখানি সুযোগ সুবিধা ইতিমধ্যে পেয়েছেন। সরকারিভাবেই তাঁদের নানা দাবিদাওয়া মেটানর চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য অনেক অসুবিধা এখনও দূর হয়নি।

গত কয়েক বছরে শিক্ষকদের জীবিকাগত সুযোগ সুবিধা সত্যিই কতখানি বেড়েছে তা নিয়ে কথা বলার জন্য পরিবর্তন-এর পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে যাওয়া হয়েছিল। তিনি পরিবর্তন-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে সে বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। শিক্ষকদের জন্য ইতিমধ্যে এ-রাজ্যে পেনশন দানের নীতি চালু হয়েছে। পেনশন সংক্রান্ত সেই নীতি কী, কেমন করে পেনশন-এর জন্য আবেদন করতে হয় ইত্যাদি তথ্য-সমৃদ্ধ একটি পৃথক লেখাও এসঙ্গে প্রকাশিত হল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই পৃথক লেখাটি থেকে পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একসঙ্গে পেয়ে যাবেন।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের দায়িত্বে আছে রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা। গত সোমবার ১২ আগস্ট মহাকরণে তাঁর ঘরে বসে এই সাক্ষাৎকারটি টেপ করা হয়।

পরিবর্তন ঃ বামফ্রন্ট আসার পর এই রাজ্যের শিক্ষার কতখানি উন্নতি হয়েছে?

কান্তি বিশ্বাস ঃ শিক্ষার পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এখন আমাদের পরীক্ষা পিছোয় না। নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবার ষাট থেকে সত্তর পঁচাত্তর দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ হচ্ছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা বলছি। এখন কোথাও কোন গণটোকাটুকি হচ্ছে এরকম কোন খবর আমাদের কাছে নেই। সামান্য একটু-আধটু হতে পারে তবে সেটা বড় কথা নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলার যে দুটি লক্ষণ—পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষা—এ দুটো কাজই যখন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে তখন আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

পরিবর্তন ঃ সম্প্রতি আপনার দপ্তর ঘোষিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন স্কিম নিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক ক্ষুব্ধ। তাঁরা এই স্কিমটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করছেন না কেন?

শ্রীবিশ্বাস ঃ গ্রহণযোগ্য মনে না করার কোন কারণ নেই। এই রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ—তাঁদের অবসরকালীন যেসব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আমরা করেছি নিঃসন্দেহে বলা চলে, এত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা সারা ভারতের কোথাও নেই। অবসর গ্রহণের সময় তাঁদের সর্বশেষ যে বেতন তার অর্ধেক পরিমাণ অর্থ তাঁরা পেনশন হিসেবে পাবেন। কমুটেশনের সুযোগ-সুবিধাও এখানে আছে। একই সঙ্গে সাড়ে ষোল মাসের বেতন অথবা ৩৬ হাজার টাকা গ্র্যাচুইটি হিসাবে পাবেন। উপরন্তু সাধারণ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর সুযোগ আছে, ফ্যামিলি পেনশনের সুযোগও আছে। অর্থাৎ একজন সরকারি কর্মচারী অবসরের সময় যেসব সুযোগ পান, বেসরকারি ইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও সেই একই ধরনের সুযোগ পাবেন। এই ব্যবস্থা আমরা করেছি।

পরিবর্তন ঃ আপনি বলছেন, শিক্ষার পরিবেশ উন্নত, শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অসুবিধাও দূর করার চেষ্টা হয়েছে, তবুও এক শ্রেণীর শিক্ষক কেন তাঁদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন বা আন্তরিকতার অভাব হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে?

শ্রীবিশ্বাস ঃ এখানে একটা ব্যাপার আছে। সেটা হল—এখন শিক্ষকরা হয়ত যে টাকা পান, তাঁদের চাহিদা তার থেকে বেশি। এটা থাকতেই পারে। আমাদের মত সমাজে আমরা যতই বেতন বৃদ্ধি করি না কেন, যতই মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করি না কেন, তবুও তাঁদের কিছু চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই থাকতে পারে। তবে আমাদের ক্ষমতায় যা আছে তা দিয়েছি, এবং শিক্ষকদের আমরা বলেছি যে সুযোগ সুবিধামত তাঁদের যে অসম্পূর্ণ দাবি আছে সেটা আমরা দেবার চেষ্টা করব। এবং এটা আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, বিরাট সংখ্যক শিক্ষক, তাঁরা আন্তরিকতা নিয়ে ক্লাসে পড়াশুনো করান। যার ফলে প্রতি বছর ফার্স্ট ডিভিশনে পাশের সংখ্যা বাড়ছে, পাশের হার বাড়ছে এবং বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠনও উন্নত হচ্ছে। ভারতের অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে যে, আমাদের এখানকার পঠন-পাঠন ও শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য যে কোন রাজ্য থেকে উন্নত। তাই আমরা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে তার কোন প্রতিফলন পড়েনি এটা ঠিক নয়। তবে এক শ্রেণীর শিক্ষক এখনও মনে করছেন তাঁদের আরও বেশি পাওয়া উচিত ছিল। আমরা দিতে পারিনি, তার জন্য আমরা দুঃখিত। আমাদের যা সহায় সম্বল তাতে এর বেশি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর জন্য আমার আবেদন—যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা বিবেচনা করে, এই অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও যেন আন্তরিক ভাবে কাজ করেন।

পরিবর্তন ঃ আপনি কি মনে করেন একজন শিক্ষক আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারছেন না তা কেবল অর্থনৈতিক কারণে? নাকি শিক্ষার পরিবেশেই অন্য কোন চাপ আছে?

শ্রীবিশ্বাস ঃ আমি মনে করি, আমরা যখন শিক্ষকতা করেছি তার থেকে আজকের শিক্ষার পরিবেশ অনেক উন্নত। আরও অনেক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর শিক্ষার পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। সেই জন্য পরিবেশ এমন কোন প্রতিকূল নয় যার জন্য শিক্ষকদের কাজ করার অসুবিধা আছে। কিন্তু একটা বিষয়, সেটা হল সারা ভারত জুড়ে আজ সঙ্কট, মূলত অর্থনৈতিক সঙ্কট। সেই সঙ্কটের প্রতিচ্ছবি সমাজের একটা অংশ শিক্ষকদের উপরও প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই জন্য শিক্ষকদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া আর কোন অসুবিধার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

পরিবর্তন ঃ শেষ প্রশ্ন। সম্প্রতি আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত 'আদর্শ স্কুল' পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন, এতে দেশের ঐক্য নষ্ট হবে। ঐক্য নষ্ট হবার কারণটা কী?

শ্রীবিশ্বাস ঃ কারণ শিক্ষার মাধ্যম। হিন্দি-ভাষাভাষী এলাকার ছেলেমেয়েরা যখন ক্লাস সিক্স-এ উঠবে, তখন তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিন্দিই থাকবে। আর অ-হিন্দিভাষী ছেলেমেয়েরা যখন ক্লাস সিক্স-এ উঠবে তখন তাদেরও শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দি। যেটা তাদের কাছে পর্বত-প্রমাণ বাধা হিসাবে দেখা দেবে। তাতেই আমাদের ভারতের যে ঐক্য সে ঐক্যর ওপর আঘাত আসবে। দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি। ☐

সাক্ষাৎকার ঃ শ্যামল বসু

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা



শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

বোর্নভিটা — মল্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, যাতে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবেরি— ১০০ বছরেরও ওপর যারা পানীয় আহার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ।

প্রতি কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নভিটা মিশিয়ে খেলে, পরিবারের প্রত্যেকে পাবে পুষ্টি ও আস্বাদে ভরা এক পানীয়। বোর্নভিটা বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে ওদের দিনে দুবার বোর্নভিটা দিন— আর লক্ষ্য করুন, শরীর বৃদ্ধির উপযোগী যথাযথ শক্তি পেয়ে ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ছে!

বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীলা এক মা বলেন:
"আমার বাচ্চাদের দুধে বোর্নভিটা মিশিয়ে খাওয়াই বলে, ওরা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর শক্তি যথাযথভাবে পায় —তাইতো পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হবেই খাওয়াতে।"



এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ম.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

শিক্ষকদিবস উপলক্ষে

নতুন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম পুরোপুরি মানতে গিয়ে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত কিনা—তা জানার জন্যে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ঘুরেছি। কোন কোন শিক্ষক প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট। আবার প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকাও আছেন। তবে তাঁরা অধিকাংশই বিশেষ কিছু বলতে বা নিজের নামে বিবৃতি প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।

'বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি অনুযায়ী সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে একই পদ্ধতি মেনে চলা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে ধরাধরির মাধ্যমে চাকরি এখন আর হয় না।' এই মত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার।

'যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীরা সবসময় চাকরি পাচ্ছেন না।'—এ ধারণাও কোন কোন শিক্ষক পোষণ করেন।

শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত পদ্ধতি ঃ

১. বর্তমানে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কোন শূন্যপদ সৃষ্টি হলে প্রথমে তা ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর কাছে জানাতে হয়।

২. ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস অনুমতি দিলে, প্রথমে তাঁদের জানা কোন উপযুক্ত প্রার্থী থাকলে তাঁর নাম 'এক নম্বরে' পাঠিয়ে দেন। সাধারণত কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা চাকুরিরত অবস্থায় মারা গেলে তাঁর উপযুক্ত ছেলে বা মেয়ে থাকলে তিনিই ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস-এর মাধ্যমে প্রথম সুযোগ পান।

৩. যদি এরকম কোন প্রার্থী না থাকেন তাহলে বিদ্যালয়ের শূন্য-পদের কথা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে জানান হয়। তাঁদের নথিভুক্ত যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি থাকেন তাঁদের নাম ঠিকানা এক্সচেঞ্জ থেকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যালয় তখন ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থীকে নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই নিয়োগ করা হয় না। তিনজন প্রার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী প্যানেল তৈরি করে ডি আই অফিসে পাঠান হয়। তাঁরা অনুমোদন করলে প্রথম ব্যক্তি নিযুক্ত হন।

৪. যদি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কোন নাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (১৫+৭=২২ দিন) না পাঠান হয়, তাহলে রাজ্যস্তরে প্রচলিত কোন পত্রিকায় শূন্যপদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

৫. প্রার্থীদের আবেদনপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিদ্যালয়ের রেজিস্টারে লেখা হয়। বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ বা ডি পি আই থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ডিভিশন, কম্পার্টমেন্টাল বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নম্বরের ব্যবস্থা করা আছে। রেজিস্টারে প্রার্থীর নাম, আবেদনপত্র পাবার তারিখ, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর, অতিরিক্ত যোগ্যতা এবং তার প্রমাণপত্রের জন্য প্রাপ্ত নম্বর লিখে 'টোটাল মার্ক্স' দেওয়া হয়।

৬ আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ পেরিয়ে গেলে সিলেকশন কমিটি যোগ্য প্রার্থী বাছতে বসেন। এই কমিটিতে থাকেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, একজন শিক্ষক প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত থেকে পাঠান একজন প্রতিনিধি এবং একজন বিশেষজ্ঞ। সাধারণত যে বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা সেই বিষয়েরই একজন অধ্যাপককে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়।

৭. সিলেকশন কমিটি সাধারণত দশজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের রেজিস্টার্ড পোস্টে চিঠি দেন। প্রার্থীদের ইন্টারভিউ-এর জন্য ডেকে পাঠান হয়। ইন্টারভিউ হয় ১৫ নম্বরের জন্য। একজন বিশেষজ্ঞ এই পরীক্ষা নেন 'সিলেকশন কমিটি'-র উপস্থিতিতে। সব নম্বর মিলে যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হন তাঁদের প্যানেল করে, প্যানেলটা ম্যানেজিং কমিটির সই-এর পর ডি আই অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৮. ডি আই অফিস নামগুলো অনুমোদন করলে বিদ্যালয় প্রথম জনকে নিয়োগ করে।

নবপল্লী, বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুরারিমোহন লাহা জানালেন যে তাঁরা উপরোক্ত বিধি-নিয়মগুলো সঠিকভাবেই পালন করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে আগের ব্যবস্থার থেকে এই ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর। এই ব্যবস্থা একটু বেশি সময়-সাপেক্ষ হলেও, বেকার সমস্যা জর্জরিত বর্তমান অবস্থায় যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে এর থেকে ভাল কোন উপায় আর কিছু নেই।

গুপ্তিপাড়া ক্ষেত্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা শিক্ষকদের তুলনায় খুবই বেশি। আগে এই সমস্যা বিশেষ ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সর্বজনীন ও অবৈতনিক করায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই হারে শিক্ষকের অভাব ঘটছে। শিক্ষক নিয়োগে সরকারি যে বিধিব্যবস্থা আছে তা বেশ ভাল। সরকার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী যে নিয়োগ ব্যবস্থা করেছেন তাতে অযোগ্য ব্যক্তির প্রবেশের হার কমেছে। এ সত্ত্বেও বলা যায় যে, সরকার যদি পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মত কোন কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করেন তাহলে তা আরও ভাল হবে।

আদাহাটা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গৌরী ব্যানার্জি জানালেন যে শিক্ষক নিয়োগে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমেই বলা যায় যে, শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট একটি খবরের কাগজে দেওয়া উচিত। অনেক সময় নিয়ম পালনের জন্য এমন কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে কাগজ অধিকাংশ লোকের নজরে আসে না। 'যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ'—এই নীতিটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইন্টারভিউ-এর জন্য যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় সবসময় তা ঠিক নিয়োগ হয় না। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে একবার এক বিশেষজ্ঞ তাঁকে ভুল প্রশ্ন করেছিলেন। শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি আগের থেকে ভাল হয়েছে এজন্য বর্তমান সরকার অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু নিয়ম যেভাবে পালন হয় তা আরও ত্রুটিমুক্ত করতে হবে।

দত্তপুকুর, নিবাধুই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক চণ্ডী চক্রবর্তী জানালেন, বর্তমান নিয়মে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন অযোগ্য ব্যক্তির থেকে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ বেড়েছে। তবে নিয়োগ পদ্ধতি এত জটিল যে একজন শিক্ষক চলে গেলে বা অবসর নিলে তাঁর জায়গায় অপর একজনকে নিয়োগ করতে বছর ঘুরে যায়। ভাল শিক্ষকমাত্রেই ছাত্রাবস্থায় ভাল ছাত্র ছিলেন, এটা ঠিক নয়। তাই শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে শিক্ষক নিয়োগে ছাত্রদের বিশেষ উপকার হচ্ছে না। প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্তত এক সপ্তাহ 'ক্লাস ডেমনস্ট্রেশন' দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সেক্ষেত্রে ভাল শিক্ষক বেছে নেওয়া যাবে।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যায় যে বর্তমান সরকার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি দূর করতে চেয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মশা মারতে কামান দাগা নয় কি? বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে এই মাত্রাতিরিক্ত জটিল ব্যবস্থাকে কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? একজন শিক্ষক নিয়োগে এই নিয়ম পালন করতে গেলে যে ব্যাপক সময় প্রয়োজন, তা কি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? বহু বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এইভাবে শিক্ষকের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে বলা যায়—

১) শিক্ষক নিয়োগে কোনমতেই একমাসের বেশি দেরি করা উচিত নয়।

২) আবেদনপত্র আহ্বান করা, ইন্টারভিউ নেওয়া ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব যদি ডি আই-এর ওপর থাকে এবং যদি ডি আই আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের একটা প্যানেল করে রাখেন তাহলে বিদ্যালয়ে শূন্যপদ সৃষ্টি হওয়া মাত্র ডি আই-এর কাছে শিক্ষক চাইলে তিনি নাম পাঠিয়ে দিতে পারেন। এভাবে সময় অনেক কম লাগবে।

৩) 'শিক্ষক নিয়োগ কমিশন'—এর মাধ্যমে প্যানেল তৈরি করে সেই প্যানেল থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। ☐

সুতনু মুন্সী

শিক্ষক শিক্ষিকারা কী হারে পেনশন পাবেন

পশ্চিমবঙ্গের সরকার-স্পনসর্ড ও বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেনশন চালু করেছে। যারা এই পেনশনের সুযোগ নিতে চান তাদের নিম্নলিখিত যেকোন একটি ব্যবস্থা পছন্দ করতে হবে। এবং সে অনুসারে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে ঃ

১. ৬২ শতাংশ কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড + পেনশন + রিলিফ বাবদ থোক ৫৫ টাকা। এক্ষেত্রে পেনশন ধার্য হবে শেষ ৩৬ মাসের গড় বেতনের এক-চতুর্থাংশ।

২. নতুন হারে পেনশন + রিলিফ + পারিবারিক পেনশন + গ্র্যাচুইটি।

৩. কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড + যা মূল বেতনের ৮.৩৩ শতাংশ + গ্র্যাচুইটি।

১. ৪. ৮১ ও তার পরে শিক্ষক শিক্ষিকা পদে নিযুক্তরা ১ নম্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁদের ২ ও ৩ নম্বরের মধ্যে যেকোন একটি নিতে হবে।

পেনশন কত প্রকারের হতে পারে?

১. পূর্ণ কার্যকালের পর অবসরগ্রহণ-জনিত পেনশন

২. ডাক্তারি মতে কার্যে অক্ষমতা-জনিত পেনশন

৩. পদের অবলুপ্তি-জনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ পেনশন

৪. স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণজনিত পেনশন

১, ২ ও ৩ নং-এর জন্য কমপক্ষে ১০ বৎসর এবং ৪ নং-এর জন্য কমপক্ষে ২০ বৎসর কার্যকাল হওয়া চাই।

রিলিফ বাবদ কী পাওয়া যাবে?

পেনশনের সঙ্গে মহার্ঘ রিলিফ যোগ হবে। প্রতি কিস্তি ডি এ বাড়লে রিলিফ বাড়বে, ৫০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব পেনশনের জন্য ১২.৫০ টাকা। ৫০০ টাকার নিচে ঐ বৃদ্ধি হবে পেনশনের ২২ শতাংশ।

রিলিফের হার

১.৪.৮১ থেকে ৩১.৮.৮২-এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঃ

১.৪.৮৫ তারিখে রিলিফের পরিমাণ হবে পেনশনের ৭২.৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ ৩৬৩ টাকা।

১.৯.৮২ ও তার পরবর্তীকালে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঃ

১.৪.৮৫ তারিখে রিলিফের পরিমাণ হবে পেনশনের ৫৭.৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ ২৮৮ টাকা।

পেনশন প্রাপক তাঁর মূল পেনশনের ⅓ অংশ পর্যন্ত Commute করতে পারবেন। ৬০ বৎসর বয়সে অবসর নেবার পর Commute করলে প্রতি টাকার বিনিময়ে ১১৭.৭২ টাকা পাবেন।

গ্র্যাচুইটি

কার্যকাল ১০ বৎসরের কম হলে প্রতি বৎসরের জন্য ১ মাস হিসাবে এবং ১১ বৎসর থেকে ৩৩ বৎসর পর্যন্ত কার্যকালের ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ½ মাস হিসাবে পেনশনের জন্য নির্ধারণের অঙ্ক (শেষ বেতন + মহার্ঘ ভাতা) গ্র্যাচুইটি পাওয়া যাবে। কোন ক্ষেত্রেই ১৬½ মাসের বেশি গ্র্যাচুইটি পাওয়া যাবে না। সর্বোচ্চ গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ৩৬০০ টাকা।

মৃত্যুজনিত গ্র্যাচুইটি

কাজে যোগ দেওয়ার ৫ বৎসর পর ও ২৪ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে মৃত কর্মীর মনোনীত ব্যক্তি অথবা পরিবারের সদস্যরা পেনশনের জন্য নির্ধারিত অঙ্কের (শেষ বেতন + মহার্ঘ বেতন) ১২ গুণ মৃত্যুজনিত গ্র্যাচুইটি পাবেন। ২৪ বছরের অধিক কাজ করার পর মৃত্যু ঘটলে যত বৎসর কার্যকাল হবে তত ½ মাসের পেনশনের জন্য নির্ধারিত অঙ্ক ঐ বাবদ পাওয়া যাবে তবে তা ১৬½ গুণের বেশি হবে না। ২৬ বৎসর কাজ করার পর মৃত্যু ঘটলে ১৩ গুণ হবে, আবার ৩৬ বৎসর কাজ করার পর মৃত্যু ঘটলে ১৬½ গুণ হবে।

পেনশন ও গ্র্যাচুইটি নির্ধারণের জন্য ৬ মাসের বেশি অথচ ১২ মাসের কম সময়কে ½ বৎসর ধরা হবে। যথা ২৮ বৎসর ১০ মাস কার্যকাল হলে ধরতে হবে ২৮½ বৎসর। ২৮ বৎসর ৫ মাস হলে ধরা হবে ২৮ বৎসর।

পারিবারিক পেনশন

কমপক্ষে এক বৎসর কাজ করার পর বা অবসর গ্রহণের পর কোন কর্মীর মৃত্যু হলে উক্ত কর্মীর স্ত্রী বা স্বামী, অবর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, অবর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, অবর্তমানে নির্ভরশীল মাতা, অবর্তমানে নির্ভরশীল পিতা, নিম্নলিখিত হারে পারিবারিক পেনশন পাবেন ঃ

মাসিক মূল বেতন

ক. ১২০০ টাকার বেশি

খ. ৪০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা

গ. ৪০০ টাকার কম

পারিবারিক পেনশন

ক. মূল বেতনের ১২ শতাংশ সর্বনিম্ন ১৬০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা।

খ. মূল বেতনের ১৫ শতাংশ সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৬০ টাকা।

গ. মূল বেতনের ৩০ শতাংশ সর্বনিম্ন ৬০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০০ টাকা।

এই পেনশনেও স্বাভাবিক হারে রিলিফ পাওয়া যাবে।

বর্ধিত হারে পারিবারিক পেনশন

কমপক্ষে ৭ বৎসর কাজ করার পর কোন কর্মীর মৃত্যু ঘটলে পরবর্তী ৭ বৎসরের জন্য অথবা উক্ত ব্যক্তি জীবিত থাকলে ৬৫ বৎসর বয়স প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত (যেটি আগে হয়) পারিবারিক পেনশনের বর্ধিত হার হবে, মৃত কর্মীর মূল বেতনের ৫০ শতাংশ অথবা স্বাভাবিক পারিবারিক পেনশনের দ্বিগুণ, যেটি কম হবে।

পারিবারিক পেনশনের সময়কাল

ক. স্ত্রী বা স্বামী আমৃত্যু

খ. অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ১৮ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত

গ. অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ২১ বৎসর বয়স না হওয়া বা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত (যেটি আগে হবে)

ঘ. নির্ভরশীল মাতা / পিতা আমৃত্যু

পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কর্মরত থাকলেও ঐ পেনশন পেতে কোন বাধা থাকবে না।

পেনশনের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে কী কী দিতে হবে :

১. সার্ভিস বই। ২. দরখাস্তকারী দুইটি নমুনা স্বাক্ষর, গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যায়িত। ৩. দরখাস্তকারীর নিজের / স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে চারটি পাসপোর্ট সাইজ যুগ্ম ফটোগ্রাফ, বিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক কমিটির সভাপতির দ্বারা প্রত্যায়িত। ৪. শেষ প্রাপ্ত বেতনের **certificate**. ৫. বিদ্যালয় / বিদ্যালয়-সমূহের অনুমোদন পত্রের প্রত্যায়িত নকল। ৬. দরখাস্তকারীর প্রতিটি নিয়োগের অনুমোদন-পত্রের প্রত্যায়িত নকল। ৭. দরখাস্তকারীর প্রতিটি বর্ধিত কার্যকালের অনুমোদন – পত্রের নকল। ৮. শেষ মাসের গড় বেতনের / শেষ ১০ মাসের গড় বেতনের হিসাব। ৯. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া নিম্নলিখিত মর্মে **certificate : 'services claimed have been verified and the average emoluments have been correctly calculated and the pension should be admitted.'** ১০. **Death Gratuity** ও **Family Pension**-র জন্য মনোনয়ন। ১১. **Retirement**-এর পর পেনশনের জন্য দরখাস্ত করতে এক মাসের বেশি দেরি হলে তার কারণ। ১২. **Option Form**—যথাযথভাবে পূরণ করা। ১৩. কন্ট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে বিদ্যালয়ের দেয় অংশ নিয়ে থাকলে তার পরিমাণ, কোন তারিখে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এবং একটি **declaration** যে উক্ত পরিমাণ টাকা ৫ শতাংশ সরল সুদ সহ গ্র্যাচুইটি ও পেনশনে থেকে কেটে নেওয়া হোক। অথবা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে বিদ্যালয়ের দেওয়া অংশের সুদ সহ হিসাব (নির্ধারিত **Form**-এ) এবং যে চালান মারফৎ ঐ টাকা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যায়িত নকল। ১৪. **Bank**-এর মাধ্যমে **pension** নিতে হলে **Annexure II** তে দেওয়া **Form** এ **Declaration**। ১৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর **statement** ও **collateral evidence.**

Commutation-এর জন্য দরখাস্ত

Pension Commutation-এর জন্য নির্ধারিত **Form**-এ আলাদা দরখাস্ত করতে হবে। অবসর গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যে ওই দরখাস্ত জমা দিলে দরখাস্তকারীর কোন **Medical** পরীক্ষা হবে না। ☐

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো



মস্কো যুব উৎসবে ১৭ জন ভারতীয় যুব-প্রতিনিধি গ্রেপ্তার হলেন কেন?

মস্কো থেকে হিতাংশু দাশগুপ্ত

২৭ জুলাই উদ্বোধন ও ৩ আগস্ট সমাপ্তি ভি আই লেনিন স্টেডিয়ামে। ১ লক্ষ ৩ হাজার আসনের স্টেডিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। এর মধ্যে ১৫০টি দেশের প্রতিনিধি ২০ হাজার। মস্কোয় দ্বাদশ বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসবের আটদিনের অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণীয়। এক সময় ছিল যখন যুব উৎসবের সব কিছুতেই প্রতিযোগিতা হত। প্রতিযোগিতা হত সব অনুষ্ঠানের—নৃত্য ও সঙ্গীতের, খেলাধুলোর। এবং বেশ মনে আছে ৩০ বছর আগে (১৯৫৫) ওয়ারশ যুব উৎসবে নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রথম পুরস্কার—'লরেট অব দ্য ফেস্টিভ্যাল' পেয়েছিলেন।

এখন যুব ও ছাত্র উৎসবের গোটাটাই উৎসব—ফেস্টিভ্যাল। এদেশে যে কোন অনুষ্ঠানে প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতার নজির দেখা যায়। দ্বাদশ বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসবেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান মস্কো অলিম্পিককেও ম্লান করে দিয়েছে। নানা দেশের প্রতিনিধিরা বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ এমন নিখুঁত এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপারগুলি মানুষের দ্বারা কি সম্ভব? না, এসব মেসিন বা কম্পিউটারে হচ্ছে! অনস্বীকার্য খেলাধুলোয় বা নানা প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যাপারে ভারত পিছিয়ে আছে। কিন্তু এবারের যুব উৎসবে ৫০০ প্রতিনিধির ভারত দলের পারফরম্যান্স দেখে মনে হয়েছে, এরপর বিদেশে প্রতিনিধি পাঠাবার আগে প্রত্যেককে যেন উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই ট্রেনিং বলতে খেলাধুলো, গান-বাজনা নয়—বিদেশে গিয়ে সু-আচরণের জন্য প্রশিক্ষণ। আমরা বিদেশে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব—তা না করে গান্ধী, জওহরলাল, লালবাহাদুর, ইন্দিরার অসম্মান করেছি, অবমাননা করেছি ভারতকে। কংগ্রেস(ই), সি পি আই, সি পি আই (এম), ফরোয়ার্ড ব্লক, লোকদল, জনতা প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের যুব উইং-এর সদস্যরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। কংগ্রেসের এম পি আনন্দ শর্মা ছিলেন প্রতিনিধি দলের নেতা। এম পি মমতা ব্যানার্জি, এম এল এ আব্দুল মান্নান প্রমুখও ছিলেন। অন্যান্য রাজ্যের আরও কিছু নামী কংগ্রেসী ছিলেন। কিন্তু মূলত কংগ্রেস(ই), সি পি আই (এম) ও সি পি আই-এর যুব সদস্যরা জাতীয় পতাকার বদলে দলীয় পতাকা, ফেস্টুন এবং নিজস্ব প্রচারপত্র বিলি দ্বারা যে কাণ্ড করে গেলেন তাতে ভারতীয় সভ্যতা বা ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেনি। যুব উৎসবে বিভিন্ন দেশের তরুণ-তরুণীরা মেলামেশা করেন, কিছু প্রোগ্রামও থাকে আলিঙ্গনের। কিন্তু ভারত থেকে আগত তরুণরা এর অন্য অর্থ ভেবে নিয়ে বন্ধুত্বের সুযোগে অধিক রাত্রে রুশী তরুণীদের পার্কে ডেকে নেন। এবং বেলেল্লাপনা করতে গেলে তাঁদের হাতের চড়, জুতোর ঘা জোটে। তাঁরা মিলিশিয়া ডাকেন এবং যুব কংগ্রেস(ই)-র ১৭ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেহেতু ভারত ও সোভিয়েতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাই মিলিশিয়া এঁদের গ্রেপ্তার করে হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দেন।

গোর্বাচোভ আসার পর এখানে মদ্যপান সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ। হোটেলে, সরকারি অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন করা হয় না। ভারতের সরকারি দলের তরুণরা কিন্তু বহু দূরে গিয়ে মদ কিনে এনে বে-আইনিভাবে হোটেলরুমে তা খেয়ে হৈ-হল্লা করেছেন। ডলার শপ বিরিয়ঙ্কাতেও দেখা গেছে ভারতীয়দের ভিড় এবং এঁদের অধিকাংশই কংগ্রেস(ই) দলের।

ভারত অপেক্ষা অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বহু দেশ এখানে এসেছিল। কিন্তু আচরণে ও নানা অনুষ্ঠানে এমন দৈন্য অন্য কারুর মধ্যে চোখে পড়েনি। এঁদের পোশাকে না ছিল ঐক্য, না তালে তালে পা ফেলাতেও।

প্রত্যেক দেশের মত ভারতকেও একটি হল দেওয়া হয়েছিল নিজ দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের জন্য। কেন জানি না ভারতীয় দলের সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রধানা সুধা জেকব বাংলা ও অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পীদের কোন প্রোগ্রামই দিতে চাননি। সন্দেহ নেই, ভারতীয় দলের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন এভারেস্ট বিজয়িনী বাচেন্দ্রী পাল। তিনি ডেপুটি লিডার হলেও, তাঁকে পরিচয় করান হয়নি। অথচ



সাংবাদিকদের সঙ্গে বাচেন্দ্রী পাল

এখানকার বিভিন্ন মহল জানতেন বাচেন্দ্রী এসেছেন। পরে এই প্রতিবেদক তাঁকে পরিচয় করান এবং 'প্রাভদা' তাঁর ছবি ও সাক্ষাৎকার ছাপে। 'সোভিয়েৎস্কি সয়ুজ' পত্রিকাগোষ্ঠীও তাঁকে সংবর্ধনা জানায় ও সাক্ষাৎকার নেয়। ইণ্ডিয়া হলের অনুষ্ঠান ভুল রুশ ভাষায় ঘোষণা করছিলেন ভারতীয় দলের সঙ্গে আসা দূরদর্শনের এক ঘোষিকা। ব্যাপারটি খুবই হাস্যকর হয়েছিল।

অন্যান্য বহু ছোট দেশ এলেও তাদের প্রোগ্রামের জাঁকজমক, দরাজ গলা, চমৎকার পোশাক দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। সেই তুলনায় ভারতের অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত ম্যাড়মেড়ে। কেবল সৌরাষ্ট্রের ঘুমোর ও বেনারসের কথক শিল্পী অদিতিমঙ্গল দাস যা নজর কেড়েছিলেন। আর দৃষ্টি কাড়ে গুজরাতের মেয়েদের নাচ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন নজরুল সঙ্গীতের ধীরেন বসু, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বপ্না ঘোষাল, নৃত্যে পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, লোক-সঙ্গীতের গীতা চৌধুরী ও উৎপলেন্দু চৌধুরী এবং সাঁতারু সঞ্জীব চক্রবর্তী। সঞ্জীব ইচ্ছামত সাঁতার কেটেছেন। কিন্তু নজরে আসার উপায় ছিল না ভারতীয় দলনেতাদের একপেশে আচরণের দরুন।

নিজের কথা বলা উচিত নয়, তবুও বলছি—বাংলার শিল্পীদের



গালিনা পোদজারি। ফটো : লেখক

শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে। ওঁদের পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না দেখে পৃথকভাবে ওঁদের জন্য প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলাম দুশবা ক্লাব তথা মৈত্রী সংঘে। রুশ নৃত্যশিল্পী গালিনা পোদজারি এখানে ভরত-নাট্যম পরিবেশন করলেন। বাংলার সঙ্গীতশিল্পীরা একত্রে ও পৃথক পৃথক ভাবে যা শোনালেন, তা অতীতের যুব উৎসবগুলির (নির্মলেন্দু, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী) তুলনায় নিম্নমানের হলেও বলব এঁরাই ভারতের মান রেখে গেলেন দ্বাদশ বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসবে। উপায় না দেখে ভারতীয় জাতীয় অনুষ্ঠানে পরে এঁদের গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। এবং সেখানে বাংলার অনুষ্ঠান তারিফ পেল। উৎপলেন্দুর ভাটিয়ালি, গাজি ও রুশী ভাষার 'মস্কো ইভনিং' সকলের মন জয় করে এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিবেশিত হয় কাতুসা। রুশী মঞ্চেও এঁদের আমন্ত্রণ জানান হয়। আগেই জানিয়েছি এখন প্রতিযোগিতা অন্তর্হিত। থাকলে মনে হয় ৩০ বছর আগে নির্মলেন্দু যেমন পুরস্কার জিতেছিলেন, ৩০ বছর পর তাঁর পুত্র উৎপলেন্দু তেমন একটা কিছু পেতেন। বাংলার শিল্পীদের কথা এখানকার নানা পত্রিকায় বেরিয়েছে ছবি সহ। যুব রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলির মধ্যে বাংলার শিল্পীদের পারফর-মেন্স স্থানীয় ভারতীয়দেরও খুশি করেছে। আর সব দেশের ডেলিগেটকে অবাক করে দিয়েছে এখানকার বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। মস্কো অলিম্পিক্সের উদ্বোধনের আগে আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ছিল। সেবারের মত যুব উৎসবের আগেও রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মেঘ সরিয়ে দিলেন ওঁরা। বৃষ্টির বদলে বরং হেসে উঠল ঝকঝকে আকাশ। ☐

ফটো : সংগৃহীত

যুব-উৎসব ঃ প্রাগ থেকে পুনরায় মস্কো



এবারের যুব-উৎসব হয়ে গেল মস্কোতে। ২৭ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট, এই আটদিনব্যাপী দ্বাদশ যুব-উৎসব উপস্থিত ছিলেন ২০ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি। এঁরা এসেছিলেন ১৫০টি দেশ থেকে। বিশিষ্ট যুবক-যুবতীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এভারেস্ট-জয়ী বাচেন্দ্রী পাল, ক্রিকেট খেলোয়াড় ডায়না এদুলজী প্রমুখ।

মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে দু হাজার সাদা পায়রা উড়িয়ে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা করা হয়। বস্তুত উদ্বোধনী দিবসের ভোর থেকেই মস্কো এক অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। ঝলমলে করে তোলা হয় দোকানপাট, রাস্তাঘাট, অফিস-বাড়ি। প্রকাশিত হয় নানা পত্র-পত্রিকা, বিচিত্র রঙিন সাজে।

প্রথম যুব-উৎসব হয়েছিল আজ থেকে ৩৮ বছর আগে, চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে। ১৯৪৭ সালের সে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল প্যারিসে। কিন্তু ফরাসি সরকার উৎসব করতে দিতে রাজি হয়নি। এমনকী বৃটিশ ও মার্কিন সরকার সে বছর কোন প্রতিনিধিও পাঠাতে চায়নি। ভ্যাটিকান-এর কর্তৃপক্ষও এমন একটি উৎসবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন সে সময়ে।

প্রথম উৎসবে ৭১টি দেশ থেকে ১৭ হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন প্রাগে। সেবারের উৎসবে মূল শ্লোগান ছিল ঃ যুবজন, স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী-শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। পশ্চিমী অনেক দেশের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেবারের উৎসবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক টমাস মান, গায়ক পল রোবসন, মার্কিন লেখক লিলিয়ান হেলমান এবং বৃটিশ লেখক জন

বি-টেক্স ®

মলম এবং লোশন

দাদ
একজিমা
খোস-পাচড়া ও
চুলকানি
নিরাময়ের জন্য



B-TEX OINTMENT MFG. CO.
C-17, UDYOG NAGAR, NAVSARI, (GUJARAT)

প্রিস্টলি প্রমুখ।

এর দুবছর পর ১৯৪৯ সালে বুদাপেস্তে বসল দ্বিতীয় যুব-উৎসবের আসর। এখানে ৮২টি দেশের ২০ হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন। এ আসরে একটি বিরাট মিছিল এসে হাজির হয়েছিল দীর্ঘ পথ পেরিয়ে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে মিছিল ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এগিয়ে চলল বুদাপেস্তের দিকে। কণ্ঠে তাদের যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান। মিছিল যত এগিয়েছে, ততই লোক বেড়েছে।

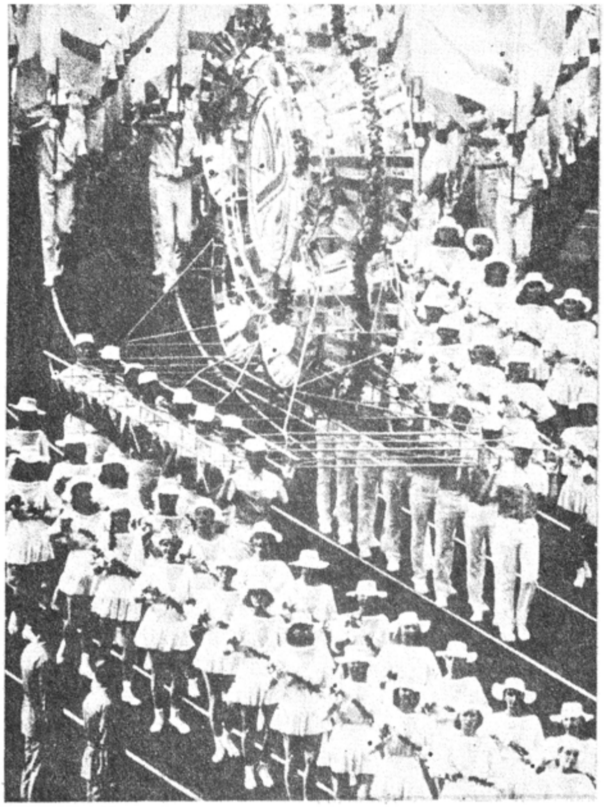
১৯৫১ সালে বার্লিনে শুরু হল তৃতীয় বিশ্ব যুব-উৎসব। এ উৎসবের মূল শ্লোগান ছিল: যুবজন, নতুন এক যুদ্ধের সম্পর্কে সচেতন হও, সচেতন হও চিরস্থায়ী শান্তির পক্ষে।

এ উৎসবে প্রথম জাপানের যুব প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন। তাঁরা বললেন, পারমাণবিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে জাপান। ফলে জাপান শান্তির অগ্রগণ্য সৈনিক হতে চায়। এখানে একদিকে যেমন ভিয়েৎনাম থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তেমনই এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কোরিয়া এবং ফ্রান্স থেকেও বেশ কয়েকজন বেসরকারি প্রতিনিধি। ১০৪টি দেশ থেকে মোট ২৬ হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন। তবে পশ্চিম জার্মান পুলিশ এই উৎসবে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল বলে কিছুটা বিভ্রান্তি। সে বিভ্রান্তি অচিরেই কেটে যায়।

চতুর্থ যুব-উৎসব হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, বুখারেস্টে। ১১১টি দেশের ৩০ হাজার যুব-প্রতিনিধি এখানে এসেছিলেন। এখানে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম যুবক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পঞ্চম উৎসব হয় ওয়ারশ-তে, ১৯৫৫ সালে। এখানে ১১৪টি দেশ থেকে ৩১ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এবারের উৎসবের একটা অন্য তাৎপর্যও ছিল, কেননা এর আগেই তৃতীয় দুনিয়ার স্বাধীন দেশগুলি বান্দুং সম্মেলন সেরে ফেলেছে। পঞ্চশীলের ভিত্তিতে সেই সম্মেলন বসেছিল। তাছাড়া জেনেভায় চার বৃহৎশক্তির সম্মেলনও হয়ে গেছে তার আগে। আর হেলসিঙ্কিতে হয়ে গেছে বিশ্বশান্তি সম্মেলনও।

ওয়ারশ-র যুব-উৎসবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন টমাস মান এবং বিজ্ঞানী জোলিও কুরি। পাবলো পিকাসো তো উৎসবের মর্যাদা বাড়াবার জন্য ওয়ারশতে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনীই করে ফেললেন। উৎসবের উদ্বোধন যেদিন হল সেদিনই ইতালির যুবকরা আল্পস পর্বতের একটি শৃঙ্গ জয় করে তার ওপর যুব-উৎসবেরই পতাকা উড়িয়ে দিলেন। এবছর আবার ছিল হিরোশিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের দশম বর্ষ। ফলে সে ব্যাপারটির তাৎপর্যও কম ছিল না। জাপানি প্রতিনিধিরা উৎসবের মধ্যে বারবার গান গাইলেন: 'না, আর নয়, পারমাণবিক অস্ত্র আর নয়।'



যুব-উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৯৫৭ সালে মস্কোয় বসল ষষ্ঠ যুব-উৎসবের আসর। ১৩১টি দেশের ৩৪ হাজার যুব-প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। ৬২টি দেশের ২ হাজার সাংবাদিককে এখানে স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয়। এখানেই যুব-উৎসবের প্রতীকটি প্রথম পরিকল্পিত হয়েছিল।

সপ্তম উৎসব হয় ভিয়েনায়। ১৯৫৯ সালের এই যুব-উৎসবে ১৮ হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন ১১২টি দেশ থেকে। এখানে উৎসব-বিরোধী শক্তি নানা বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে এবং উৎসব বানচাল হয়ে যেতে বসেছে এমন একটা কথাও তারা রটায়। কিন্তু সেরকম অপকর্ম সার্থক হয়নি।



জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি, কোলে সোভিয়েত শিশু

যথারীতি উৎসব হল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্লোগান উঠল: আলিস গুট, আন্টিফেস্তিভাল কাপুট। অর্থাৎ সবই এখন শুভ, কেননা উৎসববিরোধীরা পরাজিত হয়েছে।

অষ্টম উৎসব বসল হেলসিঙ্কিতে, ১৯৬২ সালে। এর পরের সম্মেলন হয় ১৯৬৮-তে, সোফিয়ায়। সোফিয়াতেই যোগদানকারী ১৩৮টি দেশের ২০ হাজার প্রতিনিধিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভিয়েৎনামকে সমর্থন জানান। এখানে ভিয়েৎনামকে সাহায্য করার জন্য ১৭ হাজার মার্কিন ডলার সংগৃহীত হয়।

১৯৭৩ সালে যখন বার্লিনে আবার যুব উৎসব শুরু হল তখন ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শেষের দিকে ও শুরু হয়েছে ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনাসভা। দশম উৎসবের পক্ষে সেটা ছিল নানাভাবে আলোচনার বিষয়। এখানে যোগাযোগকারী ৩০ হাজার প্রতিনিধি আওয়াজ তুললেন: সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় শান্তিগঠনে এবং মৈত্রীতে ঐক্যবদ্ধ হও।

১৯৭৮ সালে একাদশ যুব উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল, এই প্রথম উৎসব হল ইওরোপের বাইরে। কিউবার রাজধানী হাভানা ছিল মিলনস্থল। ১৪৫টি দেশ থেকে ১৮,৫০০জন প্রতিনিধি এসেছিলেন হাভানায়। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও গিনিবিসাউর গেরিলা যোদ্ধাদের একটি দল। তাছাড়া এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতা আঞ্জেলা ডেভিস এবং প্যালেস্টিনীয় নেতা মাহমুদ দারউইজ।

যুদ্ধের পর সারা পৃথিবী যখন বিধ্বস্ত তখন মানুষে মানুষে আস্থা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করার জন্যই আন্তর্জাতিক যুব উৎসবের কথা ভাবা হয়েছিল। আজও সেই শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার আন্দোলন চলছে যুব-উৎসবের মিলন কর্মের মধ্য দিয়ে। মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে দ্বাদশ যুব-উৎসবও সেই শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। □

যীশু চৌধুরী

ফটো: সংগৃহীত


যেদিন আমার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !
"মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে!"
"মানে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা!"
"হ্যাঁ মা, দাঁতে গর্ত! আমি ওকে আমার দাঁত দেখালাম... আমার "স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা" টুথপেস্টের কথা বললাম..."
"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড, সোনা!"
"ও হ্যাঁ! বললাম তুমি বলেছ ভালো, তাই আমি ওটা ব্যবহার করি! আমারও ভালো লাগে!"
"সত্যিই ভালো! মাড়ি মজবুত করে, দাঁতের আয়ু বাড়িয়ে দেয়..."
"হ্যাঁ মা! মা, একটু চকলেট কেক খাই? পরে দাঁত ব্রাশ করে ফেলবো! সত্যি মা..."
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড
স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট
যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।
FOR THE GUMS
Forhan's
with active FLUORIDE to check tooth decay

এবার পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে মানব জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে

১৯৪৫-এর ৬ আগস্ট ইউ-রেনিয়াম বোমা লিটল বয়-এর হিরোশিমা ধ্বংস করা এবং তার ঠিক তিনদিন পরই ৯ আগস্ট প্লুটোনিয়াম বোমা 'ফ্যাট ম্যান'-এর নাগাসাকির বুকে আছড়ে পড়ার পর চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দুটি বোমা যে ভয় আর আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল, তার ফলেই আজও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বলতে বাধ্য হচ্ছেন—না, আর কোন হিরোশিমা-নাগাসাকি নয়। কিন্তু তেমনই অপরদিকে কিছু সঙ্কীর্ণমনা মানুষ, যাঁদের ভেতর কেউ কেউ হয়ত পারমাণবিক অস্ত্র-সমৃদ্ধ দেশগুলির প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারক, এখনও একটি সীমিত ও বিজয়যোগ্য পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য একের পর এক কৌশল রচনা করে যাচ্ছেন।

ফলে আজ পৃথিবীর বুকে কম করেও প্রায় ৫০,০০০ পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে। অর্থাৎ, এই পৃথিবীর প্রতিটি অধিবাসীর মাথাপিছু পাঁচ টন করে বিস্ফোরক জমা হয়ে আছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা দুটি ফেলা হয়েছিল, বর্তমানকালের যে কোন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতা তার থেকে অন্তত হাজার গুণ বেশি।

তবু, একটু লক্ষ্য করলে যে কেউ দেখতে পাবেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশগুলির আরও শক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যেন মিটছেই না।

আর সব থেকে চিন্তার বিষয় যে, বেশ কিছু দেশে সম্প্রতি সরকারি প্রচারের মাধ্যমে পারমাণবিক বিপর্যয়ের ভীতি অমূলক প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট সঠিকভাবে এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, এই প্রচারের ফলে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আরও তীব্রতর হচ্ছে। অধ্যাপক ইউরজেন রোসটো-র মত বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও এমন কথা বলতে শোনা গেছে যে, 'জাপান পারমাণবিক আঘাত সহ্য করেও বেঁচে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে।'

ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় অধ্যাপক জন গলব্রেথ তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুককর ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'প্রতিরক্ষা উপদেষ্টারা বলেন—পারমাণবিক আক্রমণের সময় আমাদের ভেতর যাদের যাদের গাড়ি আছে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তাদের কাছাকাছি ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যাওয়া উচিত।' তিনি আরো লিখেছেন, 'যাবার সময় আমাদের ক্রেডিট কার্ডগুলিও সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।'

পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব সম্প্রদায়ের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন চিন্তাভাবনাই অসৎ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রতিরক্ষা নীতি-নির্ধারকদের না আছে হৃদয়, না আছে এসব মানবিক অনুভূতির প্রতি কোন শ্রদ্ধা। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমার আঘাতের চিহ্ন শরীরে ধারণ করে যেসব অসহায় মানুষ এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের জন্যও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি এই সব প্রতিরক্ষা নীতি-নির্ধারকদের নেই।

সম্প্রতি হিরোশিমা থেকে প্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি রিপোর্টে জানা গেছে, জাপানে পারমাণবিক বোমা পড়ার চার দশক পরও প্রায় ৩,৭০,০০০ মানুষ 'হিবাকুশা' অর্থাৎ বোমার আঘাতে শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পরিচয়-পত্র বহন করেন। হিবাকুশা তাঁদেরই বলা হয়, যাঁরা পারমাণবিক বোমা বর্ষণে মারাত্মক রশ্মির ফলে লিউকিমিয়া, থাইরয়েড ক্যান্সার, ছানি বা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছেন। একমাত্র হিরোশিমা ক্লিনিকেই বছরে দুবার প্রায় এক লক্ষ এরকম মানুষ চিকিৎসার জন্য যান।

কিন্তু সেই বোমা বর্ষণের ফলে যে সমস্ত রোগ দেখা দিয়েছিল তার অনেকগুলিরই এখনও পর্যন্ত কোন চিকিৎসা নেই। জাপানি চিকিৎসকরা বলেন, বোমা বিস্ফোরণের এই প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তেমন কোন গবেষণা চালান যায়নি। তার কারণ, মার্কিন কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বোমা দুটি নির্মাণের পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে আরও হাজার হাজার মানুষেরও আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, ঐ বোমা বর্ষণের সময় যাঁরা খুবই ছোট ছিলেন, তাঁদের ওপর ভবিষ্যতে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে তা জানার মত সময় এখনও আসেনি। হিরোশিমা ক্লিনিকের ডাইরেক্টর ডাঃ চিকাকো ইতো বলেন, 'সাধারণভাবে ক্যান্সার যখন বেড়ে উঠতে থাকে সেই বয়সেও এঁরা এখনও পৌঁছননি।'

রক্ত হিম করে দেবার পক্ষে এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট। যে কোন মানুষ তাঁর সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বিচার করে নিশ্চয়ই বলবেন, আজকের দিনে পারমাণবিক যুদ্ধ অতীতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন ভয়াবহ যুদ্ধের থেকেই আরও মারাত্মক ফলাফল বহন করে আনবে।

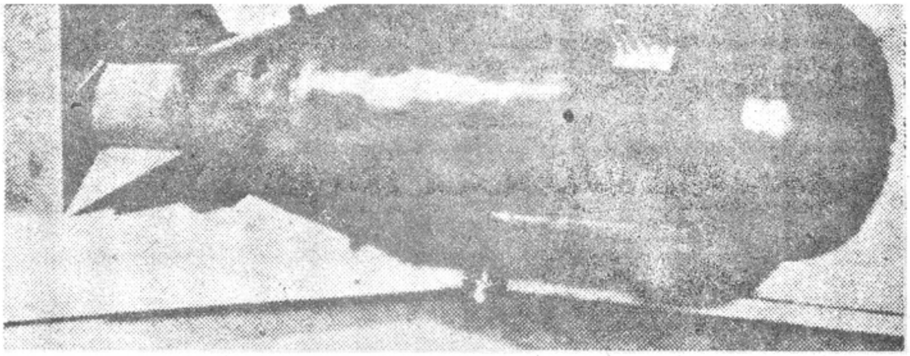
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও)-র একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এখন যদি কোন পারমাণবিক যুদ্ধ হয় তাহলে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ, যার ভেতর ১৫০ কোটিই এশীয়, অল্প সময়ের ভেতর ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর বাকি যে ১০০ কোটি আহত হবেন, তাঁরা মারা যাবেন উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে।

এই সমীক্ষায় সাবধান করে দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর পানীয় জলের সমস্ত উৎসমুখই জমে যাবে। প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদও ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক একই ঘটনা ঘটবে সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও। কারণ, রৌদ্র কিরণের অভাবে সমুদ্রে প্রাণ সৃষ্টি করে যে অণুগুলি, সেগুলিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

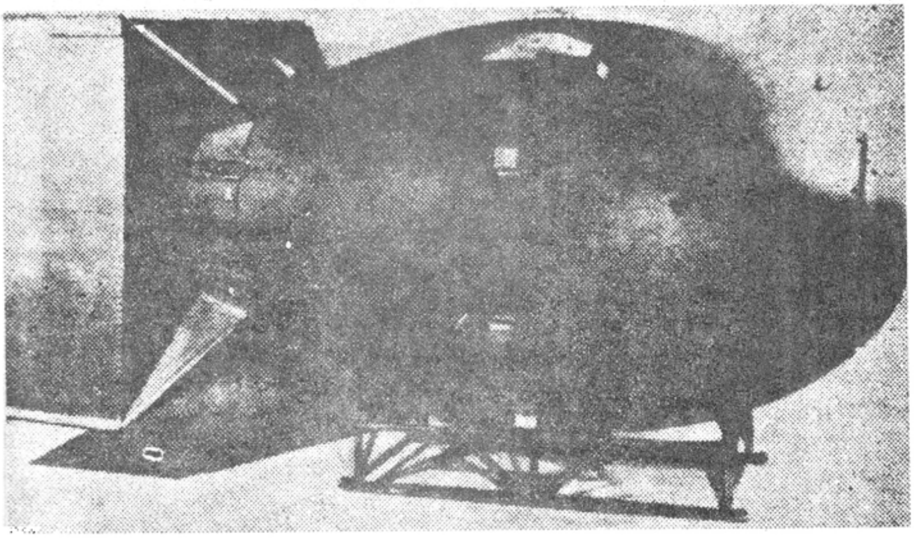
পশ্চিম জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব কেমিস্ট্রির ডাইরেক্টর ডঃ পল কুর্টজেন সম্প্রতি পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার, বিশেষ করে ভারতের উদাহরণ টেনে, যে ছবিটি তিনি দিয়েছেন তাও বেশ ভয়াবহ। মার্কিন পত্রিকা ডিসকভার-কে তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করেছে তার মাত্র এক শতাংশই সারা পৃথিবী—ব্যাপী এক ভয়াবহ 'পারমাণবিক শৈত্য' ডেকে আনতে



পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানিতে মিছিল



হিরোশিমায় ফেলা বোমা লিটল বয়'



নাগাসাকিতে ফেলা বোমা 'ফ্যাট ম্যান'

যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা অন্তত এক মাসের জন্যও স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কমে যাবে। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি এটাই যথেষ্ট। ভারতে শীতটা কেমন তা তাঁরা জানেন কিনা তা আমি জানি না।'

একটা খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ইওরোপ এবং আমেরিকায় পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, যদি না পারমাণবিক অস্ত্রগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা যায়, তাহলে মানব সমাজই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ডঃ কার্ল সাগাঁ এবং আরও ৬৪ জন নোবেল বিজয়ী একটি যৌথ বিবৃতি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য ছটি দেশের এক সম্মেলন ডাকতে আবেদন জানিয়েছেন। □

তপন দাস

ফটো ঃ সংগৃহীত

জ্বলুনী · চুলকানি · রক্ত পড়া অর্শের প্রথম লক্ষ্মণ।

সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করুন অপারেশন করার মত অবস্থা ডেকে আনবেন না।

অর্শ হ'ল একেবারে সাধারণ অসুখ। কিন্তু তা অবহেলা করলে অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে—এমন কি হয়তো অপারেশনও করতে হতে পারে।

অর্শের খুব কার্য্যকরী চিকিৎসা হ'ল প্রেপারেশন-এইচ*, যার সুপারিশ, বিদেশের বড় বড় ডাক্তাররা করে থাকেন।

প্রেপারেশন-এইচ ওষুধ মেশানো এই মলমের অনন্য ফরমুলা যে শুধু জ্বালাযন্ত্রণা ও চুলকানি থেকেই আরাম দেয় তা নয় এটি আসলে ফোলা কমিয়ে দেয় ও স্নায়ুকে সঙ্কুচিত করে। প্রেপারেশন-এইচ পিচ্ছিল ক'রে দিয়ে, মলত্যাগের সময়ের কষ্টও কমিয়ে দেয়।

১৫ গ্রা. ৩০ গ্রা. ও ৫০ গ্রামের টিউবে পাওয়া যায়।

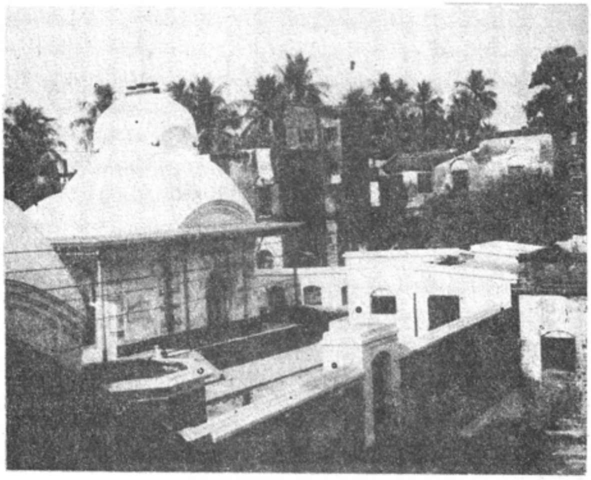


* Licensed user of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

GM-PH-84-BN

ধর্ম

আমতা গ্রামের মেলাইচণ্ডী



আমতায় মেলাইচণ্ডীর মন্দির / ফটো : লেখক

হাওড়া জেলার উত্তরসীমায় আসন্দা, ডিহিভুরশুট, জগৎবল্লভপুর, উত্তরপূর্ব কোণে বেলুড়-বালী, পূর্বে বেতড়-শিবপুর, পশ্চিমে অমরাগড়ি-ঝিখিরা এবং দক্ষিণে শিবগঞ্জ ও ডিহি-মণ্ডলপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটির জনপদে জনপদে এখনও লৌকিক দেবদেবীগণ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে জাগ্রত হয়ে আছেন। এ অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় জীবনে লোকায়তধারার যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তার অন্যতম উৎস হিসেবে যে কটি মন্দির বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে, আমতা গ্রামের মেলাইচণ্ডী অন্যতম। হাওড়া শহর থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে এই মন্দির। হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাস চলে নিয়মিত। রাণীহাটি হয়ে বাস গিয়ে দাঁড়ায় আমতার শহর এলাকায়। রিক্সা নিয়ে সোজা মেলাইচণ্ডীর মন্দির। হেঁটেও যাওয়া চলে। মন্দিরের চারদিকে প্রাচীন দিনের বাড়িঘর। শান্ত, নির্বিরোধী, বনেদী জনপদবাসীর পাড়া। মন্দিরের চাতাল শ্বেতপাথরের। সামনে সুন্দর এক নাটমন্দির। চণ্ডীমন্দির প্রাচীন বাংলার বিশিষ্ট আটচালারীতির। সামনে বাঁদিকে একটি পুকুর। মন্দিরের মধ্যে দেবীর মূর্তিটি স্তূপের মত, চোখ, নাক প্রভৃতি রূপোর তৈরি। যে বেদীটির ওপরে দেবী বসে আছেন সেটি দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরনো এক পাথরের খণ্ড থেকে ওটি তৈরি। দুপাশে দুটি মূর্তি, ছোট আকারের সুন্দর কষ্টিপাথরের বিষ্ণু ও কার্তিক। গবেষকদের ধারণা ওদুটি পাল-যুগের বা সেন-আমলের। নাটমন্দিরের ওপারে বাঁদিকের কোণে একটি ছোট শিবমন্দির। দুর্গেশ্বরশিব হলেন দেবীর ভৈরব। স্থানীয় মানুষ বলেন, শিবের নাম 'কুমুদেশ্বর শিব'।

'মেলাইচণ্ডী' নামটি চণ্ডীশাস্ত্রে নেই। পুরনো বইপত্রে চণ্ডীদেবীর যত নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, কলাই, শুভ, নাটাই, ঘোর, উড়ন, খাড়া, উদ্ধার, অবাক, ককাই, বসন, ঢোলাই, হরিষমঙ্গল, সঙ্কটমঙ্গল, উদয়, ভাউত্তা, শিবাই—এই নামগুলি উল্লেখ্য। মেলাইচণ্ডী নামটির পেছনে আছে মালাইচাকি শব্দটি। সতীর মালাইচাকিটি আমতার কাছে দামোদর নদের তীরে জয়ন্তী গ্রামে পড়ে। সেই বিশ্বাস নিয়েই এ অঞ্চলের মানুষ মেলাইচণ্ডীদেবীর কাছে এসে পুজো দেন। তাঁদের বিশ্বাস মহাসতী শান্তদেবীর করুণায় গ্রামের কল্যাণ হবে, সমাজের, পরিবারের মঙ্গল হবে। চণ্ডীদেবী তাঁর উগ্রতা ত্যাগ করে এই জনপদে মঙ্গলচণ্ডীর প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

মালাইচাকি থেকে মেলাইচণ্ডী, নাকি দামোদরের তীরে একদা বিখ্যাত গঞ্জে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির মেলা থেকে মেলাইচণ্ডী, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাস এবং অন্যান্য তথ্য ঘাঁটলে যেসব সূত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয় একদা দামোদর, সরস্বতী প্রভৃতির তীরেই ছিল আদিবাংলার বিখ্যাত জনপদগুলো। নদীতীরের গঞ্জে বা হাটে যেসব মেলা বসত, আশেপাশের গ্রামের হাজার মানুষ সেখানে আসতেন। ধর্মীয় দেবদেবীরা ছিলেন এসব মেলার অন্যতম বড় আকর্ষণ। মেলাতলার চণ্ডীর পুজো না দিলে কেউ কাজে সফল হবেন না। এই চেতনায় মানুষের মন থেকে অনাবশ্যক ছটফটানি, অতিলোভ এবং অসাধু মনোবৃত্তি দূর হত। গ্রামীণ পুজো হত আন্তরিক। এরকম একটি হাটতলা এখনও আছে। এখানে থাকতেন জটাধারী চক্রবর্তী নামে এক সদ্‌ব্রাহ্মণ। আজ থেকে প্রায় ৩৫০-৪০০ বছর আগে, একদিন তিনি দামোদরের ওপারে জয়ন্তী গ্রামে দেবীর স্তূপাকৃতি পাথরের মূর্তিটি পান এবং স্বপ্নে অনুভব করেন এটি দেবীর মালাইচাকির প্রস্তরীভূত রূপ। পুজো শুরু করেন তিনি। রোজ দামোদর নদ পার হয়ে জয়ন্তী গ্রামে যান পুজো করতে, এ বড় দুর্ভোগ। দুর্ভোগ বর্ষাকালে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় দামোদর ক্ষণে ক্ষণে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। বৃদ্ধ, বিশ্বাসী সেই পুরোহিতমশায় একদিন আকুলকণ্ঠে দেবীমূর্তির সামনে প্রার্থনা করেন—মাগো, সময়মত তোমার পুজো দিতে পারি না। সময়ে সময়ের নির্দিষ্ট কাজ করতে না পারলে জীবনে তো সবই বৃথা। কী করব মা? তুমিই বলে দাও! সেদিন রাত্রেই চক্রবর্তীমশায় স্বপ্ন পান, দেবী বলছেন, চিন্তা করিস না জটাই, তোর বাড়ির কাছেই আমাকে পাবি!.....

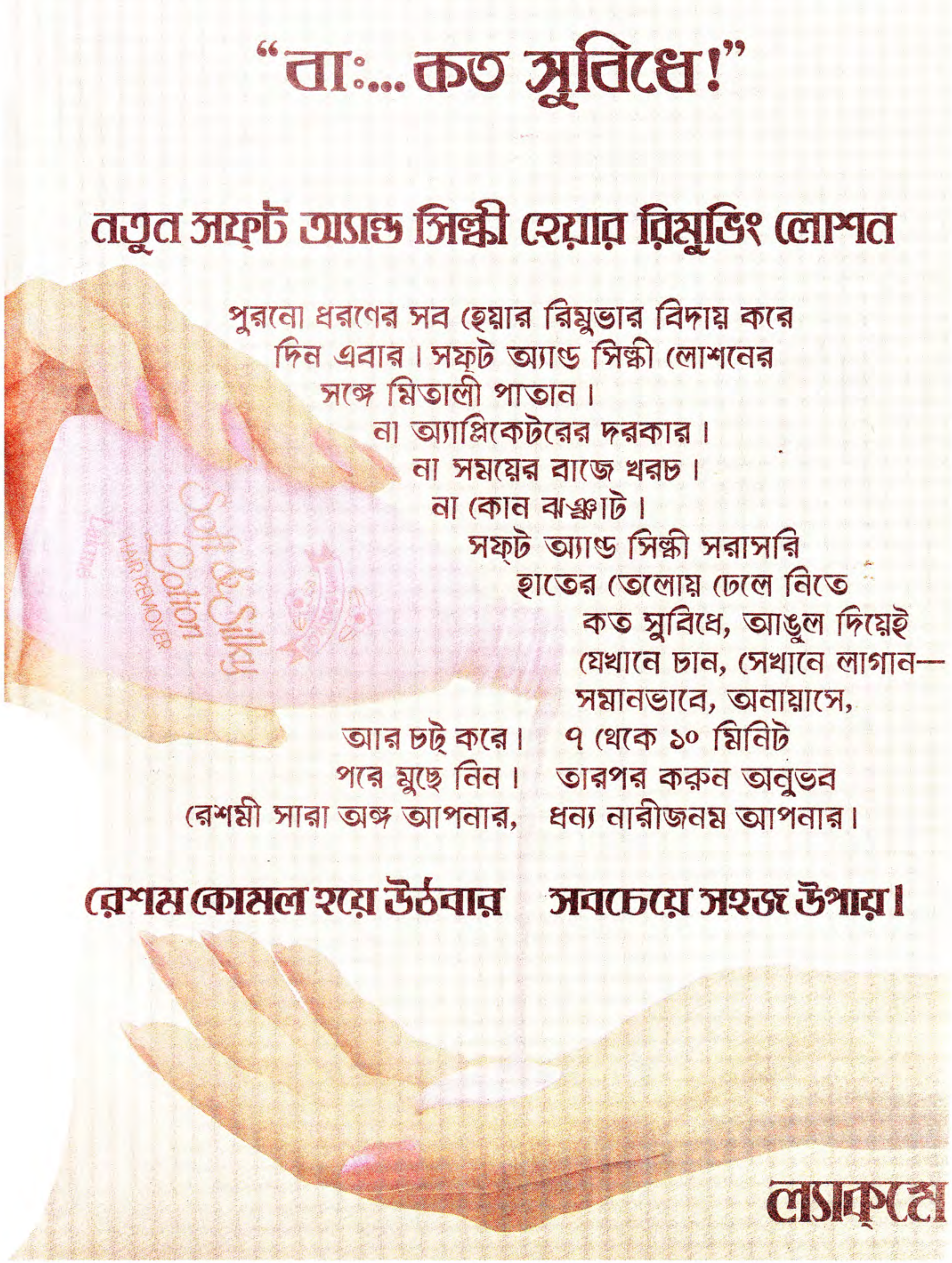
পরদিন দেখা গেল হাটতলায় একটি গাছের নিচে এসে গেছেন সেই মূর্তি। নিত্যপুজো শুরু করা হল সেদিন থেকে। দেবীর 'থান' প্রতিষ্ঠা করা হল, সেখানে দশ-বিশখানা গাঁয়ের মানুষ ছুটে এলেন, মায়ের কাছে যে যা মানত করেন, সবই প্রায় ফলে যায়। দেবীকে ঘিরে গ্রামীণ সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, এমনকী সামাজিক ক্রিয়াকর্মও আবর্তিত হতে থাকে।

মেলাইচণ্ডীতলার মন্দিরের পুজো-উৎসব ইত্যাদি নিয়মিত করবার জন্য পালাদার আছেন কয়েকঘর। শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮৪-৮৫ বছরের বৃদ্ধ, সৌম্য সুন্দর ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন পালাদার। আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান। দেবীর মহিমা-বিষয়ক কয়েকটি ঘটনা বললেন। সেসব ভক্তদের বিশ্বাসের ব্যাপার। ওঁর বাড়ির সকলে উৎসাহভরে জানালেন, দেবী জাগ্রত এবং এনিয়ে অনেক কাহিনী আছে।

মন্দিরের বয়স সম্পর্কে স্থানীয়দের বিশ্বাস ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে দত্ত পরিবার এটি বানান। মনে হয় সালটি অত পুরনো নয়। এই অভিমত লোকসংস্কৃতি-বিশারদ এক পণ্ডিতজনের। তাঁর যুক্তি, হাটখোলার লবণ ব্যবসায়ী দত্ত পরিবারের অর্থকৌলীন্য শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। তবে এই মেলাইচণ্ডীর প্রাচীনতম উল্লেখ রয়েছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন, 'জোড়ুরের ভগবতী, আমতার মেলাই পুরাসের ঘাঁটু বন্দো খেপুতের খেপাই।' এছাড়া, চণ্ডীপুজো বাংলার এক প্রাচীনতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শুধু বাংলা কেন, বাংলার আশেপাশের আদিবাসীদের মধ্যেও চণ্ডীপুজো প্রচলিত। ওরাওঁ, মুণ্ডা এঁদের মধ্যেও চণ্ডীরূপী শিলাখণ্ড পুজো করার উৎসব পালিত হয়। চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কাহিনীর নায়কই এক আদিবাসী ব্যাধ যুবক। ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির চণ্ডী বা চাণ্ডী পুজো একটু অন্য ধরনের। গ্রামের খোলা জায়গায় গাছতলায় চণ্ডীশিলা (চাণ্ডী-টাঁড়) থাকে, তার চারপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট পাথর। এগুলো 'আবরণ দেবতা' বা চণ্ডীর ছেলেপিলে। ওরাওঁ যুবকরা মাঘী পূর্ণিমায় এ পুজো করেন, পাঁঠা বলি দেয়া হয়। ধেনো মদও বানান হয়। গ্রামের সকল অবিবাহিত যুবকেরা একত্রিত হয়ে পুজো করেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে গ্রামের ভেতরের উঠোনে সকলে জড়ো হন। তখন সকল গ্রামবাসী মিলে নাচগান করেন। যুবক-যুবতীরা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একসঙ্গে নাচেন। আগে, যুবকরা উলঙ্গ হয়ে গভীর রাত্রে চাণ্ডী-টাঁড়ে গিয়ে পুজো করতেন।

আদিবাসীদের ভয়ানক আকৃতির, উগ্র স্বভাবের, পশুদের দেবী 'চাণ্ডী' বাংলায় এসে, বাঙালি চরিত্রের নম্রতা এবং সুষমাময় মাধুর্যের রসে জারিত হয়ে, করুণাময়ী মঙ্গলচণ্ডী হয়েছেন। □

মানিক্য-বন্দ্যোপাধ্যায়


“বাঃ... কত সুবিধে!”
নতুন সফ্‌ট অ্যান্ড সিল্কী হেয়ার রিমুভিং লোশন
পুরনো ধরণের সব হেয়ার রিমুভার বিদায় করে
দিন এবার। সফ্‌ট অ্যাণ্ড সিল্কী লোশনের
সঙ্গে মিতালী পাতান।
না অ্যাপ্লিকেটরের দরকার।
না সময়ের বাজে খরচ।
না কোন ঝঞ্ঝাট।
সফ্‌ট অ্যাণ্ড সিল্কী সরাসরি
হাতের তেলোয় ঢেলে নিতে
কত সুবিধে, আঙুল দিয়েই
যেখানে চান, সেখানে লাগান—
সমানভাবে, অনায়াসে,
আর চট্ করে। ৭ থেকে ১০ মিনিট
পরে মুছে নিন। তারপর করুন অনুভব
রেশমী সারা অঙ্গ আপনার, ধন্য নারীজনম আপনার।
রেশম কোমল হয়ে উঠবার সবচেয়ে সহজ উপায়।
Soft & Silky Lotion
HAIR REMOVER
ল্যাক্‌মে

দুই কমিউনিস্ট পার্টিই ঐক্য চায়, কিন্তু বাস্তবে দুপক্ষই উল্টো আচরণ করছে

সি পি আই ও সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ এখন তুঙ্গে। দু দলই এখন দুদলের প্রতি দোষারোপে মত্ত, অথচ লেখাপত্রে তারা উভয়েই বাম-ঐক্যের কথা বলছে। নয়া দিল্লিতে এ নিয়ে গণ্ডগোল বেশ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বাম দলগুলির এই বিরোধ কি বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির মেলবন্ধনের প্রয়াসে অন্তরায় হয়ে উঠবে ?

কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীকধারী দুই কমিউনিস্ট পার্টির লড়াই জমে উঠেছে তুঙ্গে। একেবারে সাপে-নেউলে যুদ্ধ। কেউ কাউকে ছাড়বার পাত্র নয়। দিল্লির রাজনৈতিক মহলে সি পি আই আর সি পি আই (এম)-এর এই যুদ্ধ বিরোধী-রাজনৈতিক শিবিরে কী প্রতিক্রিয়া ফেলবে সেটা ভবিষ্যতের ভাবনা, কিন্তু এই মুহূর্তে সি পি আই সভাপতি রাজেশ্বর রাও এবং সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর মধ্যে ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে জব্বর। নয়া দিল্লির অশোক রোডের সি পি আই (এম)-এর সেণ্ট্রাল অফিস আর কোটলা রোডের অজয় ভবনের সি পি আই-এর মুখ্য অফিসের মধ্যে ফারাক বড় জোর ২-৩ কিমি হলেও রাজনৈতিক দূরত্ব বেড়ে গেছে বুঝি কয়েক হাজার কিমি।

ঘটনার সূত্রপাত সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর অজয় ভবনে। গত ২০ জুন দলের সভাপতি রাজেশ্বর রাও একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পাঞ্জাব ও গুজরাট সমস্যা সম্বন্ধে দলের বক্তব্য এবং সচেতন ও সাগ্রহ সমাধানের প্রচেষ্টাকে সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের টেররিস্ট অ্যাণ্ড ডিসরাপটিভ অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট জারির ওপর সুচিন্তিত মতামত প্রদানও ছিল এই সাংবাদিক বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য।

বৈঠকে এ কথা সে কথার মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হিসেবে উঠল সংযুক্ত বিরোধী ফ্রণ্ট গড়ে তোলার প্রশ্ন। নয়া দিল্লির যে কোন কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক নেতার যে কোন সাংবাদিক বৈঠকেই আজকাল সাংবাদিকরা এ প্রশ্নটা করতে ভোলেন না। কারণ অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে কোন একক বিরোধী শক্তির পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাতে শুধু বিফলতারই সম্মুখীন হতে হয়। সাফল্য হয়ে যায় দূর অস্ত। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিরোধী দলগুলি তাই চেয়েছিল একটি সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে সম্মিলিতভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই-তে নামতে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং স্বার্থান্বেষী চক্রের রাজনৈতিক চালে সবই ভেস্তে যায়।

নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুলভাবে জয়ের পর বিরোধী নেতারা কেউ কেউ আবার নতুন করে পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকরা প্রবীণ বাম নেতা রাজেশ্বর রাওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের পথে সি পি আই (এম) তাদের কতখানি সাহায্য করবে বলে মনে হয়। রাজেশ্বর রাও সোজাসুজি জানালেন, বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের পথে সি পি আই যতটা সচেস্ট, সি পি আই (এম) ততটা নয়। তাঁর বক্তব্য, সি পি আই বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সম্মিলিত মোর্চা গঠনের জন্য যতবার যত রকম মতামত দিয়েছে, সি পি আই (এম) ততবারই সে মতামতে বাগড়া সৃষ্টি করেছে। রাজেশ্বর রাও খোলাখুলি জানিয়েছেন, সি পি আই (এম) শুধু সেই সমস্ত রাজ্যেই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়তে রাজি, যেখানে তাদের পায়ের তলার মাটি যথেষ্ট শক্ত এবং যেখানে তারা সহজেই নিজ দলের প্রাধান্যকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম।

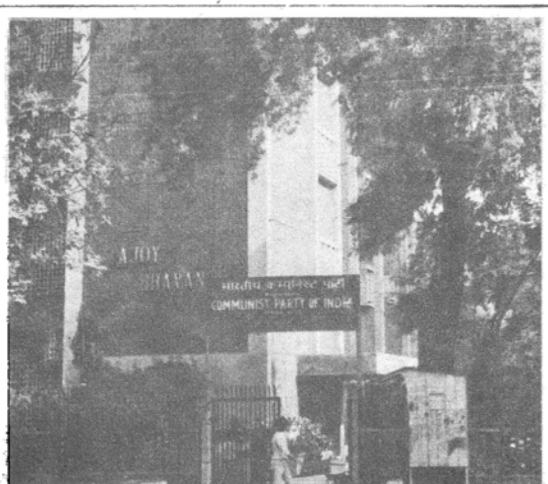
সি পি আই (এম)-এর শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা। এর মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্যই বেশি। ত্রিপুরা অত্যন্ত ছোট একটি রাজ্য। সুতরাং সেখানে সি পি আই (এম)-এর প্রাধান্য থাকলেও তার গুরুত্ব ততটা নেই। কেরালায় তাদের শক্তি আছে ঠিকই কিন্তু কংগ্রেসের অস্তিত্বও একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

সি পি আই-এর বক্তব্য : শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা বা ত্রিপুরার মাটিতে প্রাধান্য নিয়ে সি পি আই (এম) সন্তুষ্ট থাকতে চায়। অথচ বিহার বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সি পি আই (এম) তাতে সায় দিতে রাজি নয়।

রাজেশ্বর রাও বলেছেন, সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশে বাম শক্তিগুলি এখনও ততটা জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। কিছু রাজ্য বাদ দিলে বাকি সব রাজ্যেই কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের প্রাধান্য। অথচ সি পি আই (এম) কোন রাজ্যে দু-চারটির বেশি আসন পেলেই ধরে নেয়, তাদের সে রাজ্যে অপরিসীম ক্ষমতা। সি পি আই বা অন্য কোন দলের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের নেই। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাম দলগুলির সম্মিলিত প্রয়াসে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির যৌথ উদ্যোগে গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে না পারলে, ভারতীয় রাজনীতির মাটি থেকে বাম শক্তিগুলির মুছে যেতে দেরি হবে না। এ ভয় সি পি আই এবং সি পি আই (এম) দুদলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীরাও দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, যখন সি পি আই-এর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের প্রস্তাবকে অন্যান্য বিরোধী শিবিরগুলি সাগ্রহে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখাচ্ছে, ঠিক সেরকম সময়ে বাম রাজনীতির অন্যতম শরিক সি পি আই (এম) পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাঁর মতে, ভারতের বুকে এখন সমস্যার পাহাড়। বাম শক্তিগুলিকেও সে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এককভাবে কোন দলের পক্ষে সে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও এখানে প্রবল।

রাজ্যভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের প্রশ্নে শ্রীরাও বলেন, সি পি আই (এম) এরকম কোন প্রস্তাবে রাজি নয়। এভাবে কোন দলকে টিকিয়ে রাখা যায় না।



সি পি আই-এর মূল অফিস অজয় ভবন

জনগণের বন্ধু হিসেবে জনগণের পাশে দাঁড়ানও সম্ভবপর নয়।

সাংবাদিক বৈঠকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে রাওসাহেবের দেওয়া এই জবাবগুলো প্রকারান্তর সি পি আই-সি পি আই (এম) বিরোধকেই নতুন করে তুলে ধরেছে। অবশ্য রাজেশ্বর রাও-এর পক্ষে এ-ধরনের মন্তব্য করার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। বলা যায়, সি পি আই (এম)-ই বাধ্য করেছে শ্রীরাওকে এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতে। সম্প্রতি কলকাতায় সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড বাসবপুন্নাইয়া বলেছিলেন, সি পি আই শুধু একটি বাম রাজনৈতিক দল মাত্র। একে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল বলা যায় না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বাসবপুন্নাইয়া সি পি আইকে কমিউনিস্ট দল বলেই স্বীকার করতে চাননি। তাঁর এ ধরনের মন্তব্য সি পি আই তথা রাজেশ্বর রাও-এর মত প্রবীণ রাজনীতিবিদের কাছে রীতিমত অপমানজনক। ফলে হয়ত সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই শ্রীরাও চেয়েছেন জনসমক্ষে সি পি আই (এম)-এর 'ভ্রান্ত রাজনৈতিক পথ'-কে খোলাখুলিভাবে প্রবেশ করতে।

সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য এ ব্যাপারে রাজেশ্বর রাও কোনরকম অপমানজনক প্রত্যুত্তর দেননি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, শ্রীবাসবপুন্নাইয়ার এই মন্তব্য তাঁর 'Petit mindedness'-এর পরিচায়ক। 'Everyone should be a little modest and try to see if we are equal to the tasks facing the country.'

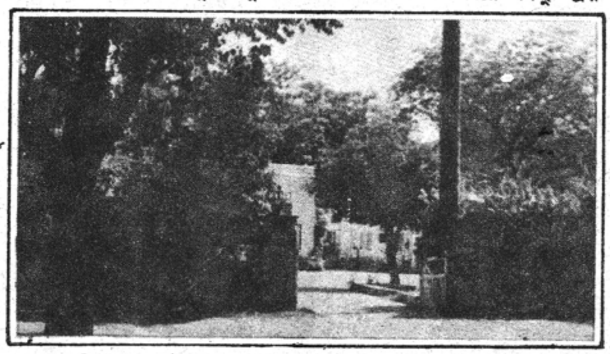
শ্রীরাও বলেছেন, দেশে যখন সংযুক্ত বিরোধী শিবির গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছে, সেই সময়ে সি পি আই (এম) নেতার এ মন্তব্য নিঃসন্দেহে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের পথে অন্তরায়ের পরিচায়ক।

গত ২০ জুন শ্রীরাও সাংবাদিক বৈঠকে আরও নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করে পাড়ি দেন বিদেশের পথে। এদিকে পরদিন দিল্লির সমস্ত রাজনৈতিক মহলে শ্রীরাও-এর এই বক্তব্য নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। তৎপর হয়ে ওঠে অশোক রোডের সি পি আই (এম) সেন্ট্রাল কমিটির অফিসও। দলের পক্ষ থেকে আর পি চ্যাটার্জির স্বাক্ষরিত একটি প্রেস নোটও তৈরি হয়ে যায়। ২২ জুন প্রদত্ত এই প্রেস নোটে বলা হয়, সি পি আই নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের বক্তব্য সম্পূর্ণ 'সত্যের বিরোধী'। পলিটব্যুরো কোন সময়েই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের কাজে অনাগ্রহ দেখায়নি বরং প্রকৃত সত্য হল, সি পি আই (এম)-ই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে।

গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের কথা তুলে সি পি আই (এম) বলেছে, সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তারাই এগিয়ে এসেছিল সর্বপ্রথম এবং 'আমাদের মনে হয়, এটাই ছিল বাম ও নিরপেক্ষ বিরোধী দলগুলিকে এক পতাকার নিচে দাঁড় করানর পক্ষে সবচেয়ে ভাল উপায়।' সে সময় সি পি আই-ও চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বাম শক্তিগুলি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাহায্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে। সি পি আই (এম), সি পি আই, আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয় সে সময়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অন্যান্য বিরোধী নিরপেক্ষ দলগুলিকেও সে আন্দোলনের শরিক হবার জন্য আহ্বান জানান হবে। হয়েওছিল। এমনকী লোকদল-এর সভাপতি চরণ সিং-এর সঙ্গে একটি আলোচনাও করা হয় সে সময়। চন্দ্রশেখর, শারদ পাওয়ার এবং উন্নিকৃষ্ণণের মত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু তাঁদের না পাওয়ায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। সি পি আই (এম)-এর বক্তব্য, এর থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, সি পি আই (এম) সি পি আই-এর মতই বাম ও গণতান্ত্রিক জোট গঠনের পক্ষে? তাঁরা জানিয়েছেন, এ জন্য যদি সি পি আই নতুন কোন চিন্তাভাবনা করে থাকে, তাহলে তারা সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর কাছে তা জানাতে পারে। দু দলের সুচিন্তিত মতামতকে কার্যকর রূপ দেবার জন্য তৈরি হয়েছে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সি পি আই যেন কমিটির পরবর্তী সভায় সে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে।

সি পি আই (এম) শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা বা ত্রিপুরাতেই ঐকমত্যের পক্ষে, শ্রীরাওয়ের এই মন্তব্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো। তারা বলেছে, কোন একক প্রচেষ্টায় নয়, ঐ সমস্ত রাজ্যে সি পি আই (এম) প্রাধান্য অর্জন করেছে সমস্ত বামশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে, একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, বামশক্তিগুলির সম্মিলিত প্রয়াস যে কোন দলকেই সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে আগ্রহী করে তুলবে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

সি পি আই (এম) একদিকে যেমন সি পি আই-এর অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনই নীতির প্রশ্ন তুলে আবার বিরোধকে তুঙ্গে তুলে ধরেছে। শ্রীবাসবপুন্নাইয়ার মন্তব্যের পুনরুত্থাপন করে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু দলের পক্ষে সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও এমন অনেক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে, যেখানে মতবিরোধ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেগুলি সবই মৌলিক আদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রশ্ন। ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদ বা লেনিনবাদকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব বা তার রূপ কী হওয়া উচিত তা নিয়েই বাম রাজনীতিতে ভাঙন ধরেছিল।



সি পি আই (এম)-এর নতুন অফিস

সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছে, সি পি আই প্রদত্ত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ সত্য তাঁরা নিজেদের সমর্থকদের ও কর্মীদের মধ্যেও প্রচার করেছে। বাসবপুন্নাইয়াও সি পি আই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই সত্যকে কেন্দ্র করেই। পলিটব্যুরো একথা বলেছে, যদি সি পি আই (এম)-এর মধ্যে এরকম কোন ভ্রান্তি সি পি আই-এর চোখে ধরা পড়ে, তাহলে তারাও তাদের কর্মীদের তা জানাতে পারে। যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবশ্য এ সব প্রশ্ন আসবে না, আসতে পারে না।

অর্থাৎ সি পি আই ও সি পি আই (এম)-এর সম্পর্ক এখন আদায় - কাঁচকলায়। দুদলের নেতৃত্বই এখন একে অপরের গায়ে কাদা ছোঁড়ায় ব্যস্ত। কেউই কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয়। দুদলের নেতৃত্বই চেয়েছিলেন একটা যৌথ প্রচেষ্টা নেওয়া হোক বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের জন্য। কিন্তু এখন সবই ভেস্তে যেতে বসেছে পরস্পরের দোষারোপের পরিপ্রেক্ষিতে।

গত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দুই দলের নেতৃত্বের কাছেই হাজির হয়েছিলাম এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু দুদলই হৈ চৈ হবার পর এখন কিছুটা শান্ত। একমাত্র প্রেস নোটের বক্তব্য ছাড়া আর কেউই কিছু বলতে রাজি হননি। তাঁদের বক্তব্য, এ বিষয়ে নতুন কিছু বলবার নেই। যা বলার, তাঁরা তা আগেই বলে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান দুই শরিক সি পি আই (এম) ও সি পি আই। রাজ্যস্তরে মতবিরোধের ঘটনা ঘটেছে বহুবারই। এখন তা ঢুকে পড়েছে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যেও। এরকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব হবে কি? □

নয়া দিল্লি থেকে
সুজিত রায়

ফটো: সবিন্দার সিং

নারীজাতির সব রঙিন স্বপ্ন হ'ল সাকার...

অনবদ্য ও মর্য্যাদাসম্পন্ন সাজের এক নতুন যুগ নিয়ে
এলো স্বীট্ মেমোরিজ্—মোলায়েম ও সূক্ষ্ম নারীসুলভ কাপড় !
এই প্রাকৃতিক সুতোর বুনানি উৎকৃষ্ট কলার এক নমুনা !
এ কাপড়ের চমৎকার প্রবাহ ও উজ্জ্বল দীপ্তি আপনাকে দেয় আসল
রেশমের অনুভূতি !
তাই, আর দূর-পূর্ব (ফার ইস্ট)-এর দিকে তাকিয়ে না থেকে এবার
অঙ্গে দিন স্বীট্ মেমোরিজ্ ! দেখুন—নয়ন জুড়ানো কত রঙের বাহার ঃ

শাই পিঙ্কস
গ্রীনিং গ্রীন্‌স
প্যাসানেট ব্লুজ্
ডাসকি ব্রাউন্‌স
মুডি ওয়াইন্‌স...

শুধু তাই নয়। আরো যে কত কী আছে—নিজেই খুঁজুন আর তা
পেয়ে খুশিতে ভ'রে উঠুন !
প্রতিটি মাসেই ২৫০ টি শেড—অর্থাৎ বছরে পাবেন ৩০০০ শেড !

স্বীট্ মেমোরিজ্

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT
শাড়ী

ড্রেস মেটিরিয়াল

নতুন ওয়াটার জেট টেকনোলজির এক নিখুঁত সৃষ্টি!

প্যালেস । জেট প্যালেস । দ্য শীন । প্যালেস দ্য শীন । ক্রেপ দ্য শীন । নার্শিজি । জ্যাকোয়ার্ড দ্য শীন । ডবি দ্য শীন । ডবি প্যালেস । চায়না সিল্ক ।
চায়না ইম্ব্রয়ু । ফুজি সিল্ক । ডবি ইম্ব্রয়ু । জ্যাকোয়ার্ড ইম্ব্রয়ু । নেপ প্যালেস । নেপ দ্য শীন...নানা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বুনানি !



পশ্চাদপট



শিবাজী পার্কে শিবসেনার বিজয় সমাবেশ

শিবসেনা কী চায় ?

শিবসেনা ও বাল ঠাকরে। একটি আঞ্চলিক দল ও তার সর্বময় কর্মকর্তা। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে রাজনীতির পালে এনেছে এক দামাল হাওয়া। না, শুধু ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী বোম্বাইতেই এর খড়্গ উদ্যত নয়, আজ সারা মহারাষ্ট্রেই শিবসেনার প্রত্যক্ষ প্রভাব। স্পষ্টতই সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও শিবসেনা একটি বিরাট 'ফ্যাক্টর', আর এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে লোকসভার অধিবেশনে। সংবিধান-বিশেষজ্ঞরাও আলোচনায় সামিল হয়েছেন। আসাম সমস্যা, পাঞ্জাব সমস্যা ও গুজরাত সমস্যার মত শিবসেনার রাজনীতিও প্রত্যক্ষ করার বিষয়।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালের সাম্প্রতিক নির্বাচনে শিবসেনার নিরঙ্কুশ সাফল্য পর্যালোচনা করা দরকার। এ'রা নিজেদের আঞ্চলিক রাজনীতির জাল আরও বিস্তৃত করার সুযোগ পাচ্ছেন। 'আসু'র মত শিবসেনারাও বোম্বাই থেকে বহিরাগতদের হঠাতে বদ্ধপরিকর, এবং সেজন্য ভিত্তিবর্ষ ঘোষণা করতে দারুণভাবে উদ্যোগী। এটি সরল সত্য, এ দাবি ভারতের জাতীয় সংহতির পরিপন্থী এবং সংবিধান-বিরোধী। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, শিবসেনার সঙ্গে পংক্তিভোজে না বসেও কোরাস গেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। বসন্তদাদা পাটিল একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বোম্বাইয়ের জনবিস্ফোরণে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, 'এখন আমাদের বিবেচনা করা উচিত বোম্বাইতে নতুন অনুপ্রবেশ রোধ করা দরকার কিনা। চীনেও নগরপ্রবেশের জন্য এক ধরনের অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা আছে।' চীনের প্রসঙ্গ উত্থাপন স্পষ্টতই ইঙ্গিতবাহী। শিবসেনার পক্ষ থেকে বোম্বাই নগরীতে প্রবেশ রোধের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তাব এলে তিনি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে পরদিনই (৮ মে ১৯৮৫) লোকসভার অধিবেশন উত্তাল হয়ে ওঠে। বিরোধীপক্ষের মধু দণ্ডবতে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্ন তোলেন। প্রধানমন্ত্রীও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর এই সঙ্কীর্ণ মন্তব্যে বিচলিত বোধ করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 'এরকম নিষেধাজ্ঞা জারির প্রশ্নই উঠতে পারে না।' বিষয়টিকে ঘিরে রাজ্যসভার বিরোধী সদস্যরাও সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনরকম সংশয়ের অবকাশ না রেখেই সংবিধানের আদর্শ মেনে চলাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য এন কে পি সালভে বলে বসলেন, 'কংগ্রেস কখনই শিবসেনার আদর্শ সমর্থন করে না, কিন্তু বোম্বাইয়ের সমস্যার গুরুত্ব বিচার করে এই অনুপ্রবেশ রোধ করতে কোন একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তবে ধর্ম জাত (Caste) বা ভাষা কখনই এর ভিত্তি হবে না।' সালভের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক সদস্যই শিবসেনা বা দাদা পাটিলেরই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বলে মন্তব্য করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

বোম্বাইয়ে জনবিস্ফোরণ ঘটছে। এবং এটাই শহরে পানীয় জল ও বাসস্থানের অভাব, পরিবেশদূষণ এসবের জন্য দায়ী। হ্যাঁ, সত্য কথা, শহরে জনবিস্ফোরণ ঘটছে, এবং এই শহরেই অন্য প্রদেশাগত শরণার্থী মানুষজনের ভিড় বেশি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বোম্বাইতে এখন শিক্ষিত ও কারিগরি দক্ষতা-সম্পন্ন মানুষজনের পক্ষে চাকরির সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

বোম্বে মেট্রোপলিটান রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোঃ (বি এম আর ডি এ) এবং আনতুলে নিযুক্ত কেরকার কমিটির রিপোর্ট থেকে যে সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের হাতে এসেছে, তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, বোম্বাই নগরীর জনবিস্ফোরণের মূল কারণ শরণার্থীরা নন। মোট সংখ্যার হিসেবে ফিবছর এই শহরে শরণার্থী মানুষদের আগমন ভীষণভাবে বাড়ছে, কিন্তু মোট বার্ষিক জনবিস্ফোরণের অনুপাতে এই অনুপ্রবেশের হার অনেক কমছে। এবং দেখা যাচ্ছে জনবিস্ফোরণের মূল কারণ প্রাকৃতিক জন্মহার বৃদ্ধি। শিবসেনাদের মূল অভিযোগ, দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায়ের শরণার্থী অত্যন্ত বেশি এবং তা দিনদিন বাড়ছে। বি এম আর ডি এ যে সংখ্যাতত্ত্ব সরবরাহ করছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্নাটকের শরণার্থী মানুষদের হার যে বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৬১ সালে মোট শরণার্থীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের শরণার্থী ছিলেন শতকরা ১১·৮ জন, ১৯৭১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৬ জনে, এবং বর্তমানে তা অনেক বেড়েছে। বোম্বাইতে জনবিস্ফোরণের অনুপাতে শরণার্থীদের হার যেখানে বাড়তির দিকে, সেখানে দক্ষিণ ভারতীয়দের এই অস্বাভাবিক হার বৃদ্ধি লক্ষণীয়। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা, বিশেষভাবে রত্নগিরির মানুষরাই বেশির ভাগ বোম্বাইতে ছুটে আসেন, এরপর আছে গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। অন্য সব প্রদেশের মানুষজন বোম্বাইতে খুব কমই আসছেন। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কর্নাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ু বাদে অন্য সব প্রদেশ থেকে যাঁরা আসছেন তাঁদের হার আরও হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬১ সালে যা ছিল মোট শরণার্থীদের ১৭.৫ শতাংশ, ১৯৭১-এ তা দাঁড়িয়েছে ১০·৭ শতাংশে। এখন তা আরো অনেক কম। সরকারি সংখ্যাতত্ত্বই এর ভিত্তি।

বোম্বাইয়ের আসল চিত্রটি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। এখানে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের কাছে অস্বচ্ছ হলেও একটা ধারণা

আছে। বোম্বাইয়ের বস্তি ও ঝোপড়পট্টিতেই শহরের শতকরা ৬০ জনেরও বেশি মানুষ বাস করেন, এবং এঁরা অত্যন্ত ঘিঞ্জি অন্ধকারের মধ্যে নিকৃষ্টতম পরিবেশে বসবাস করছেন। এই শতকরা ষাট ভাগের কপালে জুটেছে মাত্র শতকরা ২ ভাগ জমি। এই ঘিঞ্জি বস্তিগুলোর মানুষজনের জীবিকারও রকমফের আছে, এঁরা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। হ্যাঁ, কট্টরপন্থী বাল ঠাকরের বিশাল অভিযোগ, এই ঝোপড়পট্টিতেই লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ বিদেশি অপরাধী এবং এঁরা শহরের অর্থনীতিতে বিরাট চাপ সৃষ্টি করছেন। এঁদের সম্পর্কে সরকারি নথিপত্রে উপযুক্ত রেকর্ড নেই, কিন্তু পুলিশমহল ওয়াকিবহাল।



শিবসেনা মিছিল বোম্বাই পুরভবনের সামনে দিয়ে

বাল ঠাকরেই সর্বেসর্বা

বোম্বাইয়ের সর্বত্র পতপত করে উড়ছে শিবসেনার গৈরিক পতাকা। বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংও শিবসেনা অধিকৃত। 'বেটার টু বি এ কিং-মেকার' মনোভাবের বাল ঠাকরে ছগন ভুজওয়ালকে বানিয়েছেন বোম্বাইয়ের প্রথম নাগরিক। বোম্বাইতে চলছে শিবসেনার বকলমে বাল ঠাকরের রাজত্ব। কারণ শিবসেনার সংবিধান অনুযায়ী সেনাপ্রমুখ বাল ঠাকরেই একমাত্র নীতি নির্ধারক ও দলীয় প্রধান নীতি ঘোষণার অধিকারী। অন্য সবাই ওঁর মুখপাত্র বই আর কিছু নন।

অবশ্য সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার জন্যও ওঁকে দায়ী করা হয়ে থাকে। এসব কার্যকলাপ ও অপবাদের জন্য বাল ঠাকরে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন। বরং অনেক কড়া ডোজের দাওয়াই প্রয়োগের কথা ভাবছেন ঠাকরে। কারণ বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সাম্প্রতিক নির্বাচন (২৫.৪.৮৫) সব ধ্যান-ধারণাকে ওলটপালট করে দিয়েছে। শিবসেনার অভাবিত সাফল্য (চুয়াত্তরটি আসন লাভ) বোম্বাই জনসাধারণের ভিন্ন মানসিকতার প্রতিফলন।

এবারের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এককভাবে কংগ্রেস দল শিবসেনার অর্ধেক আসন লাভ করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, শিবসেনা ১৭০টির মধ্যে মাত্র ১৪০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এবং যেসব সিট শিবসেনারা পায়নি সেসব জায়গায় অধিকাংশ আসনেই শিবসেনী প্রার্থীরা নামমাত্র ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দলের অন্তর্দলীয় কোঁদল প্রকট হয়ে উঠেছিল। নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে একেকটি আসনে বেশ কয়েকজন করে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনে কংগ্রেসের এই ভরাডুবির নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুরলী দেওড়া। সবচেয়ে বড় কথা, রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী দাদা পাটিল এই নির্বাচনে দলবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন বলে অনেক কংগ্রেসীরই ধারণা। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

শিবসেনা	=	৭৪
কংগ্রেস (ই)	=	৩৭
পি ডি এফ	=	১৯
বি জে পি	=	১৩
মহারাষ্ট্র মুসলিম লিগ	=	৫
কমেগার আগাধি	=	৩
ভারতীয় কং	=	১
নির্দল	=	১৮
মোট	=	১৭০

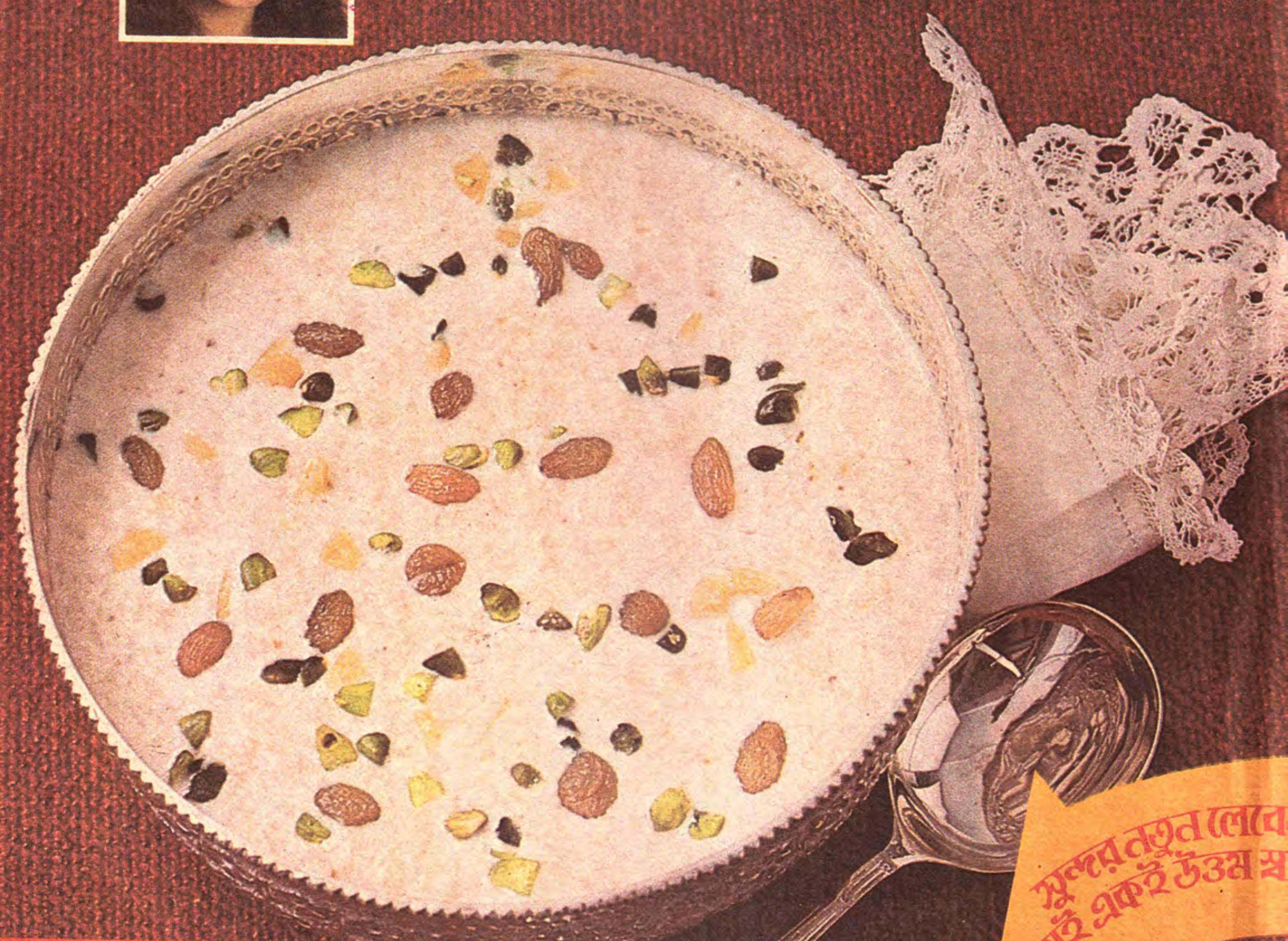


শিবসেনা প্রধান ঠাকরে

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য শিবসেনার প্রয়োজন ছিল আর মাত্র বারটি আসন। যা হোক, একক গরিষ্ঠ দল শিবসেনা বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধিকার করেছে এবং দলের একমাত্র বিধানসভা সদস্য



মিনিটের মধ্যে উৎকৃষ্ট সরযুক্ত পায়েস



"আমার শাশুড়ী চমৎকৃত হয়ে গেলেন ! 'এত সুস্বাদু পায়েস এত াড়াতাড়ি ?' মিল্কমেড দিয়ে পায়েস বানানো খুবই সহজ এবং স্বাদে তফাৎ ানে।

মিল্কমেড দিয়ে পায়েস বানিয়ে দেখুন আপনার ভাল লাগবে।

মিল্কমেড দিয়ে আপনি অনেক কিছুই তৈরী করতে পারেন। প্রতিমাসের জারের তালিকায় মিল্কমেড যেন থাকে।"

বিনামূল্যে
এক সেট রঙ্গীণ নতুন মিল্কমেড রান্নার প্রণালী কার্ড।
পরিষ্কার বড় হরফে এই ঠিকানায় লিখুন
মিল্কমেড রেসিপি সার্ভিস
পোস্ট বক্স : 7177 নিউ দিল্লী-110002

মিল্কমেড পায়েস 6 জনের জন্য

উপকরণ : 1 টিন মিল্কমেড, 1 লিটার দুধ, 100 গ্রাম চাল, 2 এলাচ গুঁড়ো, ½ কাপ কিসমিস এবং বাদাম কুচি (ইচ্ছা মতন)

পদ্ধতি : দুধে চাল দিয়ে আঁচে বসিয়ে ফুটতে দিন। সিদ্ধ হয়ে এলে মিল্কমেড এবং এলাচ গুঁড়ো দিয়ে আঁচ কমিয়ে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না আপনার পছন্দ মতন ঘন হয়ে উঠছে। কিসমিস ও বাদাম কুচি সাজিয়ে গরম বা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।





বাল ঠাকরের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থী নতুন মেয়র ভুজওয়াল

ছগন ভুজওয়াল মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

শিবসেনার এই বিরাট সাফল্যের পর শিবাজী পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিবসেনার প্রথম সারির নেতারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয়তম মারাঠি অভিনেতা দাদা কোনকে সহ বোম্বাইয়ের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক। সেনাপ্রমুখ বাল ঠাকরে বোম্বাইকে সুন্দর করে তোলার ব্যাপারে অনেক পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন, যা শিবসেনার এতাবৎকালের মূল দাবি। এবং নিজ দলের নির্বাচিত সদস্যদের কড়াসুরে স্মরণ করিয়ে দেন, 'তোমরা মনে রাখবে, তোমাদের প্রথম পরিচয় শিবসেনা এবং তারপর কর্পোরেটর। আর শিবসেনার দলীয় নীতির রূপায়ণই হবে তোমাদের প্রাথমিক কাজ।' দলনেতা নির্বাচিত হবার পর ছগন ভুজওয়াল মেয়রের মূল নীতি ঘোষণা করেছেন ঃ 'আমাদের লক্ষ্য 'সুন্দর মুম্বাই', 'মারাঠি মুম্বাই।' এবং বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির দৈনন্দিন কাজকর্মও মারাঠি ভাষায় করার কথা ব্যক্ত করেছেন।

যাহোক, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে শিবসেনার অভাবিত সাফল্যের পরই শিবসেনা স্বেচ্ছাসেবকরা আবার ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এবং সেনাপ্রমুখ বাল ঠাকরে বোম্বাইতে শরণার্থীর অনুপ্রবেশ রোধ, আসামের ধাঁচে ভিত্তিবর্ষ নির্ধারণ করে বিতাড়ন, সংবিধানের ১৯ (১) (ই) ধারা সংশোধন, বোম্বাইয়ের 'মুম্বাই' নামকরণ, সর্বস্তরে মারাঠি ভাষার প্রবর্তন এসব ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বাল ঠাকরে সারা বোম্বাইকে উদ্বেল করে রেখেছেন, কেন্দ্রও ওঁকে নিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এবং বোম্বাইয়ের প্রভাতী কাগজগুলো উল্টোলেই দেখা যাবে বাল ঠাকরের একটা না একটা পিলে-চমকান বিবৃতি। বোম্বাইতে বাল ঠাকরের ভাবমূর্তিটা এখন এমন, যে কোন আলোচনার আসরে এসে পড়বেনই। ওঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও আধিপত্য লক্ষ্য করে 'মুম্বাই-মারাঠি পত্রকার সংঘ' আজাদ ময়দানের পত্রকার হলে ৭ জুন 'মিট দ্য প্রেস'-এর আয়োজন করেছিল। সেদিনের উত্তপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলাম। এর পরদিন পরিবর্তন-এর সঙ্গে ওঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়। পরিবর্তন-এর সঙ্গে বাল ঠাকরের সাক্ষাৎকারটি থেকে বোম্বাইতে আগামী দিনের শিবসেনার রাজনীতি ও বাল ঠাকরে সাহেবের পদক্ষেপ সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। □

বোম্বাই থেকে
রীণা মৃণাল

একান্ত সাক্ষাৎকার

বোম্বাই অনাথাশ্রম নয়, গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া আছে বলে শুধু ঢুকলেই চলবে না ঃ বাল ঠাকরে



দূরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে আজ রাতে একটি টি ভি প্রোগ্রাম দেখান হবে। টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় অ্যাড এজেন্সির বিজ্ঞাপন ঃ 'আজ রাত ৯-২০ মিঃ-এ টি ভি স্টারদের কোন পোশাক নেই।' পাশের ছবিতে একটি বিশাল বাঘ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ বনবাসী জীবজন্তু। দেখেই মনে পড়ল, সত্যিই তো, কলানগরের সেই বিখ্যাত বাঘটিরও কথাবার্তায় কোনরকম পোশাক-আশাক ছিল না।

আট জুন, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। কলানগরের মাতুশ্রী বাংলো, শিল্পশ্রীমণ্ডিত বৈঠকখানা ঘর। পারিষদবর্গ পরিবৃত বসে আছেন বাল কেশব ঠাকরে। পরনে প্রচণ্ড দামী কালচে-লাল সিল্কের কুর্তা ও লুঙ্গি, হাতে পরিচিত পাইপ। ভিলে পারলের একটি কারখানায় ঝুটঝামেলা চলছে, সমাধানের জন্য শ্রমিকনেতারা এসেছেন। আলোচনার মাঝপর্বেই আমি ও পলাশ (আলোকচিত্রী) ঢুকলাম ; কারণ সকালে দশ মিনিট বিলম্বের অজুহাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পরিত্যক্ত হয়েছিল।

'কট্টর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক, তাকে বর্গ বা ঘন করেও সম্ভবত 'কট্টর' শিবসেনা-প্রমুখ বাল ঠাকরের কট্টরতার পরিচয় দেওয়া দুষ্কর। প্রাদেশিকতার মুখোশটিকে আড়াল না করেই বলতে পারেন, 'প্রথমে আমি মারাঠি, তারপর ভারতীয়।' 'অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধী' হিসেবে নিজেকে জাহির করতে ভালবাসেন এবং বোম্বাইতে সব কমিউনিস্ট দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিতে পেরেছেন এটা ওঁর অন্যতম দাবি। 'ক্রুসেডার'-এর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বলেন, 'মহারাষ্ট্রের মাটির গন্ধ যাঁদের শরীরে, তাঁদের জন্যই আমার নিয়ত সংগ্রাম।'

'মিট দ্য প্রেস'-এর চোখাচোখা উত্তর বা প্রশ্নের উত্তরে আক্রমণাত্মক উলটো প্রশ্ন গুঁজে দেওয়া ওঁর এক


নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য।
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী। শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী—শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব।
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম®
রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপুর দুধে মিশিয়ে নিন
এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাকে
Nestlé
Nestum
baby cereal
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে!
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
Nestlé
FSL/N/3800BN

বিচিত্র অভ্যেস লক্ষ্য করেছিলাম। সেজন্য সাংবাদিক সম্মেলনের পরই বলে দিয়েছিলাম—সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর প্রত্যাশা করব, এবং আক্রমণাত্মক মনে হলেও অনেক প্রসঙ্গ টানবার ইচ্ছে রয়েছে। বালসাহেব কঠিন চোখের দৃষ্টি হেনে বলেছিলেন, 'বেশ, আসুন। আমার বাড়িতেই আসুন, পাক্কা সকাল সাড়ে এগারটা—খোলামেলা প্রশ্ন, খোলামেলা উত্তর, এইটুকুই তো?'

বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে এসে বসেছিলেন তামিল সাংবাদিক মিঃ চন্দ্রশেখর। মিঃ ঠাকরে আমাকে জিগ্যেস করলেন 'ওঁকে বসতে দিলে আপনার নিশ্চয়ই আপত্তির কিছু নেই?' কাঁচমাচু গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'কোনরকম বিরক্ত করব না, আপনার সাক্ষাৎকারটা টেপ করে নিচ্ছি।' এই বলে ভদ্রলোক পিয়ানো সুইচে চাপ দিলেন। পটভূমি যেন তৈরি হয়েই ছিল, কালবিলম্ব না করেই সরব হলেন সেনাপ্রমুখ বাল ঠাকরে।

ঠাকরে: খবরটা কী জানেন? দিল্লির ধাঁচে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা এবং অন্যান্য সব মেট্রোপলিটান শহরগুলো কেন্দ্রশাসিত হতে চলেছে।

পরিবর্তন: কেন, এই ব্যাপারে কোনরকম অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে কি?

ঠাকরে: না, হিন্দুস্থান সমাচার থেকে খবরটা লিক হয়েছে। রাজীব কাগজপত্তর তৈরি করে রেখে গিয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরলেই ঘোষণা হবে। আমার কাছে খবরের কাগজের লোকজন প্রতিক্রিয়া জানতে এসেছিলেন, আমি জানিয়েছি। কলকাতা, মাদ্রাজ সব জায়গায়ও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

পরিবর্তন: আপনার বিশেষ প্রতিক্রিয়া?

ঠাকরে: যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই সত্যে পরিণত হচ্ছে। অবশ্যই এটা কোন সমাধান নয়। হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল প্রভিন্সিয়ালিজম অন লিঙ্গুস্টিক বেস? একযোগ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়তে হবে—হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড।

পরিবর্তন: কলকাতার প্রতিক্রিয়া জানেন?

ঠাকরে: না, জানি না।



বাইরে আমার যা প্রভাব তাই আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট

সব জায়গার প্রতিক্রিয়া জানার পর ব্যবস্থা নেব।

পরিবর্তন: আপনার সঙ্গে কি এ ব্যাপারে জ্যোতি বসুর কোন রকম কথাবার্তা হয়েছে?

ঠাকরে: না, কখনই হয়নি। ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে রয়েছে। অবশ্য জানি না, আমার সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলতে রাজি হবেন কিনা। কারণ আমি কমিউনিস্ট-বিরোধী, আর উনি কমিউনিস্ট নেতা। ওঁদের সব ফানি আইডিয়াজ—হাঃ হাঃ হাঃ—মে বি ডিউ টু বি টি রণদিভে।

পরিবর্তন: বিধানসভা বা লোকসভায় আপনার কী ক্ষমতা যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপনি লড়বেন! আপনার একমাত্র বিধানসভা সদস্য ছগন ভুজওয়াল। শক্তি আপনার ভীষণভাবে সীমিত, তাই নয় কি?

ঠাকরে: উই ডোন্ট বদার দ্যাট স্ট্রেন্থ। বাইরে আমার যা প্রভাব, তাই আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট।

পরিবর্তন: খবর যদি সত্য হয়, আপনার আন্দোলনের ধাঁচ কেমন হবে?

ঠাকরে: এখনই সেটা আমি আপনার কাছে কেন বলতে যাব? দেখি আমার প্রতিক্রিয়ায় অন্য রাজ্যের প্রতিক্রিয়া কী হয়। এরপর সব বিবেচনা করে ঠিক করব।

পরিবর্তন: হ্যাঁ, ভাল কথা, তাহলে আপনারা আন্দোলনে নামছেন?

ঠাকরে: নট ওনলি অ্যাজিটেশন, দেয়ার মে বি অ্যানার্কি।

পরিবর্তন: বেশ, এবার অন্য প্রসঙ্গে আসছি। বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে আপনারা অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, নইলে ১৭০টি সিটের সব কটিতেই প্রার্থী দিলেন না কেন?

ঠাকরে: নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে কোন মতেই সন্দিহান ছিলাম না। কিন্তু সময় ছিল অত্যন্ত অল্প; সেজন্য যেসব জায়গায় মারাঠি সেন্টিমেন্ট অত্যন্ত প্রবল ছিল, সেসব কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিলাম।

পরিবর্তন: সাফল্য সম্বন্ধে ঠিক কতটা নিশ্চিত ছিলেন? নাকি একেবারে অভাবিত সাফল্য পেয়েছেন বলে মনে করছেন?

ঠাকরে: ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম। নির্বাচনী মিটিংগুলোতেই জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া টের পেয়েছিলাম। এমনকী নির্বাচনের দুদিন আগে আমাদের দলের ঘরোয়া বৈঠক বসেছিল। আমাদের সবাই বলছিলেন, কুড়ি থেকে তিরিশটা সিট জিতব। আমিই একমাত্র জোর দিয়ে বলেছিলাম, ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যা হবেই; এমনকী কিছু বেশি হলেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হব না। মিটিংয়ে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, এবার বি এম সি বিল্ডিং-এ গেরুয়া পতাকা উড়বেই।'

পরিবর্তন: রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখেন, তাহলে রাজীব ঢেউ-এর বিরুদ্ধে আপনার দলের এই সাফল্যের জন্য কোন রাজনৈতিক কৌশল দায়ী?

ঠাকরে: না, রাজীব-ঢেউ নয়, ইন্দিরার মৃত্যু। সকলেরই কিছু ইসু থাকে, আমার হাতেও কিছু ইসু ছিল। সেগুলো কাজে লাগিয়েছি।

পরিবর্তন: আমার তো ধারণা, আপনার রাজনৈতিক কৌশলের চেয়ে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বই বিশেষভাবে দায়ী। এমনকী নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী দাদা পাটিলের কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিও এজন্য বিশেষভাবে আপনার সহায়ক হয়েছে।

ঠাকরে: আপনার ধারণা নয়, কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী কংগ্রেসীরাই এটা রটনা করছে। কেন্দ্রের পোঁ-ধরা কিছু কংগ্রেসী এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

পরিবর্তন: কেন, মুখ্যমন্ত্রী দাদা পাটিল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বোম্বাই কেন্দ্রশাসিত হতে চলেছে, সবাইকে এজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

ঠাকরে: ভুল খবর। আমারই দলের এম এল সি প্রমোদ নাওয়ালকার প্রসঙ্গটি ফ্লোরে তুলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দাদা পাটিল উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পরিবর্তন: কংগ্রেসী এম পি গুরুদাস কামাতও প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীরই মদতে ওঁর কিছু ঘনিষ্ঠ অনুচর বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়েছেন।

ঠাকরে: গুরুদাস কামাত

কে? একটা ফচকে ছোঁড়া, কংগ্রেসী টিকিটে এম পি হয়ে বাড়াবাড়ি করছে। ওকে নির্দল সদস্য হিসেবে যে কোন সিটে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে বলুন, জামানত বাজেয়াপ্ত হবেই—আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি—।

পরিবর্তন: জনশ্রুতি আছে, আপনার সঙ্গে দাদা পাটিলের মধুর আঁতাত আছে। সেটাও নির্বাচনে আপনার সপক্ষে কাজ করেছে।

ঠাকরে: হ্যাঁ, দাদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আছে। কেন, নিলাঙ্গেকার পাটিলও ভদ্র মানুষ, ও'কেও কিছু হিপোক্র্যাট ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে। ও'র সঙ্গে শিগগিরই দেখা করে বোম্বাইয়ের সমস্যা আলোচনা করব।

পরিবর্তন: যাক, কংগ্রেসের এই ভরাডুবির জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মুরলী দেওড়া নৈতিক দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। এই সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাচ্ছেন?

ঠাকরে: মুরলী নিজের ঘর থেকেই আসল শিক্ষাটি পেয়েছেন। কারণ উনি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ছেলে বটে, কিন্তু বিয়ে করেছেন মারাঠি মেয়েকে। আসল চিত্রটি ওঁর কাছে পরিষ্কার।

পরিবর্তন: এবার বলুন, রাজ্যের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বোম্বাইয়ের কী কী সমস্যা আলোচনা করতে চাইছেন?

ঠাকরে: জল সরবরাহ, ইনফ্রাক্স, বাসস্থান, বোম্বাইয়ের বিউটিফিকেশান, চিলড্রেন্স পার্ক, জু এসব।

পরিবর্তন: গতকাল একজন সাংবাদিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন তোলাতে আপনি বলেছিলেন, আপনারা আগে আমাকে প্রধান-মন্ত্রী করুন, তারপর সমস্যা নিয়ে আসুন। আপনি প্রধানমন্ত্রী না হলে কি সমস্যার সমাধান হবে না?

ঠাকরে: নো, ইট ইজ বেটার টু বি এ কিংমেকার, রাদার দ্যান বিকামিং এ কিং। আমি প্রধানমন্ত্রী হতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নই। পরের প্রশ্ন?

পরিবর্তন: কালকের মন্তব্যের কারণ?

ঠাকরে: সীমিত ক্ষমতার খাপবোঝাতে চাইছিলাম।



নিজেদের শক্তি সম্পর্কে কোনমতেই সন্দিহান ছিলাম না

পরিবর্তন: আপনাদের দল-গত শক্তি তো শুধুমাত্র বোম্বাইতেই সীমিত। দলের সর্বভারতীয় রূপ দিতে আপনি সচেষ্ট নন?

ঠাকরে: সব সময়েই আপনারা একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন। সারা মহারাষ্ট্রেই আমার দলের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। লুধিয়ানা, মধ্যপ্রদেশেও শাখা রয়েছে, এবং ওরা যথেষ্ট সক্রিয়। পশ্চিম-বঙ্গ থেকেও শাখা খোলার আবেদন আসছে। ভাবছি শিগগির ওখানে সফর করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করব।

পরিবর্তন: আপনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, আঞ্চলিক রেষা-রেষিতে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেন। মন্তব্য?

ঠাকরে: সব অভিযোগ বাড়াবাড়ি। অবশ্য এতে আমার কিছু যায় আসে না। সমস্যাটা মূলত আর্থিক, প্রাদেশিক বা সাম্প্র-দায়িক নয়। এটাও বলে দিচ্ছি, যাঁরা নাক উঁচু সম্প্রদায়ের লোক, যাঁদের ছেলেমেয়েরা ড্যাডি-মাম্মি বলে তাঁরাই এসব অভিযোগ বেশি তোলেন। দে আর অল হিপো-ক্র্যাটস। আমারই এক আত্মীয়ের কথা বলছি, দশ-বারো বছরের ওপর নাইরোবিতে আছেন, মহা-রাষ্ট্রের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। তাঁর কী দুঃসাহস, আমাকে বলেন কিনা কমিউনাল! সোজা ওঁকে বলে দিয়েছি, গেট আউট, হিপোক্র্যাট কোথাকার! মহারাষ্ট্র সম্পর্কে তোমার কোন ভাববার দরকার নেই, নাইরোবিতে এক্ষুনি ফিরে যাও।

পরিবর্তন: দক্ষিণ ভারতীয়-দের সম্পর্কে আপনার বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। ওঁদের সম্বন্ধে আপনি প্রায়ই বিষোদগার করে থাকেন। এই মনোভাবের কারণ?

ঠাকরে: (সেই তামিল সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে বললেন) হ্যাঁ, মিঃ চন্দ্রশেখর, আপনাদের কথা বলছি। মন দিয়ে শুনুন।

ওঁদের মানসিকতা অত্যন্ত নিম্ন-মানের, দে কিপ দেমসেলভস অ্যালিয়েনেটেড ফ্রম আস। সুখের দিনেই ওঁরা এখানে থাকেন, ক্রিম খান, আর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপদ-আপদের সময় সোজা দেশে গিয়ে বসে থাকেন। আমার কথা হল, সুখে-দুঃখে আমাদের সঙ্গে থাক, আমাদের সমব্যথী হও। হ্যাঁ, আর কোন ফ্রেশার তামিলিয়ান আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই। সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দেখুন, ওঁরা বোম্বাইতে কেমন ছড়িয়ে পড়ছেন। অন্য প্রদেশাগতদের মধ্যে ও'রাই সবচেয়ে বেশি সুযোগসন্ধানী।

পরিবর্তন: তাহলে আপনার বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার যে অভিযোগ করা হয়, তা সত্যি?

ঠাকরে: হ্যাঁ, আমার মনো-ভাবের কোনই পরিবর্তন হবে না। তামিলনাড়ুতে আঞ্চলিক দল থাকতে পারে, অন্ধ্রতে থাকতে পারে, কর্নাটকে থাকতে পারে, শুধু এখানেই কসমোপলিটানের ধুয়ো তুলে রাখা হবে কেন? বাঙালি-দেরও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির একটা আইডেনটিটি আছে, ও'রা সেটা নিয়ে গর্ব করেন। কিন্তু এখানে মারাঠিদের আইডেনটিটি বলে কিছু নেই। সো লেট আস অল ফেস দ্য রিয়্যালিটিজ।

পরিবর্তন: ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেই হিসেবে আপনার মুসলমান-বিদ্বেষ জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী।

ঠাকরে: না, ভারতীয় মুসল-মানদের প্রতি আমার কোন বিষোদগার নেই। এখানকার সমঝদার মুসলমানরা আমাকে সমর্থন করেন। তাঁরা মারাঠি মুসলমান, জাতীয়তাবাদী মুসলমান। এই কুরলার কথাই ধরুন না কেন, ওটা তো মিনি পাকিস্তান। কিন্তু ওখানেও আমার প্রার্থী মোহন সাওয়ান্ত যথেষ্ট মুসলমান ভোট পেয়েছেন, ভুজওয়াল অনেক মুসলমান ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন। আমার আক্রমণ তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদেশি মুসলমান এবং এখানে বেআইনিভাবে বসবাস করছেন। এখনও বিদেশি মুসলমান দলে দলে বোম্বাইতে ঢুকছেন। এই তো সেদিনের কথা, আমার ছেলেরা এসে খবর দিল, জে জে স্কুল অব আর্টের সামনে নতুন মুসলমানরা এসে তাঁবু গেড়েছেন। পুলিশ কমিশনার সোমানকে ফোন করলাম। ও'রা গিয়ে এ'দেরকে তুলে দিয়েছেন। গতকাল সাংবা-দিক সম্মেলনে জানিয়েছি, এই বোম্বাইতে এক লক্ষেরও বেশি পাকিস্তানি মুসলমান অবৈধভাবে রয়েছেন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরও এখানে সবাই বসে আছেন। পুলিশ এবং সরকার সবকিছু ভালভাবে জানেন—হোয়াট দিজ পিপল আর ড্যুয়িং ইন র‍্যাট হোলস। কিন্তু কেউ কিছু করতে সাহস করছেন না, কারণ এ'রা এক একজন এখন আণ্ডারওয়ার্ল্ডের গড হয়ে উঠেছেন। এ'রা ভীষণ বিপজ্জনক, এ'রাই ভারতীয় মুসল-মানদের মধ্যে বিদ্রোহের বিষ ছড়াচ্ছেন, ইসলাম খতরে মেঁ হ্যায়। আমাদের দেশ ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। আমি আবারও বলছি, এ'রা

যদি জাতীয়তা-বিরোধী কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত না হন, তাহলে ইসলাম ইজ গোয়িং টু বি ইন ট্রাবল।

পরিবর্তন : বিদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। সাধারণভাবেও আপনি অন্য রাজ্য থেকে আগত মানুষজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। এটা তো অযৌক্তিক আবদার!

ঠাকরে : বোম্বাই কোন অনাথাশ্রম নয়, গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া আছে বলে শুধু ঢুকলেই চলবে না। বাঃ-রে-বা, আসাম থেকে যখন তাড়ান হচ্ছে, তখন কোন দোষের নয়। আর আমাদের বেলাতেই বলা হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল মাইণ্ডেড।

পরিবর্তন : আসামের ব্যাপার স্বতন্ত্র। সেটা বিদেশিদের প্রসঙ্গ, বোম্বাইয়ের পরিস্থিতি অন্যরকম।

ঠাকরে : সুন্দর কথা। আসামে যাঁরা বিদেশি, অ্যাণ্টি-ন্যাশনাল, বোম্বাইতে এসে পৌঁছলেই তাঁরা ন্যাশনালস বনে যাবেন। এখানে যেন কোন সমস্যা নেই।

রাজীবও তো বলছেন, দিল্লিতে শরণার্থী প্রবেশ রোধ করতে হবে—দিল্লিতে এখন ১ কোটি পঞ্চাশ লাখ শরণার্থী, শিগগিরই তা দু কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। রাজীবের বেলায় কোন দোষ নেই, কিন্তু বাল ঠাকরে বললেই তার সমালোচনা করতে হবে, এই তো?

পরিবর্তন : বোম্বাইতে অনুপ্রবেশ রোধ করতে আপনি কি ভিত্তিবর্ষ ঘোষণা করবেন বলে সত্যিই দৃঢ়বদ্ধ?

ঠাকরে : দৃঢ়বদ্ধ নই। এ লাইনে চিন্তা করছি। আইডেনটিটি কার্ডের প্রচলন করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু ধরুন, যাঁরা পনের বছর বা অনুরূপ সময়সীমার আগে এসেছেন তাঁদের ওপর কোনরকম নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। এসব ব্যাপারে একটা 'শ্বেতপত্র' তৈরি করছি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে দেব।

পরিবর্তন : কী ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চলেছেন?

ঠাকরে : মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের যে ক্ষমতা আছে তার বলেই আমরা অবাঞ্ছিতদের কোনরকম ট্রেড লাইসেন্স দেব না। মূল উদ্দেশ্য হল, যাঁরা ট্যাক্স দিচ্ছেন, তাঁরা কেন ওঁদের ভার বইবেন? বোম্বাইতে এত জলের টানাটানি, অথচ এঁদের জন্য জলের অভাব আরও বাড়ছে, পুরিবেশ কলুষিত হচ্ছে···

পরিবর্তন : অন্য প্রদেশের মানুষ যদি এ রাজ্যে শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী হন, তাঁদের শিল্প-লাইসেন্স দেবেন না?

ঠাকরে : ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমাকে এ নিয়ে অনেক জায়গায় মিসকোট করা হয়। পরিষ্কার জানাচ্ছি, শিল্পের প্রসার করতে দিতেই হবে, নইলে কাজের সুযোগ বাড়বে কেমন করে? ইয়ে তো রোটিবুজিকা বাত হ্যায়। যো রোটি ছিন লেতা হ্যায়, উনকো জলদি হটানা হ্যায়।

পরিবর্তন : শরণার্থী রোধের জন্য আপনি সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে আগ্রহী। এটা কি কখনও সম্ভব?

ঠাকরে : হ্যাঁ, আমাদের ক্ষমতা সীমিত; কিন্তু এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই সংবিধান সংশোধনের দাবি জানিয়ে যাব।

পরিবর্তন : গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি বললেন, 'পার্শিদের আমি কখনও তাড়াব না, পার্শিরা বোম্বাইকে অনেকাংশে সুন্দর করে তুলেছেন।' এবং আপনি এও বলেছেন, ফিরোজ শা মেহতা আপনার প্রণম্য পুরুষ।

ঠাকরে : অস্বীকার করছি না।

পরিবর্তন : পার্শি সম্প্রদায়ের নতুন অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিও আপনি সহানুভূতিশীল।

ঠাকরে : (বিচলিত) এমন পরিস্থিতির এখনই উদ্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে হলে নিশ্চয়ই নতুনভাবে চিন্তা করব।

পরিবর্তন : বিখ্যাত আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ননী পালকিওয়ালা পার্শি সম্প্রদায়েরই একজন অগ্রগণ্য মানুষ। মিঃ পালকিওয়ালা কিন্তু আপনার সংবিধান সংশোধনের দাবি ও অনুপ্রবেশরোধের জেহাদকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন, 'মিঃ ঠাকরের দাবি সংবিধানের মূল আদর্শেরই পরিপন্থী।' মন্তব্য?

ঠাকরে : হি ইজ এ স্টুজ অব এ ক্যাপিটালিস্ট। সে জন্যই উনি বাজেটকে সমর্থন করেছেন। ফিরোজ শা মেহতা আর ননী পালকিওয়ালা আকাশ-জমিন ফারাক, কখনই একাসনে বসার যোগ্য নন। ওঁর মন্তব্যে আমি কর্ণপাত করি না। হি লস্ট হিজ ইমেজ অ্যাজ অ্যান অ্যামবাসাডার ইন ইউ এস এ, হোয়েন হি বাকলড দ্য শুজ অব···।

পরিবর্তন : এবার বলুন তো, ভাষার ব্যাপারে আপনি কতটা সহনশীল?

ঠাকরে : (একজন অনুচরকে সেদিনেরই মারাঠি দৈনিক নবশক্তি আনার হুকুম দিলেন। তারপর 'ইরোজ' সিনেমা হলের ছবি দেখিয়ে বললেন) নিচে কী লেখা আছে পড়ুন।

(শিবসেনারা 'ইরোজ' হল, যেখানে সব সময়েই বিদেশি ছবি প্রদর্শিত হয়, সেখানে মারাঠি ভাষাতেও 'ইরোজ' লিখতে বাধ্য করিয়েছে)।

পরিবর্তন : এভাবে আপনার শিবসেনা সদস্যরা সর্বত্র মারাঠি ভাষার প্রচলনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাবেন?

বোম্বাই কোন অনাথাশ্রম নয়,
গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া আছে বলে
শুধু ঢুকলেই চলবে না



ঠাকরে : কেন, আপনাদের পশ্চিমবাংলায় বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা হয় না? এখানে কটা সাইনবোর্ড মারাঠিতে লেখা আছে বলুন।

সেজন্য সব জায়গায় মারাঠিতে কাজকর্ম চালাবার জন্য জোরদার দাবি তুলব, এবং দরকার হলে শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করব না। আর বোম্বাইয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখতে হবে 'মুম্বাই'।

পরিবর্তন : ভাষার ব্যাপারে আপনার মনোভাব টের পেলাম, ধর্মের ব্যাপারে আপনি কতটা সহনশীল?

ঠাকরে : হিন্দুরা সর্বত্রই সহনশীল, সেজন্য মার খাচ্ছে।

মুসলমান একরোখা, সেজন্য ওঁদের সব সময়েই সুরক্ষিত থাকে। অ্যাণ্ড ট্রিটেড অ্যাজ গেস্টস, নোন অ্যাজ মাইনরিটি।

সেজন্যই আমার শ্লোগান: 'জয় হিন্দু, জয় মহারাষ্ট্র'। আপনাকেও আজ বিদায় দেবার সময় বলব: 'জয় হিন্দু, জয় মহারাষ্ট্র'। আপনারাও চালু করুন না 'জয় হিন্দু, জয় বাংলা'।

পরিবর্তন : সাধারণভাবে প্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা বেশ মধুর, কিন্তু উর্দু প্রেসের সঙ্গে আপনার বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। এটার কারণ?

ঠাকরে : ইচ্ছাকৃতভাবে হইনি, ওঁরা বাধ্য করেছেন। আপনি যদি উর্দু পড়তে জানেন, তাহলে পড়ে দেখবেন আমার বিরুদ্ধে ওঁরা কীরকম সাম্প্রদায়িক উষ্মা প্রকাশ করেন। দে আর স্প্রেডিং ক্যানার্ডস, দে আর ওনলি রেসপনসিবল ফর গ্রোয়িং বিটারনেস বিটুইন দ্য টু কমিউনিটিজ। ওঁদের শরীরটা এখানে, অথচ মনটা পড়ে আছে পাকিস্তানে। হকি ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান জিতলে ওঁরা ডিগবাজি খান, নাচানাচি করেন, বাজিও পোড়ান। কাশ্মীরে ক্রিকেট ম্যাচে ভারত হারলে ওঁরা পাকিস্তানি পতাকা ওড়ান। শারজায় ক্রিকেট ম্যাচে ভারত জিতলে ওঁরা মুষড়ে পড়েন। আর কত বলব! উর্দু প্রেস এঁদেরই মদত দেয়। এঁদের বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ।

পরিবর্তন : শুধু উর্দু প্রেস কেন, বিদেশি প্রেসও আপনার ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করছে।

চীন ও ভারত পৃথিবীর প্রাচীনতম এই দুই সভ্যতার অবদান

আকুপ্রেশার স্যাণ্ডাল

এর পদযাত্রা পুনরায় শুরু হল ৩০০০ বছরের সুপ্রাচীন এই থেরাপির মাধ্যমে।

আপনি কি জানেন যে প্রতি পদক্ষেপে পায়ের তলার রক্ত চলাচল ও হজম প্রক্রিয়াকে মদত দিয়ে আপনাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

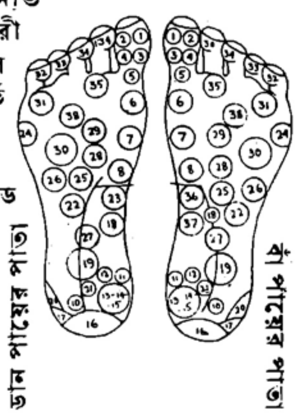
আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারই পায়ের নিচে আছে সেই ৩৮টি স্নায়ুর ডগা যারা নিয়ন্ত্রণ করছে সব জৈব অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি।

এই পদ্ধতির ভিত্তিতে (আকুপ্রেশার চিকিৎসা) তৈরী হয়েছে আকুপ্রেশার স্যাণ্ডাল। আপনি কেবল প্রতিদিন সকাল ও বিকাল খাবার আগে শুধু আট মিনিট এই চটি পরে হেঁটে নিন। তাহলেই বুঝবেন কেন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংলণ্ড, ইউরোপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে এর এত কদর।

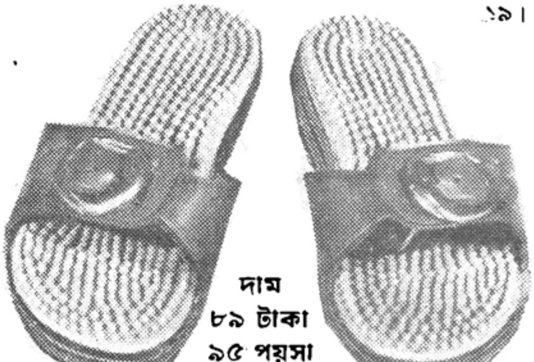
আকুপ্রেশার স্যাণ্ডাল। এতে পাবেন একই সঙ্গে আরাম, সুবিধা, নিরাপত্তা ও পয়সার সাশ্রয়।

এই পদ্ধতি ভারত ও চীনে আবার চালু হল তাই পৃথিবী জোড়া মানুষ আজ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে সুস্বাস্থ্যের দিকে।

১। মস্তিষ্ক
২। মেণ্টাল নার্ভ
৩। পিটুইটারী
৪। পিনিয়াল
৫। হেড নার্ভ
৬। গলা
৭। ঘাড়
৮। থাইরয়েড
৯। মেরুদণ্ড
১০। পাইলস
১১। প্রস্টেট
১২। জরায়ু
১৩। লিঙ্গ
১৪। ডিম্বাশয়
১৫। শুক্রাশয়
১৬। লোয়ার লাম্বার ও লিম্ফ্ যাণ্ড
১৭। নিতম্ব
১৮। মূত্রস্থলী
১৯। অন্ত্র



২০। মলাশয়
২১। অ্যাপেনডিক্স
২২। পিত্তাশয়
২৩। লিভার
২৪। কাঁধ
২৫। প্যানক্রিয়াস
২৬। কিডনী
২৭। পাকস্থলী
২৮। অ্যাড্রিনাল
২৯। পাকস্থলীর অন্ত্র
৩০। ফুসফুস
৩১। কান
৩২। শক্তি
৩৩। নার্ভ ও কান
৩৪। শীতবোধ ও নার্ভ
৩৫। চোখ
৩৬। হৃদপিণ্ড
৩৭। প্লীহা
৩৮। থাইমাস



দাম
৮৯ টাকা
৯৫ পয়সা

পায়ে পায়ে
রোগ পালায়।

আকুপ্রেশার থেরাপি হেল্‌থ সেণ্টার
৭৪ পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন ঃ ৪৩-৩৫৮৩
টেলেক্স ঃ ০২১-৪২৪৮ KRM IN

Standard/Bee Kay

এই স্থানগুলিতেও পাওয়া যায় ঃ

* ব্লুপ্রিণ্ট (নিউ মার্কেট), ৩১, বাটরাম স্ট্রিট, কলি-১৩। * দত্ত মেডিক্যাল স্টোর্স, ১৪৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫। * শ্রীমোহন স্টোর্স, ১৬, পাগেয়াপট্টী স্ট্রিট, কলি-৭। * ও. এন. মুখার্জী এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯বি, সেক্সপীয়র সরণী, কলি-৭১। * ক্যালকাটা এজেন্সীস, ১৮, রামকৃষ্ণ সমাধী রোড, কলি-৫৪। * মোদি এজেন্সী, ১৮৭, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলি-৭। * থ্রী ইন ওয়ান, এয়ারকণ্ডিশনড মার্কেট, ১, সেক্সপীয়র সরণী, কলি-১৬। * সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ট্রেডিং এণ্টারপ্রাইসেস, ৫৮, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪। * নিউ বেঙ্গল এম্পোরিয়ম, ৬৩, এস. পি মুখার্জী রোড, বসুশ্রী সিনেমার বিপরিতে, কলি-২৬। * সেণ্ট্রাল স্টোর, এয়ারকণ্ডিশনড মার্কেট, ১, সেক্সপীয়র সরণী, কলি-১৬। * চ্যাটার্জী রায়, ৩৬, ওয়েস্টন স্ট্রিট, দোতলায়, কলি-১৩, লালবাজারের নিকটে। * রিয়েল স্টোর্স, ২৩/১, কাশীপুর রোড, কলি-২। * কর্ণার ফার্মেসি, পি-৪৫/১, সি. আই. টি. রোড, কলি-১৪। ● মা শীতলা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস, ১৫০ ৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলি-১০। ● ট্যাংরা ইলেকট্রনিক্স, ৩০, বৃন্দাবন বোস স্ট্রিট, কলি-৬। ● সাহা ব্রাদার্স, (গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার) পি-৫৪, আনন্দপালিত রোড, কলি-১৪।

ঠাকরে : গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের জবাব সরাসরিই দিয়েছিলাম। আজ আবার বলছি : বৃটিশ সাংবাদিকরা আমাকে কুখ্যাত নাজিদের সঙ্গে তুলনা করছেন, হিটলারের সঙ্গে তুলনা করছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সমালোচকরা কি জানেন না, থ্যাচার আয়ারল্যাণ্ডে কী করছেন, বৃটেনে অভিবাসনকামীদের সঙ্গে থ্যাচারের পররাষ্ট্র দপ্তর কী কদর্য ব্যবহার করছেন,—নো কর্গানিজেন্স ইজ বিইং ডান উইথ।...আই উইল পুট বৃটিশার্স ইন গ্যাস চেম্বার।

হ্যাঁ, বৃটিশ সাংবাদিকদের আমি গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারব।

পরিবর্তন : সব সময়েই আপনি দাবি করেন, আপনি সোজাসুজি কথা বলেন, এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু মন্তব্য করতেও পেছপা নন। এবং এটাও ঘটনা, অনেকেই বিশ্বাস করেন, বোম্বাইতে অনেক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য আপনার আক্রমণাত্মক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য অনেকটা দায়ী।

ঠাকরে : হ্যাঁ, আমার মন্তব্যের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই।

পরিবর্তন : সেটা বুঝলাম। আপনি আজও এমন সব মন্তব্য করলেন যা খুবই উত্তেজক। আচ্ছা, আপনি যা বললেন, সে সব কি লিখে দেবার সাহস রাখেন ?

ঠাকরে : (স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ হয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, তারপর নিঃশ্বাসের দূরত্বে আঙুল এনে বললেন) আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন ?

পরিবর্তন : বাল ঠাকরে।

ঠাকরে : তিনি কে ?

পরিবর্তন : শিবসেনা-প্রমুখ।

ঠাকরে : আপনি কী করছেন ?

পরিবর্তন : সাক্ষাৎকার নিচ্ছি।

ঠাকরে : (টেপরেকর্ডার দেখিয়ে) ওটা কী হচ্ছে ?

পরিবর্তন : সাক্ষাৎকার রেকর্ডেড হচ্ছে।

ঠাকরে : (নোটবুক দেখিয়ে) ওটা কী করছেন ?

পরিবর্তন : নোট নিচ্ছি।

ঠাকরে : না, প্রেমপত্র লিখছেন ?

পরিবর্তন : স্ট্রেঞ্জ !

ঠাকরে : তাহলে আপনি আর কী চান ? প্রেমপত্রের নিচে আমার একটা সই ?

পরিবর্তন : না, আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিজ হাতে লিখে দিন...

ঠাকরে : আমার দিক থেকে হলফ করে বলতে পারি, আই অ্যাম ফার্ম ইন মাই ভিউজ, নট অ্যাডামেন্ট। অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ নো ডিনায়েল ফ্রম মি ইন লাস্ট নাইনটিন ইয়ারস।

[এবার একটু সময় চুরি করে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন]

ঠিক আছে, আমি একটু ডিকটেশান দিচ্ছি, নোট করে নিন।

যে মুসলমানরা ক্রিকেট বা হকি ম্যাচে ভারত পরাজিত হলে বা পাকিস্তান জয়ী হলে আনন্দোৎসব করেন, পটকা ফাটান, পতাকা উত্তোলন করেন, তাঁদের ভারতে থাকার কোন অধিকার নেই এবং তাঁদের কাউকেই আমি বরদাস্ত করব না। তাঁদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। এটা আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং এর সঙ্গে কোন সমঝোতা চলবে না।

পরিবর্তন : ধন্যবাদ, মিঃ ঠাকরে। এবার আমার শেষ প্রশ্ন। গুজরাতে জাতপাত নিয়ে সংঘর্ষ চলছে। সবার আশঙ্কা, এরকম কোন সংঘর্ষ বোম্বাইতে হলে তা বিপজ্জনক আকার ধারণা করবে। এক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কীরকম ?

ঠাকরে : না, মহারাষ্ট্রে এরকম কোন আন্দোলন করব না। গুজরাতে যা চলছে, তা খুবই নিন্দনীয়। কাকে ওঁরা হত্যা করছেন ? আমার মতে, পৃথিবীতে দুটো জাত—ধনী ও দরিদ্র। একজন ব্রাহ্মণও তো দরিদ্র হতে পারেন।

উলটোপক্ষে, ও'দের, মানে তপশিলি জাতি বা হরিজন, যাই বলুন না কেন, তাঁদের চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া উচিত, আমরা কারও দয়ার মুখাপেক্ষী নই, আমরাও মানুষ, আমরাও শতকরা নব্বই নম্বর পেতে পারি। সেটাই হবে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

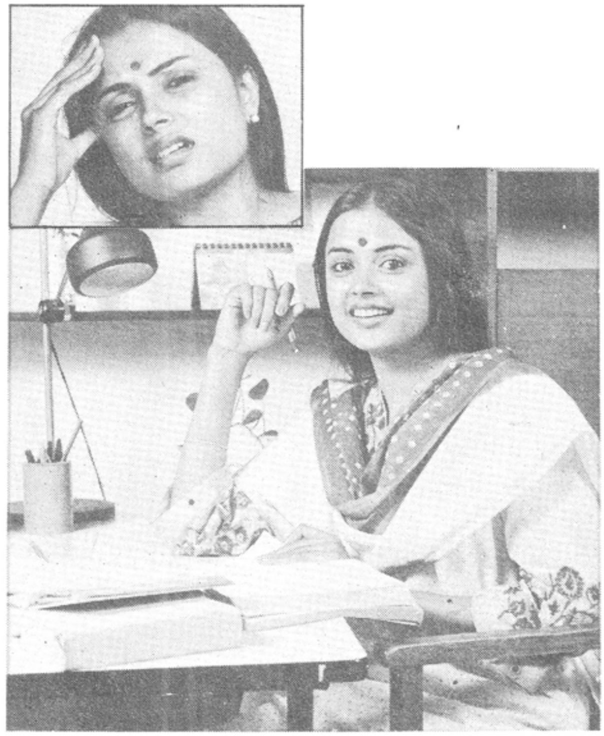
পরিবর্তন : ধন্যবাদ, মিঃ ঠাকরে। শুভরাত্রি।

ঠাকরে : জয় হিন্দু, জয় মহারাষ্ট্র। ☐

সাক্ষাৎকার :
রীণা মৃণাল
৮ জুন ১৯৮৫

ফটো : পলাশরঞ্জন ভৌমিক

মাথাধরা অনেক



চিকিৎসা একটিই!

অ্যানাসিন

এতে বেদনা-নিবারণের অনেক বেশী শক্তি আছে

চটপট্ আরাম পেতে, অ্যানাসিন-এ বেদনা-নিবারণের ওষুধ খুব বেশী থাকে —সারা বিশ্বের ডাক্তাররা এটি সবচেয়ে বেশী সুপারিশ করেন।

মাথা ব্যথা, সর্দি, ফ্লু, পিঠ ব্যথা, পেশীর ব্যথা ও দাঁতের ব্যথার জন্যে বেশী কার্যকরী।

শুধু অ্যানাসিন-এর ওপরই নির্ভর করুন।

এবার সুরক্ষিত ফইল প্যাকিং-এ।

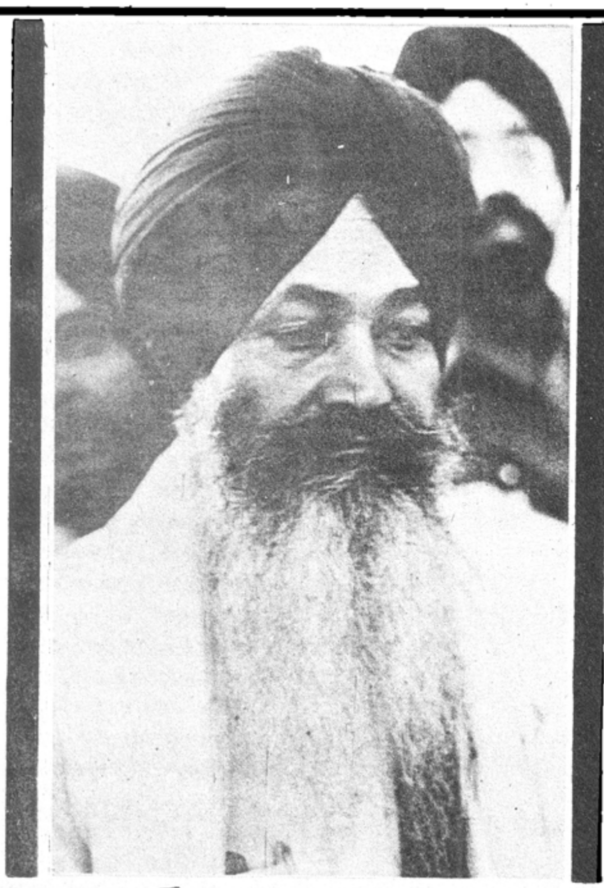


ভারতের ১ নম্বর ব্যথা-বেদনা নিবারণকারী ওষুধ

* Licensed user of T.M. : Geoffrey Manners & Co.Ltd.   GM-2-84 BEN


হীরামনের হাহাকার
কাহিনী ঃ অদ্রীশ বর্ধন
ছবি ঃ পোলারিস
১২৭
সিংহনাদ করলেন ভীম দত্ত।
কী?
গেঁড়ির চোখের মত উপেনের চোখটা বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে এল।
দুশমন! দুশমন!
গোলাম হোসেন – আশমান!
দিল্লগি ছোড়ো! কেয়া হুয়া?
গোলাম হোসেন – খতম!
লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডরে পৌঁছলেন ভীম দত্ত।
দেখলেন, দাঁড় শূন্য!
পাথরের মেঝের ওপর পড়ে ধূসর হীরামনের প্রাণহীন কলেবর।
মরুবাংলোর রহস্যঘূর্ণিকে আরও কুটিল, জটিল, সর্পিল করে দিয়ে বিদায় নিল জাহাজি কাকাতুয়া। স্তব্ধ হল হীরামনের হাহাকার।
কিন্তু সরল হল কি রহস্যচক্রের কুটিল পন্থা?

(চলবে)



লঙ্গোয়াল হত্যা এবং তারপর

লঙ্গোয়াল হত্যার পরই অকালি রাজনীতিতে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের রাজনীতি কোন পথে গিয়ে দাঁড়াবে? নরমপন্থী এবং উগ্রপন্থীদের নয়া আন্দোলন কি পাঞ্জাবে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটাবে?

নয়া দিল্লি থেকে এই প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন পরিবর্তন-এর নয়া দিল্লি প্রতিনিধি সুজিত রায়।

অবশেষে সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়ালকেও শিকার হতে হল উগ্রপন্থী রাজনীতির। গত ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং অকালি নেতা লঙ্গোয়ালের মধ্যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর সারা ভারত জুড়ে যখন স্বস্তির হাওয়া বইছে, ঠিক সেই সময়ে গত ২০ আগস্ট শিখ উগ্রপন্থীদের হাতে লঙ্গোয়ালের হত্যা নিঃসন্দেহে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। লঙ্গোয়াল হত্যার পর সেই রাজনীতি এখন সত্যিই কোন খাতে বইবে, এখনই সেটা বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক, আগস্টের ২৪ তারিখে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এটা বেশ পরিষ্কার যে, পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানে দীর্ঘদিনের সরকারি প্রচেষ্টা আবার বিফল হতে চলেছে। অকালি দলের মধ্যে নতুন করে দেখা দিয়েছে মতানৈক্য। অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদের শিকার হতে চলেছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেই সঙ্গে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন হরিয়ানা, চণ্ডিগড়, দিল্লি ও উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির সাধারণ নাগরিকরা। উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকারগুলিও। হয়ত অচিরেই দেখা যাবে সরকার বনাম শিখ উগ্রপন্থার লড়াই রূপ নিয়েছে শিখ রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধের, যার পরিণাম শুধু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক মাটিতেই নয়, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে সমগ্র শিখ জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নেও।

পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। ১৯৭৩ সালে যে ঘটনার সূত্রপাত, তার মারাত্মক পরিস্থিতি ঘটেছে ১৯৮৪ সালে স্বর্ণমন্দিরে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু সেখানেই এ নাটকের যবনিকাপাত হয়নি। শিখ উগ্রপন্থীদের হাতে ৩১ অক্টোবর প্রাণ দিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী, মাঝে ছোটবড় নানা ঘটনার স্রোত বয়ে গিয়েছে। আবার আঘাত হেনেছে উগ্রপন্থীরা। ৩১ জুলাই নিহত হয়েছেন সস্ত্রীক লোকসভার কংগ্রেস (ই) সদস্য বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ললিত মাকেন। তারপর আবার। এবারের চূড়ান্ত আক্রমণের শিকার হলেন অকালি নেতা লঙ্গোয়াল স্বয়ং।

লঙ্গোয়ালের মৃত্যু বড় আচম্বিত, বড় অভাবিত। যদিও শিখ সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ তালিকায় লঙ্গোয়ালের নাম ছিল অনেকের উপরে, এমন একটা খবর ভেসে বেড়াচ্ছিল অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু বিষণ্ণতম ঘটনাটি যে এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসবে তা ভাবা যায়নি। হয়তো লঙ্গোয়াল নিজেও ভাবতে পারেননি। তাই অকালি দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার জন্য তাড়াহুড়ো করেননি। এগোচ্ছিলেন ধীরগতিতে। শান্ত, ধীর ও স্থির মস্তিষ্কের 'নিতান্ত ভদ্রলোক' লঙ্গোয়াল চেয়েছিলেন, যেমন করে ধীরে ধীরে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন কিছু অধিকার, ঠিক তেমনই ধীরে ধীরে মিটিয়ে নেবেন নিজের দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। অকালি দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে তুলবেন সমঝোতা ও মৈত্রীর বন্ধন। সেই সঙ্গে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠন করে পাঞ্জাবের এতদিনকার রক্তে ভেজা মাটিতে গড়ে তুলবেন নতুন দিনের ইমারত।

কিন্তু না, লঙ্গোয়ালকে সে সুযোগ দেয়নি উগ্রপন্থীরা। 'কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত, প্রতারক ও শিখ সত্তার নিলামদার'-এর শিরোপা পরিয়ে তারা লঙ্গোয়ালের শান্তির সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে।

এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই পাঞ্জাবের রাজনীতিতে শুরু হয়ে গেছে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। অকালি দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ তো অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। এখন সে মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছে লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলের নেতাদের মধ্যেই। দলের সভাপতি হিসেবে লঙ্গোয়াল যাঁদের এতদিন সামলে রেখেছিলেন, এখন তাঁরা নিজেরাই রণং দেহি মূর্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রাজনীতির আসরে। আর সে আসরের মুখ্য চার নায়ক একদিকে সুরজিৎ সিং বার্নালা এবং বলবন্ত সিং, অন্যদিকে প্রকাশ সিং বাদল এবং গুরচরণ সিং তোহরা।

লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলের এই অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফল যে মারাত্মক হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সক্রিয় বিরোধী পক্ষ বাবা যোগীন্দার সিং-এর সংযুক্ত অকালি দল এই সুযোগের ফয়দা লোটার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। তারা শিখ জনগণকে বোঝানর সুযোগ পাচ্ছে যে, দেখ, বিচার কর, লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দল সত্যিই রাজ্যের ভাল চায় না, শুধুই পদের মোহ তাদের আবিষ্ট করে রেখেছে।

অকালি দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব

পাঞ্জাবের দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত ইতিহাস সৃষ্টির মূলে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান কিছু কম নয়, তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে দায়ী পাঞ্জাবের মূল রাজনৈতিক সংগঠন অকালি দলও। অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালেই দেখা যাবে অকালি দল চিরকাল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে পাঞ্জাবের রাজনীতির জল ঘোলা করেছে। ফলে পিছিয়ে পড়েছে রাজ্যের উন্নয়ন। অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

অকালি রাজনীতিতে ভিন্দ্রান-

ওয়ালে আসার পর থেকেই শিখ আন্দোলন এক নতুন খাতে বইতে শুরু করে। অকালি রাজনীতি স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় সে সময়। একদল নামাঙ্কিত হয় উগ্রপন্থী হিসাবে। অন্যদল পরিচিতি লাভ করে নরমপন্থী হিসাবে।

উগ্রপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠা ফাটল কালক্রমে আরও বৃহৎ রূপ নেয়। যদিও ভিন্দ্রানওয়ালে কর্তৃক সৃষ্ট নবগঠিত মোর্চা নরমপন্থী বলে অভিহিত সন্ত লঙ্গোয়ালের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে অকালি মোর্চায় পরিণত হতে দেরি হয়নি।

কিন্তু রাজনৈতিক বিভেদ মুছে যায়নি তাতে। অকালি রাজনীতির দুই মুখ্য নেতা সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে যখন খলিস্তান আন্দোলনের দাবিতে সোচ্চার, সন্ত লঙ্গোয়াল কিন্তু পরোক্ষে তখন চেয়েছেন পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুজ্জীবন। লঙ্গোয়ালকে তখন প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন একদা অবিভক্ত দলের সভাপতি জগদেব সিং তালওয়ান্দি, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, সুরজিৎ সিং বার্নালা, বলবন্ত সিং এবং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি গুরচরণ সিং তোহরা। অন্যদিকে ভিন্দ্রানওয়ালে তখন হাজার হাজার শিখ জঙ্গীবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট।

অবশ্য একথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে ভিন্দ্রানওয়ালে এবং লঙ্গোয়ালের মধ্যে এই বিরোধ গড়ে তোলার পরোক্ষ দায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের।

পাঞ্জাবে যখন লঙ্গোয়াল এবং ভিন্দ্রানওয়ালের বিরোধ চরমে, সেই সময়েই এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক হয়ে ওঠেন লণ্ডনে বসবাসকারী ডাঃ জগজিৎ সিং চৌহান। তিনি বিদেশের মাটিতেই 'স্বাধীন খলিস্তান সরকার' গঠন করে তার স্বঘোষিত প্রধান হয়ে যান।

১৯৮৪ সালের জুন মাসে সরকারের মদতপুষ্ট ভিন্দ্রানওয়ালে বাহিনী যখন ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠল, সেই সময়েই জুন মাসে স্বর্ণমন্দিরে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মৃত্যু হল ভিন্দ্রানওয়ালের। জেলবন্দী হলেন লঙ্গোয়ালসহ অন্যান্য শিখ নেতারাও। এবং এই সুযোগে অকালি দলের ক্ষমতা দখল করে বসলেন ভিন্দ্রানওয়ালের ৯২ বছর বয়স্ক পিতা বাবা যোগীন্দার সিং।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে লঙ্গোয়াল ও অন্যান্য নেতারা ছাড়া পাবার পর অকালি রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার চরমে ওঠে বাবা যোগীন্দার সিং গড়ে তোলেন সংযুক্ত অকালি দল। তিনি দাবি করেছিলেন, শিখপন্থের ঐক্যের সমর্থনে লঙ্গোয়ালই তাঁকে দলের দায়িত্ব দিয়েছেন। লঙ্গোয়াল একথা অস্বীকার করেন। বিবাদ শুরু হয়। অকালি দল আবার দু টুকরো হয়ে যায়।

অকালি দলের এই বিভেদ অবশ্য লঙ্গোয়াল ও ভিন্দ্রানওয়ালের রাজনৈতিক মতানৈক্যেরই অন্যতম পরিণতি। কারণ এবারের ভাঙনের পরও দেখা যায়, বাবা যোগীন্দার সিং-এর সমর্থনে কাজ করে চলেছে শিখ জঙ্গী যুবসভা, ভিন্দ্রানওয়ালের সমর্থকবাহিনী অল ইণ্ডিয়া শিখ স্টুডেন্টস ফেডারেশন। লঙ্গোয়াল জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ঘোষণা করেন, তাঁর আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে শান্তিপূর্ণ পথে। কিন্তু অন্যদিকে যোগীন্দার সিং মুখে শান্তির কথা বললেও হিংসার রাজনীতিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেননি বা তার বিরোধিতায় এগিয়ে আসেননি।

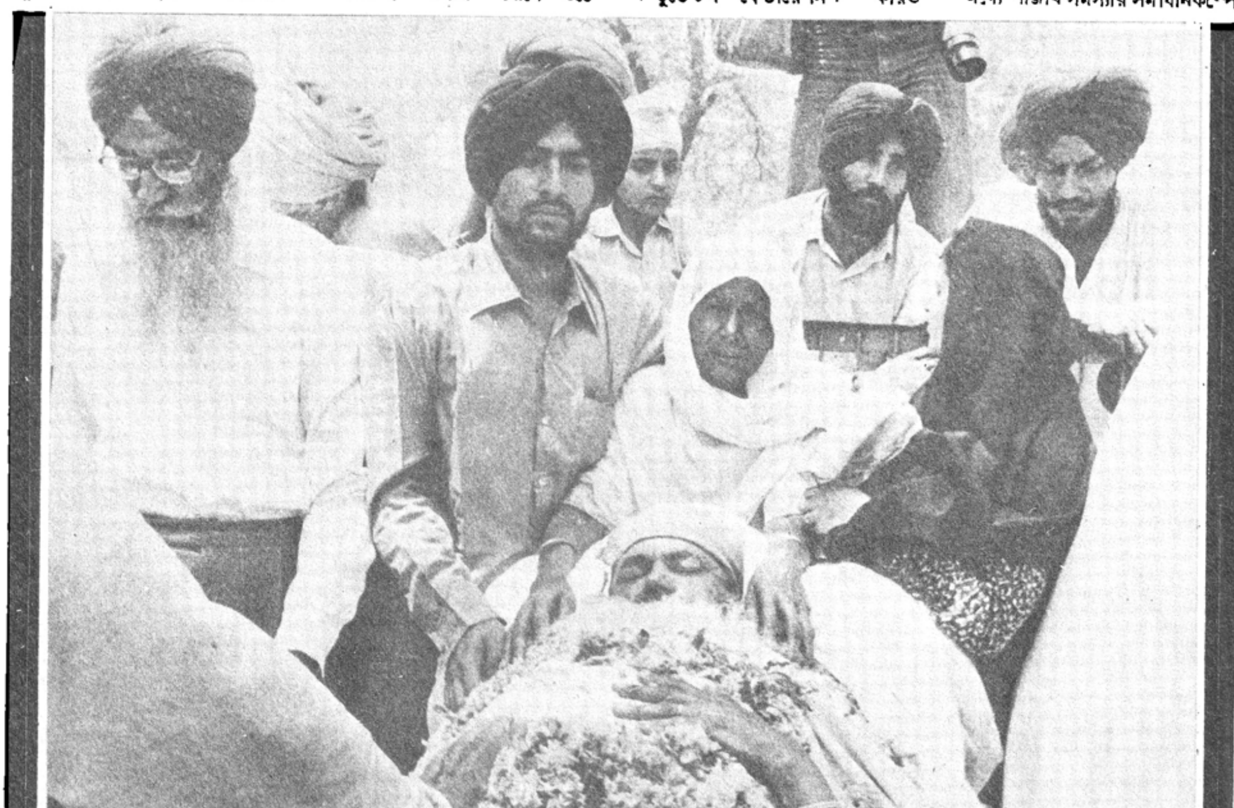
গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই প্রতিবেদক যখন পাঞ্জাব সফরে গিয়েছিলেন, তখন স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল বাবা যোগীন্দার সিং-এর মূল শক্তি অল ইণ্ডিয়া শিখ স্টুডেন্টস ফেডারেশন। কারও কারও মতে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের রাজনীতি সৃষ্টির মূলে তাদের হাত অনেকখানি। যদিও জনসমর্থন তাদের দিকে ছিল না এবং পাঞ্জাবের জনজীবনও ক্রমশ শান্তির পথেই পা বাড়াচ্ছিল ধীরে ধীরে।

গত ৯ জুন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলের এক সম্মেলনে যোগীন্দার সিং বাহিনী আক্রমণ হানতেও দ্বিধা করেনি। তারা প্রকাশ্যে লঙ্গোয়াল, তোহরা, বাদল প্রমুখ অকালি নেতাকে 'শহীদদের হত্যাকারী' হিসেবে শ্লোগানও দেয়।

তারপর অকালি দলের এই দুটি বিভাগের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বেড়েই গেছে। মতানৈক্য ঘটেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। নরমপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বারে বারে। যোগীন্দার সিং-এর সমর্থনে আর এক অকালি নেতা তালওয়ান্দির কাজকর্মও অকালির দলের বিরোধকে তুঙ্গে তুলেছে।

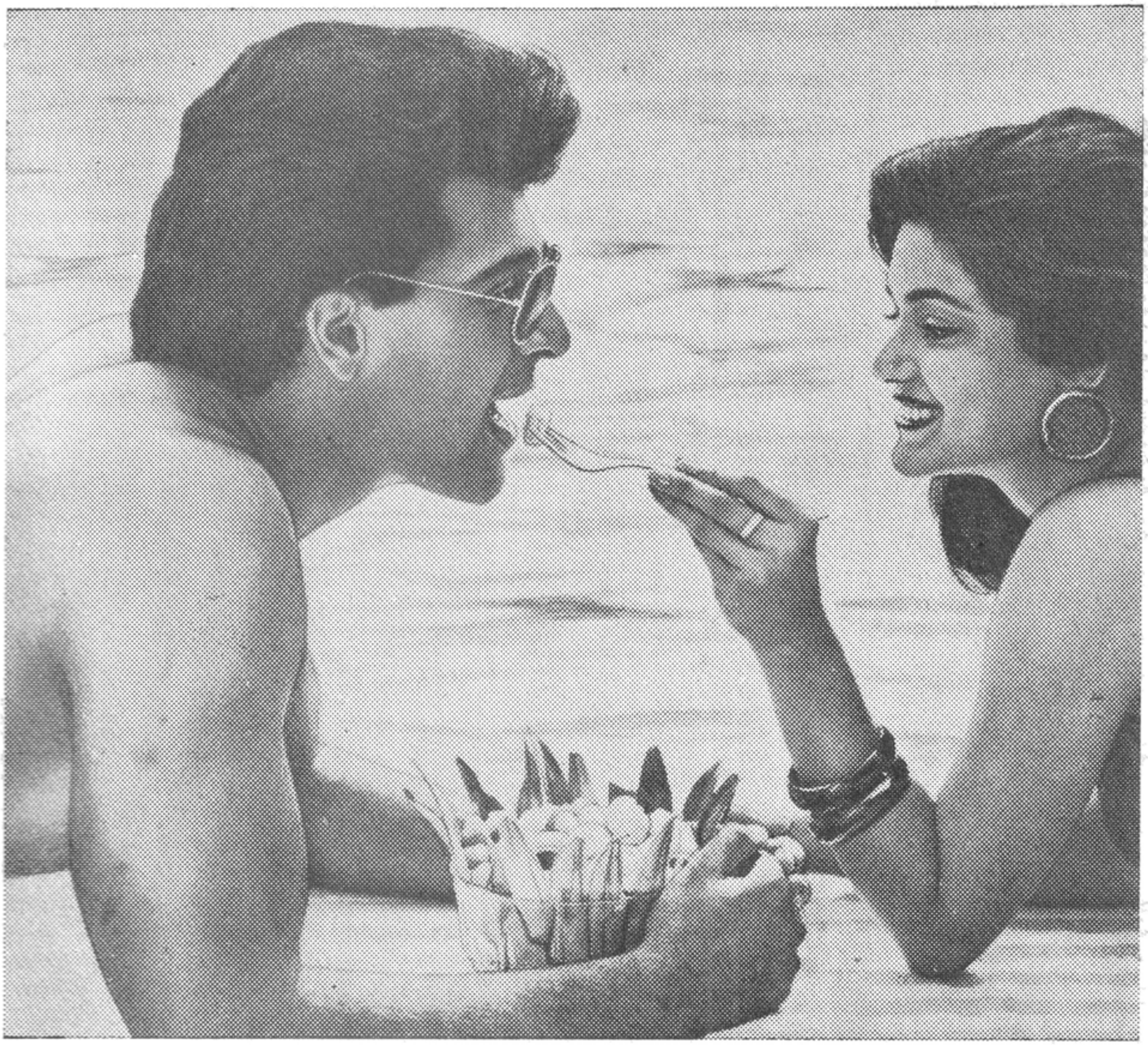
পাঞ্জাব চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর

অকালি রাজনীতিতে আবার এক ফাটল ধরল গত ২৪ জুলাই লঙ্গোয়াল এবং রাজীব গান্ধীর মধ্যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানকল্পে



লঙ্গোয়ালের মৃতদেহ ঘিরে আত্মীয়-পরিজন

একবারই তো বাঁচবেন...কেতায় বাঁচুন



আপনার স্টাইল কে বাড়িয়ে তোলার জন্যই ব্রিলক্রীমের সৃষ্টি। তেলবিহীন এই হেয়ার ড্রেসিং সারাদিনের মত আপনার চুলের শোভা বজায় রাখে।



ব্রিলক্রীম হেয়ার ড্রেসিং —আপনার কেতার সরঞ্জাম।

OBM/9856/Ben

চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর। এবারের বিবাদ লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলের নিজেদের মধ্যেই।

জুলাই মাসের ১৭ তারিখে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল অর্জুন সিং মারফৎ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী লিখিতভাবে লঙ্গোয়ালকে আমন্ত্রণ জানান আলোচনাব জন্য। লঙ্গোয়াল তখন দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ পাঞ্জাব চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ব্যাপারে অন্যান্য অকালি নেতাদের সমর্থন তিনি তখনও পাননি। তবে তিনি বুঝেছিলেন, এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা একান্ত প্রয়োজন। তা নাহলে পাঞ্জাব সমস্যা চিরকাল একটা ক্ষত হয়ে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে বিরাজ করবে।

অবশ্য লঙ্গোয়ালের এ ধরনের মানসিক পরিবর্তন ছিল কিছুটা অভাবিত। মার্চ মাসে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর লঙ্গোয়ালের বক্তব্য ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। এমনকী গত জুন মাসেও অমৃতসরে লঙ্গোয়াল বলেছিলেন, প্রত্যেক শিখের অন্তরে এখন ক্রোধের লাভা জমে রয়েছে। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমরা এই দেশের নাগরিক তো? মাথা উঁচু করে থাকতে পারব তো?

কিন্তু গত জুলাই মাস থেকেই লঙ্গোয়ালের নরমপন্থী মনোভাব আরও নরম হতে থাকে। এর পিছনে ছিল মূলত তিনটি কারণ। প্রথমত, তিনি চাইছিলেন পাঞ্জাবে স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক। দ্বিতীয়ত, শিখ সন্ত্রাসবাদের ফলে সারা ভারতের শিখ জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার সংকট দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, নবগঠিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পাঞ্জাব গ্রুপের কিছু সদস্যের একান্ত অনুরোধ যে, তিনি যেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। পাঞ্জাব গ্রুপের এই সদস্যরা ছিলেন বিশিষ্ট শিখ বুদ্ধিজীবী ইন্দ্রকুমার গুজরাল, প্রাক্তন লে জে জগজিৎ সিং অরোরা, প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অর্জন সিং, প্রাণ চোপরা, কুলদীপ নায়ার এবং গুরবচন সিং। এঁরা গত এপ্রিল মাস থেকে এ বিষয়েই লঙ্গোয়ালকে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন।

লঙ্গোয়াল চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরই ক্রুদ্ধ হলেন অকালি নেতা প্রকাশ সিং বাদল এবং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি গুরচরণ সিং তোহরা। তাঁরা স্পষ্টতই লঙ্গোয়ালের বিপক্ষে মতামত রাখলেন। বললেন, লঙ্গোয়াল এবং তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহচররা এই চুক্তিকে শিখ আন্দোলনের পক্ষে যতই জয় বলে মনে করুক না কেন, পরোক্ষে কেন্দ্রের ফাঁদে পা দিয়ে লঙ্গোয়াল শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই গেছেন।

লঙ্গোয়ালের বিশ্বস্ত অনুগামী বলতে তাঁরা মূলত সুরজিৎ সিং বার্নালা এবং বলবন্ত সিংকেই বুঝিয়েছিলেন। কারণ চুক্তি স্বাক্ষরে লঙ্গোয়ালকে রাজী করানর পিছনে এই দুই নেতার অবদান কম ছিল না। এবং দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও তাঁরা দুজনই লঙ্গোয়ালের সঙ্গে এসেছিলেন।

প্রকাশ সিং বাদল তো পরিষ্কার জানালেন, বার্নালা, বলবন্ত এবং লঙ্গোয়াল—এই তিনজনে মিলে আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবকে সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া আরও বৃহৎ আকারে ধরা পড়ল কেশগড় সাহিব তখতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক অকালি অনুষ্ঠানেও। বাদল বললেন, 'চুক্তি সম্বন্ধে আমার একটা কথাই বলার আছে যে, আমি মোটেই খুশি নই।'

আসলে বাদল ও তোহরার এই বিরোধী মনোভাবের পিছনে কাজ করেছে লঙ্গোয়ালের একটা অদূরদর্শী রাজনৈতিক মনোভাব। চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে লঙ্গোয়াল তোহরা এবং বাদলের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেননি। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বলবন্তসিং-এর বাড়িতে এবং শিরোমণি গুরুদ্বার সেক্টর ৫-এ অনুষ্ঠিত সভায়ও তোহরা এবং বাদল চুক্তি মেনে নেওয়ার বিপক্ষেই মতবাদ রেখেছিলেন।

লঙ্গোয়ালপন্থী অকালি দলের মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে উঠেছে তখনই গত ৮ আগস্ট যোগীন্দার সিং গোষ্ঠীর একটি সভায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন তালওয়ান্দি, জগজিৎ সিং রোডে, উজাগর সিং শেখওয়ান প্রমুখ অকালি নেতৃবৃন্দ। দলের সেক্রেটারি সুরত সিং খালসা তো সরাসরি বলে বসলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে লঙ্গোয়াল আসলে পাঞ্জাবের ক্ষমতা হাতে পেতে চাইছেন।

লঙ্গোয়াল কিন্তু থেমে যাননি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করেছেন।

সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল: মৃত্যুহীন প্রাণ



১৯৩২ সালের ২ জানুয়ারি সাংরুরের এক ধর্মপ্রাণ নিম্নবিত্ত পরিবারে হরচাঁদ সিং-এর জন্ম। গাদ্রিয়ানি গ্রামে তাঁর পরিবার চাষবাসের কাজে যুক্ত ছিলেন। চার ভাই এবং চার বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। শিশুকালেই তিনি সন্ত লঙ্গোয়াল (সন্ত ভগবান সিং)-এর কাছে ধর্মশিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। সেখানে ধর্ম বিষয়ে নানা পাঠ নেবার পর ভাই মণি সিং গুরুদ্বারের দায়িত্ব পান। এমনিতে কোনদিনই প্রত্যক্ষ রাজনীতির দিকে তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না। কিন্তু তাঁর অঞ্চলের অকালি প্রার্থীদের তিনি সব সময়ই সমর্থন করতেন। তবে হিন্দু-শিখ ঐক্যের জন্য তিনি আগাগোড়া সংগ্রাম করে গেছেন। এমনকী তাঁর প্রতি অনেক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এ নীতি থেকে কখনও সরে যাননি।

জীবনে একবারই মাত্র নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন পেপসুর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বৃষ ভান। লেহরাগগা কেন্দ্রের এই নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বিধানসভায় নির্বাচিতও হয়েছিলেন।

১৯৮০ সালে যখন অকালি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন প্রকাশ সিং বাদলের পক্ষে দাঁড়ান সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল। অতঃপর দল ভেঙে যায়। জগদেব সিং তলোয়ান্দি দলের সভাপতি নির্বাচিত হবার পরই এই ভাঙন ত্বরান্বিত হয়। একটি গোষ্ঠীর নাম হয় অকালি দল (তলোয়ান্দি) এবং অন্য গোষ্ঠীর সভাপতি হন স্বয়ং লঙ্গোয়াল। তাঁর দলের নাম হয় অকালি দল (লঙ্গোয়াল)। অবশ্য রাজ্যে তাঁর গোষ্ঠীর প্রভাবই আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকে।

এরপর থেকে সন্ত লঙ্গোয়াল ক্রমশ পাঞ্জাবে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হন। তিনি কিন্তু রাজনীতিতে কোনদিনই কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নামেননি। বরং ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর যখন পাঞ্জাবে জনতা-অকালি সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং প্রকাশ সিং বাদল মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করেন তখন তাঁর পদত্যাগে ফরিদকোট লোকসভা আসনটি শূন্য হলে নানা প্রস্তাব সত্ত্বেও সে আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি হননি তিনি।

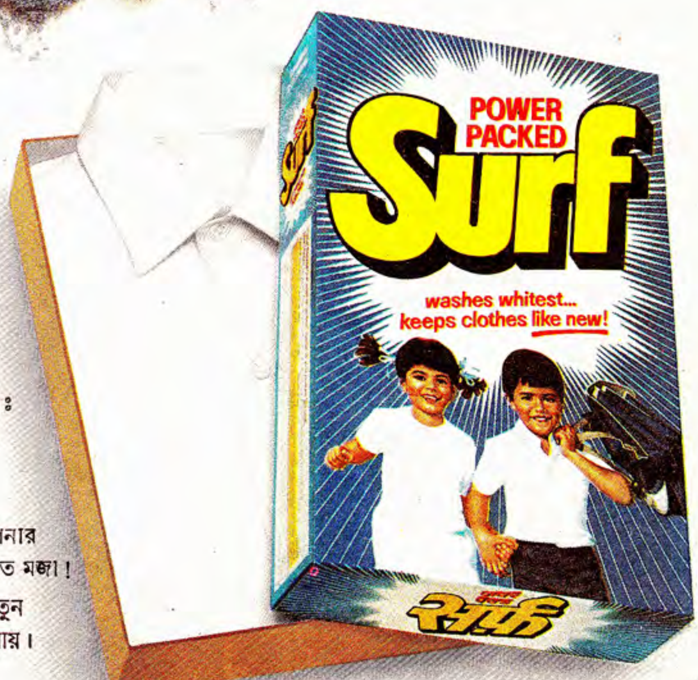
পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় সন্ত লঙ্গোয়াল গ্রেপ্তার হন এবং এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজস্থানের যোধপুরে বন্দীদশা ভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বন্দী অকালি নেতাদের মুক্তি দিলে তিনিও পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আবার ফিরে আসেন এবং বস্তুত তাঁরই সাহসিকতার জন্য কেন্দ্র সরকার ও অকালি দলের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়। গত ২৪ জুলাই-এ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে নিরভিমানী, চিরকুমার এই ধর্ম-নেতার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায় সারা ভারতেই।

বস্তুত এই চুক্তি সম্পাদন করার সাহসিকতাই তাঁর নৃশংস মৃত্যুর কারণ। উগ্রপন্থীরা বুঝেছিল রাজীব গান্ধী এবং লঙ্গোয়াল, দুজনে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন সেই চুক্তিই তাঁদের মৃত্যুবাণ হিসাবে হাজির হয়েছে। ফলে উগ্রপন্থীরা তাঁকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ২০ আগস্ট উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত হবার মধ্য দিয়েই তিনি প্রমাণ করে গেছেন, সততা ও ঐক্যবোধের মৃত্যু নেই। বরং উগ্রপন্থা, অনৈক্য এবং স্বার্থপরতারই মৃত্যু হয় বারবার। উগ্রপন্থীরা মরীয়া হয়ে চিরসত্যকে উল্টে দিতে চেয়েছে মাত্র। □

যী. চৌ.

NEW!

POWER PACKED SURF



নতুন পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ।

আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ফর্মূলেশনে তৈরী, ফলে এর কণায় কণায় ঠাসা থাকে শক্তির ভাণ্ডার ঃ কাপড়ের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে সাফ করতে পারে! আপনার সমস্ত সাদা কাপড়কে রাখে সবচেয়ে সাদা, আর রঙীন কাপড়কে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

অথচ কাপড় থাকে পুরোপুরি সুরক্ষিত, নতুনের মত ঃ প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তকতকে তাজা, ঝকঝকে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা...নতুনের মত!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই!

নতুন অনুপম সুগন্ধ ঃ যা জড়িয়ে থাকবে আপনার জামাকাপড়ে ঃ কত পরিষ্কার, কত তাজা, কাছে থেকেও কত মজা!

আকর্ষণীয় নতুন প্যাক ঃ যা ভেতরের এই নতুন পাওয়ার প্যাক্‌ড ফর্মূলেশনের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়।

আসুন! আজই নিন নতুন পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ!

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

LINTAS-SU-324-2719 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

স্থির করেছিলেন, তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনসাধারণকে চুক্তির মূল বিষয় জানাবেন। বোঝাবেন যে, এই চুক্তি শিখ জনগণের মঙ্গলের জন্যই স্বাক্ষর করা হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর করার পর অমৃতসরে ফিরে যাবার দিন যোগীন্দার সিং গোষ্ঠীর আক্রমণেও তিনি পিছিয়ে যাননি। বলেছেন, আমি গুরু গ্রন্থসাহেবের নির্দেশ মত কাজ করেছি এবং যা করেছি তা জনগণের মঙ্গলের জন্যই, পাঞ্জাবের শান্তির জন্যই।

অকালি দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিন্তু বেশিদিন চলেনি। মৃত্যুর মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে গত ২০ আগস্ট অপরাহ্ণে তিনি তোহরা এবং বাদলের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সত্যিই কী কথা হয়েছিল, তা অবশ্য অজানা। হয়তো আর কোনদিন জানাও যাবে না। তবে এটা নিশ্চিত, লঙ্গোয়াল তাঁর ধীর ও স্থির মস্তিষ্কের সাহায্যে কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন বিপক্ষবাদীদেরও। তার আগেই স্থির হয়েছিল, পাঞ্জাবের ভোটে অকালি দলের পক্ষে সর্বসম্মত নেতা হবেন লঙ্গোয়ালই।

লঙ্গোয়ালের হত্যা এবং অকালি রাজনীতি

লঙ্গোয়াল শহিদের মৃত্যুবরণ করলেন। দলের মধ্যে যথারীতি কোন্দলও শুরু হয়েছে। এ সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রশ্ন কিন্তু জনগণের মনে এখনও ঝড় তুলছে, লঙ্গোয়াল কাদের শিকার হলেন? নিতান্তই উগ্রপন্থীদের হাতে, না, দলীয় কোন্দলেরই ফল তাঁর মৃত্যু?

এ প্রশ্নের সমাধান এখনই করা সম্ভব নয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে। আততায়ীরা যারা ধরা পড়েছে তারা সকলেই উগ্রপন্থার সমর্থক। ধরা পড়েনি এমন এক আসামী জার্নাল সিং তো ভিন্দ্রানওয়ালের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল এ অনুমানই হয়তো সঠিক। কিন্তু তার পরেও একটা দ্বিধা থেকেই যায়। কারণ রাজনীতির স্রোত বড় ভয়ঙ্কর।

লঙ্গোয়ালকে যারাই মেরে থাকুক না কেন, একটা কথা পরিষ্কার, অকালি রাজনীতির কূট কলাকৌশলেরই শিকার হয়েছেন সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল।

কোন কোন মহল থেকে এমন সন্দেহও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, লঙ্গোয়াল কেন্দ্র ও অকালি রাজনীতিরই শিকার। এ অনুমান করার কারণ হিসেবে জানান হচ্ছে যে, লঙ্গোয়াল হত্যার দিন তাঁর নিরাপত্তার জন্য দশজন কনস্টেবল, দু'জন হেড কনস্টেবল, একজন এস পি ও একজন এস আই-এর পাত্তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ঠিক ঐ দিনটিতেই লঙ্গোয়ালের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান গুরবচন সিং মানকে সারিয়ে দিয়ে আনা হয়েছিল এক অনভিজ্ঞ অফিসারকে।

ইতিমধ্যে অনেক আশা-নিরাশার পথ পার হয়ে পাঞ্জাবে ভোটের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দৃঢ় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, অকালি দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পাঞ্জাব নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে তো?

লঙ্গোয়াল হত্যার পরদিনই অমৃতসর থেকে পালিয়ে এসেছেন এমন কিছু শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ জানিয়েছেন, অকালি দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহবিবাদের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পোস্টারও পড়ে গেছে তোহরা, বার্নালা, বাদল প্রমুখের প্রাণ নেওয়া হবে বলে। এমতাবস্থায় নির্বাচন কতটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করা সম্ভব, সে উত্তর দেবে ভবিষ্যৎই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন হল, অকালি দলের মধ্যে এত বিরোধ কেন? কেনই বা নিত্যনতুন গোষ্ঠী গড়ে উঠছে ক্রমাগত? এর পিছনের কারণ একটাই, তা হল ক্ষমতার লড়াই। অকালি আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে নিঃসন্দেহে পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবের জনগণের স্বপক্ষেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কালক্রমে ক্ষমতার লোভ পেয়ে বসে অকালি নেতাদের। ভিন্দ্রানওয়ালে চেয়েছিলেন, ধর্মযুদ্ধের নামে বন্দুকের নল দিয়েই আদায় করে নেবেন খালিস্তান এবং তার একনায়ক হয়ে বসবেন তিনি। সুরজিৎ সিং বার্নালা বা প্রকাশ সিং বাদল অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। দীর্ঘদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশ শাসন করেছেন। তাঁরা তাই লঙ্গোয়ালকে ব্যবহার করেছেন তুরুপের তাস হিসেবে। যোগীন্দার সিং গোষ্ঠীও খুব ভাল করেই জানেন, তাঁদের স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে। তবু তাঁরা আজও উগ্রপন্থার সমর্থক, কারণ তাঁরাও চাইছেন, আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবকে পুরোপুরি কার্যকর করার দাবি জানিয়ে জনগণের সহানুভূতি অর্জন করে রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে। তালওয়ান্দি গোষ্ঠীও কোন হালে পানি না পেয়ে আঁকড়ে ধরেছেন যোগীন্দার সিং গোষ্ঠীকেই। তাঁরও উদ্দেশ্য একই—ক্ষমতা দখল করা।

সার্বিকভাবে অকালি রাজনীতিতে আজ অস্থিরতার চূড়ান্ত। নেতাদের স্বার্থবোধ লক্ষ লক্ষ শিখ জনগণের জীবনকে ঠেলে দিচ্ছে ভয়াবহতার মুখে।

হিন্দু নেতারা এখন কী করবেন?

পাঞ্জাব চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকেই পাঞ্জাবে বসবাসকারী হিন্দুরা একটা দারুণ ভীতির মুখোমুখি। কারণ, যদিও আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকার এখন মেনে নেয়নি, কিন্তু অকালিদের যে কটি দাবি সরকার মেনে নিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের ওপর হতে বাধ্য। লঙ্গোয়াল হত্যার পর পাঞ্জাব ঘুরে এসে কিছু সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, যদিও এখনই হিন্দু-শিখ দাঙ্গা হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তবে পরোক্ষভাবে অনেক হিন্দুই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, পাঞ্জাবে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের পক্ষে অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হবে। হয়ত আসামের মতই শিখরাও 'হিন্দু খেদাও' আন্দোলন শুরু করে দেবে। কিছু কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী তো ইতিমধ্যেই ব্যবসাপত্তর গোটাবার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন।

সত্যিই পাঞ্জাবে ভবিষ্যতে কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা এখনই বলা শক্ত। এখন সবটুকুই নির্ভর করছে পাঞ্জাবের নির্বিঘ্ন ভোট এবং একটি সুস্থ স্বাভাবিক সরকার গঠনের ওপর। □



পাঞ্জাবের রাজ্যপাল (বাঁদিকে,সর্বপ্রথম) শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন

অকালি দলের আন্দোলন ঃ পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের আশা-নিরাশা



…লঙ্গোয়াল, দিল্লি জি পি সি-র সভাপতি যশোবন্ত সিং কালরার সঙ্গে

গত শতাব্দী পর্যন্ত শিখদের কোন স্বতন্ত্র ধর্মসত্তা বলে মনে করা হত না। স্বয়ং শিখরাও নিজেদের হিন্দুত্বের মধ্যেই একটি সাবলীল অস্তিত্ব বলে মনে করতেন। তখন পাঞ্জাবের প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারেরই একজন করে সন্তানকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য পাঠান হত। সে কারণে শিখ ধর্মীয় এবং হিন্দুধর্মীয়দের মধ্যে ছিল পারিবারিক সম্পর্ক।

এই সম্পর্কে চিড় ধরায় প্রথম বৃটিশ শাসকরা। পশ্চিম ভারতের কোন কোন অংশে প্রশাসনিক অধিকার পাবার ব্যাপারে মুসলমানদের মত, শিখদেরও মদত দিতে থাকে তারা। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের চেহারা খণ্ডিত করার জন্যই তাদের এই উস্কানি। ফলে শিখরা নিজেদের পৃথক সত্তা হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল। বৃটিশ উস্কানির আগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বিসম্বাদ দেখা দেয়নি। বরং বিভিন্ন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ।

১৯২০ সালের ১৪ ডিসেম্বর শিখসত্তা নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার মানসিকতা নিয়ে প্রথম শিরোমণি অকালি দল গঠন করে। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে এই দলের সূচনা হয়। গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলন চলছিল এ সময়ই। শিরোমণি অকালি দল সেই সংস্কার আন্দোলনেরই রাজনৈতিক ফসল।

এর কুড়ি বছর পর মাস্টার তারা সিং প্রথম শিরোমণি-অকালি দলের কর্মপন্থা বুঝিয়ে বলেন। তিনি মোটামুটিভাবে হিন্দুসত্তা থেকে শিখসত্তাকে পৃথক করে নেন। এতে সতীদাহ, শিশুহত্যা এবং দুর্নীতি, অসততা, মদ্যপান, ধূমপান ইত্যাদির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়।

একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বা ধর্মসত্তা না হলেও এক বীর যোদ্ধা সম্প্রদায় হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁদের অবদান দীর্ঘদিনের। গুরু গোবিন্দ সিং-এর আমলেই পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় 'অকালি' নামটি গ্রহণ করে। 'অকালি' শব্দের অর্থ 'অমর'। এই অমর গোষ্ঠীর যোদ্ধারা ছিলেন 'নিহাং' নামধারী।

এমনিতে বীর এই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃটিশদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর বৃটিশ রাজশক্তি ধীরে ধীরে পাঞ্জাবকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে। ১৮৪৯-এ সে কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলে তারা। এই অংশ ভারতে বৃটিশরা গ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে চারটি প্রধান গুরুদ্বারের দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তায়। এই গুরুদ্বারগুলি হল অমৃতসর, আনন্দপুর, পাটনা এবং হায়দরাবাদের নান্দের অঞ্চলের তখত সমূহ।

বাকি ২৬০টি গুরুদ্বার মহন্তদের অধীনেই রইল। এই মহন্তরা বংশপরম্পরায় এগুলি দেখাশুনো করে আসছিলেন। ১৯১৯ সাল থেকে উল্লেখিত মহন্তদের হাত থেকে গুরুদ্বারগুলি উদ্ধার করার এক আন্দোলন শুরু হয় শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সাত বছর ধরে এ আন্দোলন চলেছিল। অকালি আন্দোলন নামে এটি পরিচিত। শিখরা চেয়েছিলেন, বংশপরম্পরায় নয়, গুরুদ্বারের প্রধান পুরোহিত অধিকাংশের ইচ্ছায় নির্বাচিত হবেন। এমন একটা নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক তিক্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এই সাত বছর। তিক্ত হবার কারণ হল, বৃটিশরা পাঞ্জাবের ক্ষমতা দখল করার পরই মহন্তদের মদত দিতে শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ঐসব বশংবদ মহন্তদের মধ্য দিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। মহন্তরাও সে মদতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগে জেনারেল ও'ডায়ার গুলি চালিয়ে যখন শত শত লোককে নিকেশ করে দিয়েছিল, মহন্তরা এ ব্যাপারে জেনারেল ও'ডায়ারকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন এবং তাকে 'শিখ সম্প্রদায়ের ত্রাতা' হিসাবে উল্লেখ করেন ও 'শিরোপা' দেন। এর থেকে বোঝা যায়, ও'ডায়ারের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হঠাৎ ঘটেনি, তা ছিল কারোর কারোর স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্বপরিকল্পিত অপরাধ।

কিন্তু বৃটিশদের আড়ালে থেকেও মহন্তরা অকালি আন্দোলনের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি। গুরুদ্বারগুলির বংশপরম্পরাগত অধিকার তাঁদের ত্যাগ করতে হল। শিখরা শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি গঠন করে তার ওপরেই গুরুদ্বারগুলির দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। এটি একটি নির্বাচিত সংস্থা। বৃটিশ রাজশক্তি এই নতুন কর্মপদ্ধতি মেনে নিল এবং ১৯২৫ সালে সে ব্যাপারে নতুন আইন প্রণয়ন করল। এর ফলে অকালিদের আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।

১৯২০ সালে ১৪ ডিসেম্বর শিরোমণি অকালি দলের জন্ম হবার পর থেকে তা আধুনিক পাঞ্জাবের রাজনীতিতে একটি ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এমনকী প্রথম দিকে এঁরা হিংসাত্মক আন্দোলনেরও পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে সে পথ থেকে সরে আসেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দল সে কারণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ সময়ে দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল ঃ দল দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং আর যেসব রাজনৈতিক দলের নীতি এরকমই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাবে।

এ সময় শিরোমণি অকালি দল সবরকম সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিবাদ করেছিল সবরকম দমনমূলক আইনের। সে সঙ্গে কর্মসূচিতে তাঁরা অস্পৃশ্যতা দূর করা, দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়করণের প্রস্তাব করেছিলেন। তবে কর্মসূচিতে শিখদের বৈধ দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল 'কৃপাণ' বহনের পূর্ণ অধিকার তাঁদের দেওয়া হবে।

পরবর্তীকালে শিখদের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে মুসলিম লিগের দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। শিরোমণি অকালি

না জল ফুটিয়ে নেওয়ার দরকার
না বোতল ফোটানোর মেহনত করার
আর না গরম-ঠাণ্ডা দেখার !



প্রকৃতি, কেমন যুগ যুগ ধরে সহজ-স্বাভাবিক উপায়ে নবজাত বাচ্চার পুষ্টির ব্যবস্থা ক'রে আসছে !
প্রকৃতি, হাজার-হাজার বছর ধরে পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে, শেষে, শরীর গড়ে তোলার প্রোটিন, শক্তিদায়ক কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে নানান ভিটামিনের সঠিক ও সম্পূর্ণ সুষম অনুপাত কায়েম ক'রে নিয়েছে—আর সেজন্যেই মায়ের দুধ বাচ্চার জন্যে এক আদর্শ আহার।

দূষিত হবার আশংকাই থাকে না

আপনার কচি বাচ্চাটি যখন স্তন্যপান করে তখন তা কোনোরকম দূষিত হবার আশংকাই থাকে না—কারণ তাতে দুধ তৈরী করা, বোতল সাফ করা বা তাপমান দেখা ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না—আর তাছাড়া, মায়ের দুধ তো বাচ্চার কাছে অমৃতের সমান !
ওছাড়াও, প্রকৃতি মায়ের দুধে "রোগ প্রতিরোধক বস্তু"-ও প্রদান করেছে, যার ফলে আপনার বাচ্চা আমাশয় রোগ ও অন্যান্য রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর, মায়ের দুধে আরও অনেক কিছু থাকে, যেমন, স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধকারী ভিটামিন 'সি'। ওসব ছাড়াও, যখন আপনি আপনার বাচ্চাটিকে স্নেহভরে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়ান, তখন তার কী আনন্দই না হয়—আর ঐ ছোট্ট সোনাটি, এতবড় এই সংসারে, আপনার মমতাটুকুতেই নিজেকে কত সুরক্ষিত মনে করে।

সারা বিশ্বে প্রচলন বাড়ছে

এখন দিনে দিনে, এমন কি পাশ্চাত্য দেশেরও অধিক সংখ্যক মায়েরা, নিজেদের বাচ্চাদের বুকের দুধই খাওয়াচ্ছেন। কারণ, তাঁরা মায়ের দুধের অমূল্য পুষ্টিগুণ ও অন্যান্য গুণের মাহাত্ম্য আবার বুঝতে সুরু করেছেন।

কোনো অসুবিধা থাকলে

হ্যাঁ, যদি আপনি কোনো অসুবিধার দরুণ বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়াতে পারেন—যেমন ধরুন আপনার স্বাস্থ্য ভাল নয়, বা পুরোমাত্রায় বুকে দুধ আসছে না, তাহলে কি করবেন ? ঐরকম অবস্থায়, আপনাকে খুব সাবধানতার সঙ্গে বাচ্চাকে এমন আহার দেওয়া উচিত যার স্থান, মায়ের দুধের ঠিক পরেই ব'লে মানা হয়।

স্প্রে-ড্রায়েড আমূল স্প্রে

আমূল স্প্রে, পুষ্টির দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ সুষম আহার। কারণ এতে খুব উঁচুমানের প্রোটিন, সহজে হজম হয় এমন কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ সুষম অনুপাতে আর নানান অবশ্যকীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিকভাবে সম্মিলিত করা থাকে। এটি ফুটন্ত জলকে ঈষদুষ্ণ ক'রে নিয়ে তাতে গুললে, খুব সহজে গুলে যায়—আগে থেকে পেস্ট তৈরী ক'রে রাখার দরকার হয় না।

সাশ্রয়কারী

আমূল স্প্রে টিনে পাওয়া যায় এমন অন্য সমস্ত শিশু-আহারের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়কারী।
কারণ এটি হ'ল সেই আধুনিক দুগ্ধ-সমবায় সঙ্ঘের উৎপাদন, যারা এ দেশে "শ্বেত বিপ্লব"-এ অগ্রণী।

সাবধানতা

সব সময় মনে রাখবেন যে, বাচ্চার দুধের সমস্ত বাসনপত্র ও ফিডিং বোতল, স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত আর তার আহারের জন্যেও ফুটন্ত জলই ব্যবহার করা উচিত।
বাচ্চার সঠিক পুষ্টির জন্যে, টিনে দেওয়া নির্দেশমাত্রার একেবারে অনুসারেই আহার তৈরী করবেন।

বিনামূল্যে ! আমূল-পুস্তক

এতে অত্যন্ত উপযোগী তথ্যে ভরা এই এই অধ্যায় আছে—গর্ভাবস্থা, প্রসবের পূর্বে দেখাশোনা, প্রসব, স্তন্যপান, অন্য আহার, শক্ত আহারে অভ্যস্ত করা, শিশুর নিত্যকর্ম, শিশুর উন্নতি, কয়েকটি সাধারণ ব্যাধির প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুর সাধারণ রোগ, শিশু বয়সে ভাবাত্মক সমস্যা, অসুস্থ শিশুর দেখাশোনা আর তার দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। এই পুস্তক ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ও মলয়ালম ভাষায় পাওয়া যায়। এর জন্যে, আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ১ টাকা ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এখানে লিখুন: পোঃ বঃ ১০১২৪, বোম্বাই-৪০০০০১



আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের ঠিক পরেই !

নির্মাতা: গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, পোঃ বঃ ১০, আনন্দ ৩৮৮০০১, গুজরাত

ASP/AS-BEN6/83

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরির বিরোধিতা করে এবং দেশভাগের না করে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে প্রচার চালাতে থাকেন।

শিরোমণি অকালি দল যেমন একদিকে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনই পাঞ্জাবের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী শিখিস্তান পরিকল্পনার কথা প্রচার করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেই এই নতুন তত্ত্ব চালু হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এই পরিকল্পনায় ভারত ভাগের পর শিখিস্তানকে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (বাফার স্টেট) বলে গণ্য করার কথা বলা হয়। পরিকল্পিত এই রাষ্ট্রের মধ্যে পাঞ্জাবের শিখ-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি, পাতিয়ালা, নাভা, ফরিদকোট এবং কালসিয়ার দেশীয় রাজ্যগুলি, মালেরকোটলার অ-শিখ অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্যগুলি এবং সিমলা পাহাড়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলা হয়। এখানে পাঞ্জাবের শিখ-অধ্যুষিত প্রস্তাবিত জেলাগুলির মধ্যে ছিল লুধিয়ানা, জলন্ধর, আম্বালা, ফিরোজপুর, লাহোর, অমৃতসর, লায়ালপুর, গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা, মন্টেগোমারি, হিসার, রোটক এবং কার্নাল। ডঃ ভি এস ভাট্টি নামে লুধিয়ানার এক বুদ্ধিজীবী এই পরিকল্পনার কথা প্রথম প্রচার করতে থাকেন। শিখ নেতারা ১৯৪০ সালে ১০ মে অমৃতসরে এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিতও হয়েছিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নাহ তার আগেই তাঁর পাকিস্তান-পরিকল্পনার মধ্যে এর অনেকগুলি অঞ্চল দাবি করে বসেছিলেন। শিখ নেতাদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তান তৈরির দাবি মেনে নিলে তাঁদের দাবিও মানতে হবে আর দেশভাগ যদি না হয় তবে তাঁরাও ভারতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবেই বসবাস করবেন। দেশ ভাগের কোন রকম ভূমিকাই তৈরি হতে দেবেন না।

পাকিস্তানের প্রতি এই ভয়ের মনোভাব থেকেই ক্রিপস মিশনের কাছে শিখ নেতারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানিয়েছিলেন। 'আজাদ পাঞ্জাব' নামে এই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রটিতে যাতে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ না হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। এই



শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রকাশ সিং বাদল (বাঁদিকে) এবং অর্জুন সিং (ডানদিকে)

প্রস্তাবের উদগাতা ছিলেন মাস্টার তারা সিং। তিনি অবশ্য 'আজাদ পাঞ্জাব'-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলার জন্য ১৯৪৩ সালে পাতিয়ালায় একটি শিখ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু নিরঙ্কারীরা সে সময় শিরোমণি অকালি দল এবং মাস্টার তারা সিং-এর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁদের সংশ্রব ত্যাগ করে চলে আসেন।

পাকিস্তান গঠনের কথা যখন চূড়ান্ত হয়ে যায় তখন মাস্টার তারা সিং ও অকালিদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবি জোরদার হতে থাকে। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীও তখন তাঁদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হন এবং মহাত্মা গান্ধীকেও তাঁদের দাবির বিষয়টি অবগত করান হয়। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে মাস্টার তারা সিং একই দাবি পেশ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তান গঠনের পর শিখদের একটি পবিত্রভূমি দরকার। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের আওতায় বিপদ বুঝলে তাঁরা যাতে পবিত্রভূমিতে চলে আসতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা। ক্যাবিনেট মিশনের কাছে আর্জি জানান হয়েছিল। স্বতন্ত্র শিখ রাষ্ট্র গঠন না করে তাঁরা যেন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা চিন্তার বাইরে রাখেন।

পাঞ্জাবের সমৃদ্ধি মোটামুটি ভাবে গড়ে উঠেছিল পশ্চিমে। বড় বড় ভূস্বামীরা সকলেই প্রায় ছিলেন শিখ, কিন্তু অধিবাসীরা ছিলেন মুসলমান। ফলে যাবতীয় সেচখাল, খামারবাড়ি ইত্যাদি সহ তা পাকিস্তানের ভাগেই যাবে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালে ভারতে কার্যভার নিয়ে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে শিখদের মধ্যে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তা দেখা দিল। এমনকী, কোন কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়ে গেল। বহু শিখ গণহত্যার শিকারও হলেন। বাংলাদেশের মত পাঞ্জাবও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়াল। ভাগ হল পাঞ্জাব। পশ্চিমের সমৃদ্ধ অঞ্চল গেল পাকিস্তানের ভাগে এবং পূর্ব দিক এল ভারতে। পাঞ্জাব ভাগের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং শিখদের পক্ষে বলদেও সিং বেতার ভাষণ দিলেন ১৯৪৭-এর ৩ জুন। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, পুরো রাজ্যটাকেই অন্তত পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। অবশ্য মাস্টার তারা সিং এই বিভক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।

জুন মাসেরই প্রথম সপ্তাহে লাহোরে শিখ সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি এক আলোচনা সভায় মিলিত হলেন। সেখানে নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা চলে।

এই সম্মেলনের প্রস্তাবাবলি ১২ জুন ১৯৪৭ সালে নয়া দিল্লিতে প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ভারতকে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করার বিরুদ্ধতা করবেন শিখ সম্প্রদায়। কারণ এর ফলে শিখদের এতদিনকার একতার দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে।

দাবি উপেক্ষিত হবার পর শিখরা বাধ্য হয়ে সংবিধানের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা দাবি করলেন। এই দাবির মধ্যে ছিল ঃ

১. শিখরা সম্প্রদায়গতভাবে পরিষদে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবেন।

২. পূর্ব পাঞ্জাবের ৫০ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে ৫ শতাংশ শিখ প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে।

৩. দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে শিখদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. অন্যান্য তপশিলি জাতিদের মত তাঁদের মধ্যেকার তপ-

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

ভাগ্যগণনা

প্রশ্ন করিবার নিয়মের জন্য পত্র লিখুন ঃ জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীচূড়ামণি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ নং নূতনগ্রাম, রিষড়া, হুগলী।

(আর-৩৬৩৯)

শিল্পীদেরও সমান সুযোগ দিতে হবে এবং

৫. সেনাবাহিনীতে তাঁদের জন্য বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পূর্ব পাঞ্জাবে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে একটি সংখ্যালঘু কমিটি গঠন করা হল। সেখানকার পরিষদে এই প্রস্তাব পাশ হবার পরই এই কমিটি গড়ে তোলা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, অকালি দলের সিদ্ধান্ত ও মত হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, অমৃতসর, গুরুদাশপুর এবং আম্বালা এই কটি জেলা নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ গড়তে হবে। এই সঙ্গে আর একটি ঘটনাও শিখ সম্প্রদায়কে ভাবিত করে তুলল। তা হল, পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দুরা ১৯৫১ সালের লোক গণনাকালে নিজেদেরকে হিন্দিভাষী বলে উল্লেখ করলেন, পাঞ্জাবিভাষী নন।

১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কমিটির রিপোর্ট (রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত) প্রকাশিত হল। তাতে পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্যগঠনের দাবি বাতিল করা হয় এবং পেপসু অঞ্চলকেই কেবল পূর্ব পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। মাস্টার তারা সিং অবশ্য এ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৯৬০ সালে পূর্ব পাঞ্জাবে নির্বাচন হল। এতে বিধানসভার ১৪০টি আসনের মধ্যে অকালি দল পেল ১৩২টি আসন। ফলে এতদিন ধরে প্রতাপ সিং কায়রোঁ যে মুখ্যমন্ত্রিত্বের সিংহাসনটি ভোগ করে আসছিলেন, সেখান থেকে তাঁর পতন ঘটল এবং অকালি দলই মন্ত্রিসভা গড়ল। এই সময়ই মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক শিখ রাজ্য গঠনের দাবিতে দিল্লি পর্যন্ত একটি শিখ-মিছিল নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ১৯৬০ সালের ২৪ মে তিনি গ্রেপ্তার হন। ২৯ মে এই মিছিল পরিচালিত হবার কথা ছিল।

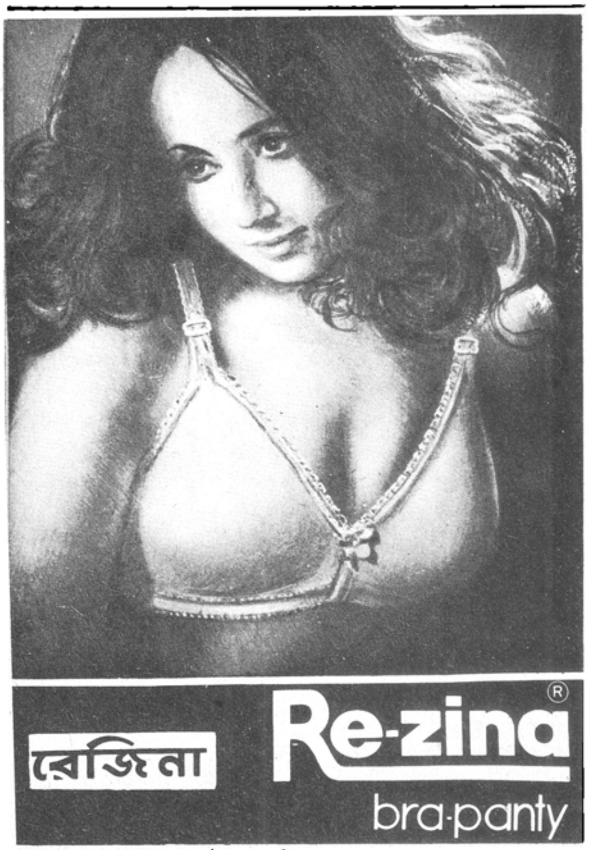
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৬০ সালের ২৪ জুন অকালি দাবিকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিলেন। কিন্তু সে ভর্ৎসনায় বিরত হননি শিখরা। সন্ত ফতে সিং একই দাবিতে অটল থাকলেন এবং তিনি অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে আমরণ অনশন শুরু করলেন ১৯৬০ সালেরই ১৮ ডিসেম্বর থেকে। ফলে মাস্টার তারা সিংকে মুক্তি দেওয়া হল এবং নেহরু স্বয়ং আলোচনার জন্য সন্ত ফতে সিংকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানালেন। আলোচনার পর নেহরু বললেন, বস্তুত পূর্ব পাঞ্জাব একটি পাঞ্জাবি ভাষাভাষী রাজ্য। তাতে শিখদের স্বার্থ অনেকখানিই রক্ষিত হচ্ছে। একারণে পূর্ব পাঞ্জাবকে পুনরায় ভাগাভাগি করা হবে পাঞ্জাব, শিখ সম্প্রদায় এবং সারা জাতির পক্ষেই অমঙ্গলকর। অতঃপর সন্ত ফতে সিং তাঁর অনশন সত্যাগ্রহ ভঙ্গ করলেন (১৯৬১ সালের ৯ জানুয়ারি) এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকেও সে সময়ে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হল।

মাস্টার তারা সিং কিন্তু তাঁর দাবি থেকে কখনই সরে আসেননি। তিনি বললেন, তাঁর পাঞ্জাবি সুবা-র দাবি অটুট থাকবে এবং তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ও সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই এ ব্যাপারে শিখ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সে মত ১৯৬১-র ১৫ আগস্ট থেকে তিনি আন্দোলন শুরুও করলেন। আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করা। অনশন সত্যাগ্রহ শুরু হল। পণ্ডিত নেহরু অতঃপর ঘোষণা করলেন, অনশন সত্যাগ্রহ যে মুহূর্তে তুলে নেওয়া হবে সে মুহূর্তে তিনি পাঞ্জাবি সুবার দাবি নিয়ে বিচার বিবেচনার জন্য এক তদন্ত কমিশন গঠন করবেন। অকালি নেতারা পণ্ডিতজীর এই প্রতিশ্রুতি মেনে নিলেন এবং মাস্টার তারা সিং-ও ৪৮ দিনের অনশন সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করলেন।

১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সেই প্রতিশ্রুত কমিশন গঠন করা হল। এতে অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম সি চাগলা এবং ডঃ পি সি রামস্বামী আয়ার। কমিশন ১৯৬২-র ৯ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট দাখিল করে। তাতে বলা হয়, শিখদের বিরুদ্ধে কোনরকম বৈষম্য কোথাও ঘটেনি। ইতিমধ্যে অবশ্য অকালি দল ভেঙে গেল। মাস্টার তারা সিং-এর আচরণকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে উল্লেখ করলেন সন্ত ফতে সিং-ও।

নেহরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনিও পাঞ্জাবি সুবার দাবি নিয়ে নানাভাবে বিচার বিবেচনা করতে লাগলেন। কিন্তু অকালিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব যথারীতি চলতে লাগল। মাস্টার তারা সিং একদিকে স্বতন্ত্র পাঞ্জাবি রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাতে লাগলেন। পরোক্ষে কিন্তু সন্ত ফতে সিং চাইছিলেন, পাঞ্জাবি ভাষাভাষী একটি নির্দিষ্ট রাজ্য, অন্য কিছু নয়। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হল। ফলে অকালিরা তাঁদের নিজস্ব দাবির কথা ভুলে গিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে এলেন। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হলে লোকসভার স্পিকার হুকুম সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবি সুবার ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য একটি ক্যাবিনেট কমিটি গঠিত হল। কমিটি ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ একটি রিপোর্ট দাখিল করে। তাতে বলা হয়ঃ ১) পাঞ্জাবি ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি পৃথক পাঞ্জাব রাজ্য গঠিত হওয়া উচিত ২) হিমাচলের সঙ্গে ঐ এলাকার হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি মিশে যাবে এবং ৩) রাজ্যের অন্য হিন্দি ভাষাভাষী এলাকাগুলি নিয়ে হরিয়ানা নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা উচিত। এই সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের ২৩ এপ্রিল একটি সীমানা কমিশন গঠন করা হয়।

এই কমিশনের সুপারিশ মতই বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্য গঠিত হয়েছে। এছাড়া চণ্ডিগড়ের দশ মাইল এলাকা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং তা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাজ্যের রাজধানী হিসাবে গণ্য হয়। পাঞ্জাবের আয়তন দাঁড়ায় ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১ কোটি ১৪ লাখ এবং তার মধ্যে ৫৫ শতাংশ অধিবাসী ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। হরিয়ানার আয়তন সেক্ষেত্রে দাঁড়ায় ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৭৬ লাখ এবং হিমাচল প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ৫৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ লাখ ৯ হাজার। এই সময় অবশ্য চণ্ডিগড় ও ভাকরা বাঁধ পুরোপুরি পাঞ্জাবের হাতে দেবার জন্য দাবি করা হয়েছিল। তবে সে সময় সরকারিভাবে এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি পাঞ্জাবকে দেওয়া হয়নি কিন্তু হুকুম



৬৬এ, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ফোন ঃ ৫৫-২৮৭০

সিং নিজে অকালি দলকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

এরপরই ১৯৬৭ সালে সারা দেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসে। অকালি দলের দুটি গোষ্ঠীই নির্বাচনে যোগ দেয়। কিন্তু দুটি গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই চালানয় পাঞ্জাব বিধানসভার ১০৪টি আসনের মাত্র ২৬টি আসন তারা দখল করে। কংগ্রেস ৪৮টি আসন পেয়ে রাজ্যে বৃহত্তম দল হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু অকংগ্রেসি যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয় পাঞ্জাবে। এর কিছুদিন পরে, ১৯৬৭-র ২২ নভেম্বর মাস্টার তারা সিং-এর জীবনাবসান হয়। ফলে স্বতন্ত্র পাঞ্জাব রাষ্ট্রের দাবি ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে সে রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হল এবং সন্ত ফতে সিং-এর অকালি গোষ্ঠী ৪৪টি আসন লাভ করে। জনসংঘের সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

ইতিমধ্যে সন্ত ফতে সিং পুনরায় অনশন সত্যাগ্রহের হুমকি দেন। তাঁর দাবি ছিল চণ্ডিগড়, ভাকরা বাঁধ এবং পাঞ্জাবি ভাষাভাষী এলাকাগুলি অবিলম্বে পাঞ্জাবকে দেওয়া হোক। ১৯৭০ সালের ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। তাতে বলা হয়, চণ্ডিগড় পাঞ্জাবে যাবে এবং পাঞ্জাবের ফাজিলকা, আবোহর ইত্যাদি এলাকাগুলি যাবে হরিয়ানায়।

১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনে কংগ্রেস বিধানসভায় ৫৭টি এবং সি পি আই ১০টি আসন লাভ করে। জ্ঞানী জৈল সিং-এর নেতৃত্বে এখানে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সি পি আই-এর সমর্থনে। ফলে অকালি আন্দোলন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

কিন্তু অকালি দলের প্রতি জনসমর্থন কমে গেলেও তারা হাল ছাড়েনি। অন্য নানা দিকে তারা দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। ইতি-মধ্যে নিরঙ্কারীরা অকালিদের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করে। তাদের বিদ্রোহ অকালিরা পছন্দ করেননি। ফলে শুরু হয় নিরঙ্কারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম এই সংঘর্ষ প্রকাশ্য রূপ নেয়।

এই অবস্থায় শিখ যুবকরা দল খালসা নামে একটি সংগঠন গড়েন। তাঁরা শিখদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকেন। এই দাবি ছিল নিরঙ্কারীদের কিছুটা কোণ-ঠাসা করার জন্য, অন্যদিকে কোন কোন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর পরোক্ষ মদতে।

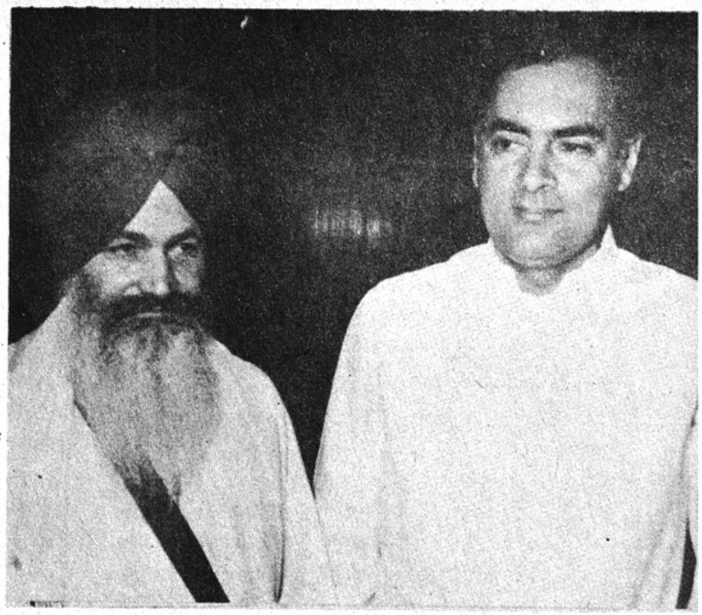
এ'দেরই প্রভাবে লুধিয়ানায় অকালিদের যে অষ্টাদশ সম্মেলন হয়, সেখানে রাজ্যের জন্য অধিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবি করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির যে নির্বাচন হয়, সেখানে অকালিরা ৯৫ শতাংশ আসন পেলেন। তার মধ্যে যুবকদের নবোদিত নেতা সন্ত জার্নেল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালের সমর্থকরা অবশ্য পুরোপুরি পরাজিত হলেন। এমনকী অমৃক সিংও এই নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন। কিন্তু তাতে সন্ত ভিন্দ্রেনওয়ালের কর্মসূচি দমে যায়নি। তিনি ১৯৮২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নানা আন্দোলন চালাতে থাকেন এবং ঐ বছর জুলাই মাসে একটি 'মোর্চা' বের করেন। এ সময়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অকালি সভাপতি সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল তখন সে মোর্চার দায়িত্ব নেন।

১৯৭৩ সালে আনন্দপুরে অকালিরা কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে-ছিলেন কিন্তু এক দশক ধরে তা চাপা পড়ে থাকার পর এ সময় আবার মাথা চাড়া দেয়। ভিন্দ্রেন-ওয়ালে স্বতন্ত্র খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকেন। তাঁর অনুগামীরা অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করতে থাকেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। তার পরের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা।

এবং সেই জানা ঘটনারই অন্যতম পরিণতি সন্ত লঙ্গোয়ালের মৃত্যু। পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভূত এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে প্রেতাত্মা-ছায়া কবে দূর হবে তা একমাত্র ইতিহাসের বিচিত্র গতি-প্রকৃতিই বলতে পারে। □

যীশু চৌধুরী





রাজীব ও লঙ্গোয়াল চুক্তি স্বাক্ষর করার পর

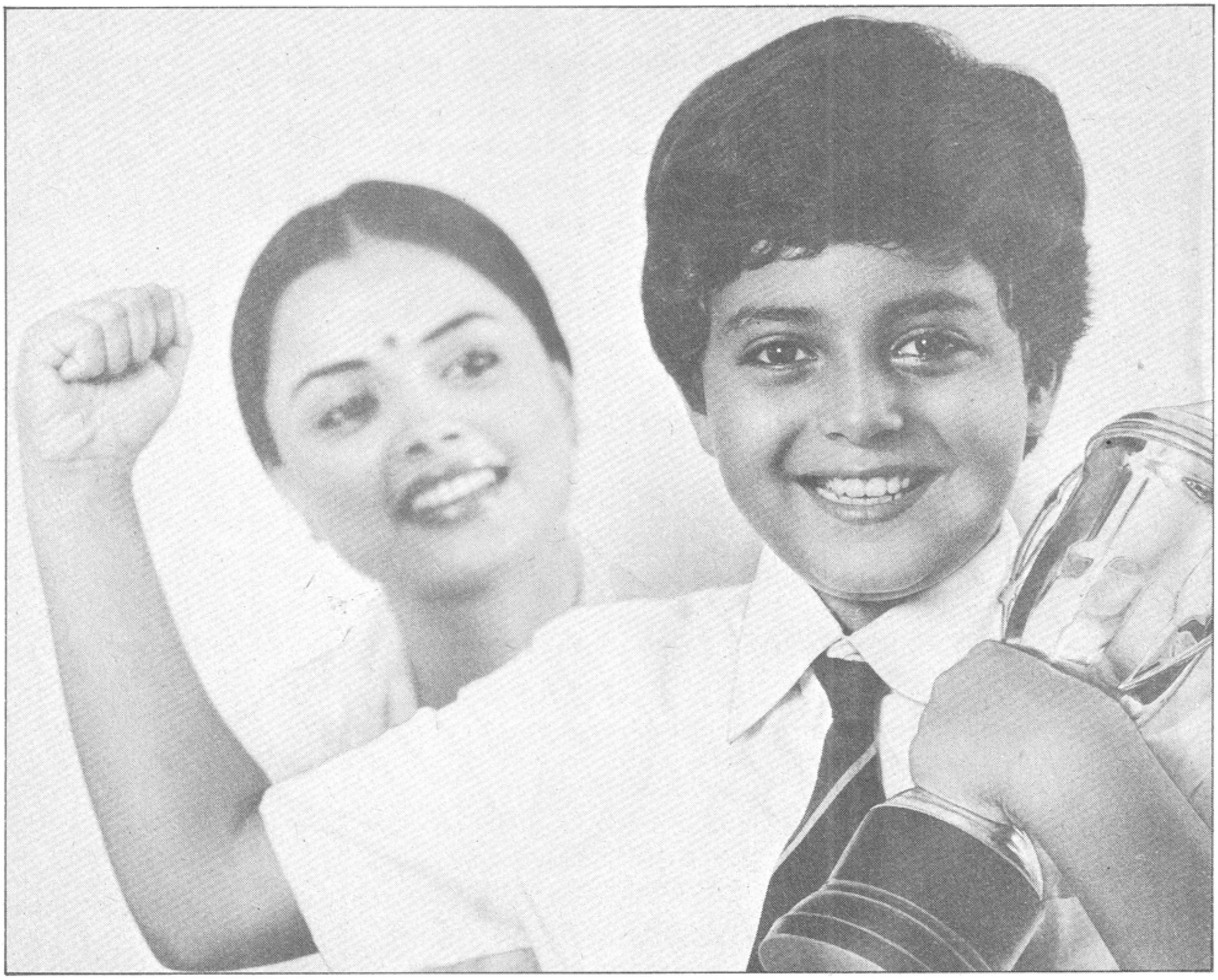
যে চুক্তির জন্য লঙ্গোয়ালকে প্রাণ দিতে হল

রক্তাক্ত পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গত ২৪ জুলাই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও অকালি দল প্রধান সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক মাসের ভয়াবহ অশান্তি ও বিচ্ছিন্নতার যে আগুন পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে জ্বলে উঠেছিল, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর অনেকেই ভেবেছিলেন এবার বুঝি পাঞ্জাবে শান্তির বারি বর্ষিত হবে। পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব আগের মতই দেশের সমৃদ্ধির জন্য, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে দেবে। কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক বা ভাষ্যকার এ ব্যাপারে ততখানি নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁরা অনেকেই ধারণা করছিলেন যে, দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী যে সন্ত্রাস পাঞ্জাবে কায়েম হয়েছিল, সেই সন্ত্রাসের স্রষ্টারা এত সহজে রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি কাজে রূপান্তরিত করতে দেবে না। যেনতেনপ্রকারেণ বাধা সৃষ্টি করবে। আর ঈশান কোণে কালো মেঘের মত যে সংশয় রাজনীতিবিদদের মনে দানা বেঁধে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। গত ২০ আগস্ট সাংবুরে যখন এক ধর্মীয় সভায় ভাষণ দিয়ে, পবিত্র গ্রন্থ সাহিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়াল মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সময় আততায়ীদের গুলি এসে বিঁধেছিল লঙ্গোয়ালের শরীরে। আহত হয়েছিলেন অকালি প্রধানের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরাও। কিন্তু লঙ্গোয়ালের আঘাত ছিল গুরুতর। অমায়িক অথচ কঠোর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন দৃঢ়চেতা মানুষটি স্থানীয় সিভিল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাঞ্জাবে আশু শান্তির জন্য রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি স্বাক্ষরের পরও অশান্তির আশঙ্কা একেবারে যে মুছে যায়নি, তার কারণ সংযুক্ত অকালি দলের এক অংশের নেতা বাবা যোগীন্দর সিং এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এমন সন্দেহও অনেকের মনেই ছিল, সন্ত্রাসবাদীরা এই চুক্তির বাস্তব রূপায়ণ ভেস্তে দেবার জন্য হিংসার আশ্রয় নেবে। লঙ্গোয়ালের হত্যা-কাণ্ড সেই সন্দেহ যে একেবারেই অমূলক ছিল না, তা-ই প্রমাণ করল।

ডিসেম্বর ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অশান্ত পাঞ্জাবকে শান্ত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন এবং গত ১৯৮৫-র ৩ জানুয়ারি পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের জন্য একটি 'মিনিস্টেরিয়াল কমিটি'

"আপনারা শুনেছেন কি— আমার ছেলেটি একদিনও স্কুল-কামাই না করার জন্যে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে!



ধন্যবাদ, সেভেন সীজ্!"

আজ্ঞে হ্যাঁ! এঁর গর্বিতা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এঁর ছেলেটি স্কুলে তো রোজ হাজির থাকেই তাছাড়া খেলাধূলো আর পড়াশুনোতেও সে পুরস্কার পেয়েছে।
সত্যি, এটা এঁর কৃতিত্বই বটে কারণ ইনি যে ছেলেকে ঠিকভাবে পালন-পোষন করেন। তিনি ওকে দেন পুষ্টিকর আহার আর প্রতিদিন খাওয়ান সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল!
সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল-এর নিয়মিত সেবন— বছরভোর ভাল স্বাস্থ্য রাখার এক শুদ্ধ প্রাকৃতিক উপায়! এটির দ্বারা বাচ্চারা ডগমগে স্বাস্থ্যে বেড়ে ওঠে, ওদের দাঁত ও হাড় হ'য়ে যায় মজবুত আর বর্ষা ও শীতের সর্দি-কাশি থেকে বাঁচার জন্যে শরীরে আসে প্রতিরোধ ক্ষমতা।
সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল*— বাচ্চাদের স্বাস্থ্য গ'ড়ে তোলার জন্যে মায়েরা এর ওপরই ভরসা করেন। বিশ্বের ৯৮ টি দেশে ডাক্তাররা এটি সুপারিশ করেন।

* সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল পাওয়া যায় দুই আকারে: ক্যাপস্যুল আর কমলার মুখরোচক স্বাদের কড লিভার অয়েল টন মল্ট।

সেভেন সীজ্ কড লিভার অয়েল
বছরভোর সবল স্বাস্থ্যের জন্যে



CHAITRA-B CAP 31 BEN

গঠন করেন। এই কমিটিতে রাজীব গান্ধী ছাড়াও ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চ্যবন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন পাঞ্জাবের অবস্থা সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন) এবং শিক্ষামন্ত্রী কে সি পন্থ। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রীর দাবি ছিল, অকালিদের সঙ্গে মীমাংসা আলোচনা হবে দুটি শর্তে। প্রথমত, অকালিদের সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা সংবিধান মেনে চলবেন। একই সঙ্গে অকালি নেতাদের মুক্তিদানের নীতি কার্যকর করা হচ্ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা শিরোমণি অকালি দলনেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গত ১৩ মার্চ লঙ্গোয়ালসহ আট অকালি নেতার মুক্তি অকালিদের সংগ্রামের কর্মধারাকে কিছুটা পরিবর্তিত করে।

তবে এটাও বোঝা যাচ্ছিল অকালি নেতাদের একটা বড় অংশও এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসানে আগ্রহী, অবশ্যই তাঁদের দাবিগুলি পূরণ করেই। রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি সেই আগ্রহেরই প্রতিফলন। যাঁরা এই শান্তি বা স্থিতিশীলতা চান না তাঁরাই যে লঙ্গোয়ালের হত্যাকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি কার্যকর হবার ফলে সেই অশুভ শক্তি পরাজিত হতে চলেছে। লঙ্গোয়াল সেই অশুভ শক্তিকে আটকাতে গিয়েই নিহত হলেন। কী ছিল সেই চুক্তিতে?

রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তির কতগুলি বৈশিষ্ট্য

পাঞ্জাবে দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অকালি দলনেতারাও প্রধানমন্ত্রীকে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কী ছিল সেই চুক্তিতে, যার জন্য অকালি দলনেতারাও সাগ্রহে সেই চুক্তি মেনে নিয়েছেন?

চুক্তিটির বৈশিষ্ট্য হল—১ ১৯৮২ সালে ১ আগস্ট থেকে পাঞ্জাবের অশান্তিতে যে সব সাধারণ নিরীহ নাগরিকের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

২. পূর্বের মতই যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী দেশের সব মানুষকেই সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হবে।

৩. গত নভেম্বরে দিল্লি সহ বোকারো ও কানপুরে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন তার কারণ অনুসন্ধান করবেন।

৪. সেনাবাহিনী থেকে যাঁদের পদচ্যুত করা হয়েছে, তাঁদের পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. শিরোমণি অকালি দলের পরামর্শানুযায়ী এবং সংবিধানের শর্ত পূরণ করার পর, একটি সর্বভারতীয় গুরুদ্বার বিল পাশ করা হবে।

৬. জমে থাকা মামলার মীমাংসার পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা বিধি প্রত্যাহার করা হবে।

৭. বিশেষ আদালতের বিচারের ক্ষমতা থাকবে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে, ক. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং খ. বিমান ছিনতাই সংক্রান্ত মামলায়, এছাড়া সমস্ত মামলার বিচার হবে সাধারণ আদালতে এবং আইনবিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হলে পার্লামেন্টে তা আলোচিত হবে।

৮. পাঞ্জাব আন্দোলনের প্রধান দাবি অনুসারে চণ্ডিগড় অন্তর্ভুক্ত হবে পাঞ্জাবের সীমানার মধ্যে এবং চণ্ডিগড়ের পরিবর্তে পাঞ্জাবের কয়েকটি হিন্দিভাষী অঞ্চল হস্তান্তরিত হবে হরিয়ানার রাজ্য সীমায়। এই হস্তান্তর বাস্তবায়িত হবে ১৯৮৬-র ২৬ জানুয়ারি। যদিও পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্ত বরাবর কিছু অঞ্চল নিয়ে কিছু দাবি ও পাল্টা দাবি রয়েছে, তাই সরকার একটি কমিশন বসাবে এইসব দাবিদাওয়া ও হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত ছোটখাট সমস্যা সমাধানের জন্য।

৯. কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক: শিরোমণি অকালি দলের দাবি ছিল আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো অনুসারেই রচিত হয়েছে এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। রাজীব-লঙ্গোয়াল চুক্তি অনুযায়ী আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সারকারিয়া কমিশনের কাছে পেশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

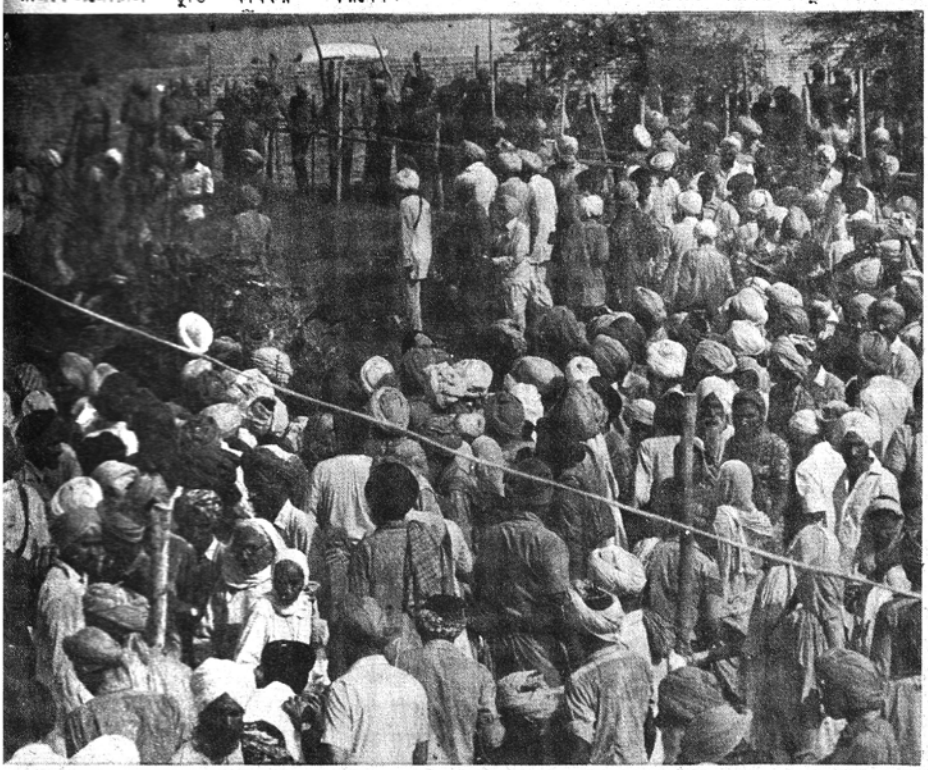
১০. জল বণ্টন সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের কৃষকরা রাভি ও বিপাশার জল যেমন ব্যবহার করছিলেন, তেমনই করবেন। এছাড়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অবশিষ্ট জল বণ্টনের বিষয়টি একটি ট্রাইবুনালের উপর ন্যস্ত হবে। এই ট্রাইবুনালের সভাপতি হবেন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি। সঙ্গে সঙ্গে শতদ্রু ও যমুনা নদীর সংযোগকারী (এস ওয়াই এল) খাল খননের কাজও চলবে। কথা আছে, ১৯৮৬ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে এই খাল নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।

১১. সংখ্যালঘু সংরক্ষণের নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবি ভাষার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবেন।

এই চুক্তির শেষে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও শিরোমণি অকালি দল-প্রধান সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের স্বাক্ষরের ঠিক আগেই আশা করা হয়েছে মীমাংসা সূত্রানুযায়ী পাঞ্জাবে দীর্ঘ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা দেশকে একতা ও সংহতির পথে চালিত করবে।

কিন্তু লঙ্গোয়ালের এই হত্যাকাণ্ডের ফলে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না সত্যিই পাঞ্জাবে শান্তি ফিরে আসবে কিনা। নাকি লঙ্গোয়াল-পন্থীসহ শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সংঘাতে অশান্তির আগুন আরও দ্বিগুণ আকারে জ্বলে উঠবে? □

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

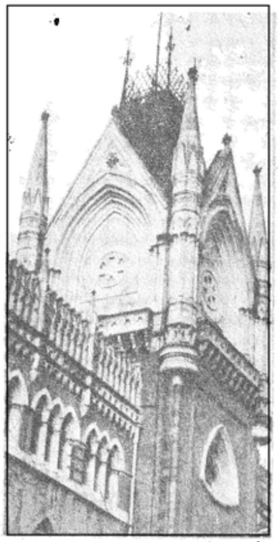


শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে জনস্রোত

ফটো: শঙ্কর চক্রবর্তী, সবিন্দর সিং

ইওর অনার

সহদেবের মারমুখী সঙ্গীরা এবং লক্ষ্মীচরণের গৃহদাহ



সামান্য পাঁচ ছটাক জমি, তাই নিয়ে দুপক্ষের ঝগড়ার অন্ত নেই। মন কষাকষির সূত্রপাত অবশ্য শুরু হয়েছিল বাপেদের আমল থেকে। এখন শুধু একতরফে এক কাকা বেঁচে আছেন, তিনিই জুগিয়ে যাচ্ছেন ইন্ধন।

দুটো পক্ষই গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন। তার সরলার্থ যত তুচ্ছই হোক না কেন হকের জিনিস ছাড়া যাবে না এবং তার জন্যে যা খরচ হয় হোক। একপক্ষের নেতা লক্ষ্মীচরণ, অন্য দিকের সহদেব। এবারকার গ্রাম-পঞ্চায়েত সহদেব-দের দখলে এবং সহদেবই অঞ্চল প্রধান। স্বাভাবিকভাবে তার দাপট বেশি হবে। কিন্তু লক্ষ্মীচরণের জোর অন্যত্র। গ্রামের লোকের সঙ্গে তার সদ্ভাব আছে, তাছাড়া আছে সাজোয়ান চার চারটে ছেলে। বন্দুক? তাও আছে।

পাঁচ ছটাক জমি তো আলেতেই খেয়ে যায়, তাই নিয়ে অত মাথা ব্যথা কেন? গ্রামের লোকের কাছে জমির দখল হল ইজ্জতের প্রশ্ন, তাই সবাই এটাকে স্বাভাবিক মনে করে।

শেষে ঠিক হল সালিশি হোক। সহদেবের আপত্তি নেই, লক্ষ্মীচরণ জানে অঞ্চল প্রধান সহদেব চাইবেই পঞ্চায়েতের লোক দিয়ে সালিশি করাতে। অথচ পেছিয়ে আসার উপায় নেই।

ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে প্রথম মিটিং বসল। এবং প্রথম দিনেই ঝগড়া। সালিশির সদস্য-দের হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা নিরপেক্ষ বিচার করবেন। যেটা সহদেব চায় না, কারণ তাহলে তার হার হবে। অতএব মিটিং বানচাল করার জন্যে যা করণীয় তাই করা হল। তুমুল বাক-বিতণ্ডা, হাতাহাতির মধ্যে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ভিড় আর গোলমালের মধ্যে সহদেবের শাসানিটা অনেকের কানে যায় 'কাল দেখে নেব।'

পরদিন সকালে লক্ষ্মীচরণের সেজ ছেলে রমেশ ছোট বাথরুম করতে বাড়ির সামনের মাঠে গিয়েছিল। সেখানে সহদেব হঠাৎ এসে হাজির হয়, হাতে লাঠি। এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা আন্দাজ করে রমেশ সঙ্গে একটা কাস্তে রেখেছিল। খোলা মাঠের মধ্যে ছুটে আসতে দেখে তৈরি হয়ে নেবার সময় পেয়েছিল রমেশ। ফলে সহদেব সুবিধে করতে পারল না। উল্টে চরম বেইজ্জত হতে হল তাকে। রমেশের কাস্তে সহদেবের নাকের ডগাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল।

তখনকার মত সহদেব রণে ভঙ্গ দিলেও ঝড় যে আসন্ন তা বুঝতে পেরে রমেশ ছুটল বাড়ির পিছন দিকে গোয়াল ঘরের কাছে তুষের আগুনে যেখানে লক্ষ্মীচরণ আর তার অন্য তিন ছেলে আগুন পোয়াচ্ছিল।

রমেশের মুখে সব কথা দ্রুত শুনে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল লক্ষ্মীচরণরা। কী করা যায়? পালান ভাল? না রুখে দাঁড়াতে হবে? জল্পনা এগোতে না এগোতেই গ্রামের দুজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, সহদেব বড় একটা দল নিয়ে আসছে লক্ষ্মীর বাড়িতে চড়াও হবার জন্যে।

লক্ষ্মীচরণের দোতলা বাড়ি। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে সদরে তালা আঁটল ভেতর থেকে।

দেখতে দেখতে বাড়ির সামনে সহদেবদের দল এসে হাজির, প্রায় ২৫-৩০ জন লোক, হাতে দা, বল্লম, বন্দুক।

সহদেব বন্ধ দরজার ওপর লাথি মারল সবার আগে, তারপর হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দলের লোকেরা। ভারী দরজা ভাঙতে লাগল মাত্র কয়েক মিনিট। দোতলা থেকে বন্দুক নামিয়ে আনার সময় পায়নি লক্ষ্মীচরণ। তার আগেই গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। দলের কয়েকজন একতলায় খোঁজাখুঁজি শুরু করল, বাকিদের একটা বড় অংশ ছুটল দোতলায়। সেখানে বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে খুন করল লক্ষ্মীচরণের দুই ছেলেকে এবং এক পুত্রবধূকে। রমেশ আর তার ছোটভাই সুরেশ দোতলার টালির ছাদ ভেঙে পালায় পাশের বাড়িতে। সুরেশ পাশের বাড়ির সুকুমার মণ্ডলের গোয়ালে লুকিয়ে পড়ল, রমেশও তাই।

সহদেবদের দল যখন দেখল ছাদ ভাঙা, তখন সম্ভাব্য কোন দিকে যেতে পারে তারই খোঁজ করতে লাগল। সুরেশ গোয়ালের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তাকে আর না ডেকে ওখান থেকে পালিয়ে পুকুরপাড়ের গোলাঘরে গিয়ে ঢুকল রমেশ।

খুঁজতে খুঁজতে ওরা সুরেশকে টেনে বের করল গোয়ালের গাদা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে গুলি। সুকুমার মণ্ডল বাধা দিতে এসেছিল, তাকে প্রচণ্ড মারধোর করল সহদেবের লোকরা।

কিন্তু রমেশকে পাওয়া গেল না। সহদেবের ইচ্ছে ছিল পুরো ফ্যামিলিটাকেই খতম করে দেওয়া। নাক কাটা যাওয়ায় সহদেব এত রেগে গিয়েছিল যে, শুধু খুন করেই তার জিঘাংসা তৃপ্ত হয়নি। এরপর সে সব কটা মৃতদেহকে টেনে সামনের মাঠে এনে ঘুঁটে আর কাঠ জ্বেলে পোড়াবার পরিকল্পনা করেছিল। মৃতদেহগুলোকে যখন টেনে বের করে আনছিল তখন লক্ষ্মীচরণের স্ত্রী আর থাকতে পারেনি, লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে সহদেবের পায়ে পড়ে বলেছিল, মৃতদের যেন আর হেনস্থা না করা হয়। একজনের বল্লমের খোঁচায় লক্ষ্মীচরণের স্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

তারপর শুরু হল সেই নারকীয় মহোৎসব। পাঁচ-পাঁচটা মৃতদেহকে পোড়ান হচ্ছিল। এত দূর পর্যন্ত দেখে রমেশ পালায় পুলিশে খবর দিতে। ঘণ্টাদেড়েক পরে পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল তখনও আধপোড়া মৃতদেহগুলোকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

এরপর পুলিশি তদন্ত। কিন্তু দেখা গেল রমেশ ছাড়া আর কেউই এগিয়ে এল না বিবৃতি দিতে, নানা ধরনের উদ্ভট অজুহাত দেখিয়ে গ্রামের অধিকাংশই জানাল, তারা ঐ সময়ে হয় মাঠে ছিল, নয় অন্যত্র। বাড়ির মেয়েরা? তাদের গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকার কথা।

বাধ্য হয়ে পুলিশ রমেশের অভিযোগ অনুসারে গেল সহদেবের বাড়ি। গিয়ে শুনল, সহদেব গেছে পাশের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কেন, কী বৃত্তান্ত শোনার আগেই দেখা গেল সাইকেল রিক্সা করে সহদেব ফিরছে, সঙ্গে তার ১২-১৩ বছরের ভাইপো বিনয়। সহদেবের মুখে একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ান।

পুলিশ দেখে সহদেব খুব ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামল। খাতির যত্ন তো করতে হবে। রমেশ নাক কেটেছে, গণ্ডগোল তো তাই থেকে। কিন্তু সহদেব সেদিকেই গেল না। নাক কেটে ফেলেছে তার ভাইপো বিনয়। সকালবেলা কাস্তে নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ চালিয়ে দেয়। ফলে নাকের ডগাটা উড়ে গেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেই কথাই বলে চিকিৎসা করিয়ে ফিরছে সহদেব।

বন্দুক আনতে বলল পুলিশ। সহদেবের এক খুড়তুতো ভাই কলকাতায় বন্দুকের দোকানে কাজ করে, সে গত রাতে এসেছে, বন্দুকগুলোকে সাফ করছে। সত্যিই তাই। পেট্রোলে জবজবে হয়ে গেছে বন্দুক তিনটে। অতএব সদ্য গুলি চালান হয়েছে কিনা তা শত পরীক্ষাতেও ধরা পড়বে না।

পুলিশ রমেশের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে তদন্তে যত এগোতে চেষ্টা করে, তত উল্টো ফল ফলে।

ক্রমশ পুলিশের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করল। প্রাণের ভয়ে রমেশও আর গ্রামে থাকে না। তাদের জমি-জিরেত জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা আর গ্রামের কিছু মাতব্বর গোছের লোক ভাগ করে দেখাশোনা শুরু করল, অবশ্য একথা রমেশই বলে পাঠিয়েছিল লোক মারফৎ। মাঝে একবার পুলিশ পাহারায় এসে

বাড়িঘরদোর তালা লাগিয়ে গেছে।

পুলিশ সহদেবদের কিছুতেই জড়াতে পারছে না, অথচ রমেশের কথা তো ফেলে দেবার মত নয়।

একদিন সহদেব থানায় গিয়ে বলল, রমেশদের বন্দুকটার খোঁজ করতে, কারণ তার কাছে সঠিক খবর আছে খুনগুলো রমেশই করেছে।

পুলিশ রমেশকে নিয়ে গ্রামে এল, কিন্তু বন্দুকের হদিশ পাওয়া গেল না। এইবার সহদেব আসল ঘটনাটা জানাল পুলিশকে।...একথা ঠিকই যে ওর সঙ্গে লক্ষ্মীচরণের ঝগড়া ছিল, আগের দিন 'দেখে নেবে' বলে শাসিয়েও ছিল, কিন্তু তাই বলে খুন-খারাপির দিকে যাবার মত কোন অভিপ্রায়ই তার ছিল না, বিশেষ করে সে নিজে যখন গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান।

আসলে লক্ষ্মীচরণের যে পুত্রবধূটি মারা গেছে তার সঙ্গে ছিল রমেশের অবৈধ প্রেম। এটা প্রায় বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছিল বৌদির সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টিকে পাড়ার দিকে কেউ তত আমল দেয়নি। কিন্তু ক্রমশ তা দৃষ্টিকটুভাবে বেড়ে ওঠে।

শেষে একটা সময় রমেশ বেশ মরীয়া হয়ে ওঠে। বৌদিও শোনা যায় দেওরের সঙ্গে পালিয়ে যাবার মতলব করেছিল এক সময়ে। ঐ খুনের ঘটনার কদিন আগে রমেশের মা পারিবারিক কেলেঙ্কারী বন্ধ করার জন্যে সবাইকে বোঝায়। বিশেষ করে রমেশকে। রমেশ নাকি গোঁয়ারের মত কোন কথাই কানে নেয়নি।

১৭ ডিসেম্বর, যেদিন সালিশির মিটিং হয়, সেদিন রাতে আবার একটা খিটিমিটি বাধে রমেশদের বাড়িতে। সেই রাতেই রমেশ বৌদিকে বলেছিল তার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে। প্রথম দিকে মোহের ঘোরে রাজি হলেও, পরে সামাজিক কলঙ্কের কথা চিন্তা করে বৌদি পিছিয়ে যায়। রাগের চোটে রমেশ বৌদিকে খুন করে বসে।

তারপর দাদা, ভাই, মা, বাবা সকলে এসে রমেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুকটা কেড়ে নেবার জন্যে। কিন্তু তা করার আগেই বাবা, দাদা আর ভাইকে খুন করে ফেলে রমেশ। মরীয়া হয়ে মা যখন ওর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে সন্তানঘাতী হবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, তখন ছুটে গিয়ে বল্লম এনে মাকে গেঁথে ফেলে রমেশ।

তাতেও তার রাগ পড়েনি, সে তখন পুরোপুরি উন্মাদ। মৃতদেহগুলোকে টেনে এনে আগুন লাগায়। আগুন গ্রাম ঘরে নতুন কিছু নয়, বিশেষ করে শীতকালে, তাই কেউই তেমন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যখন মানুষ পোড়ার বিশ্রি গন্ধ বের হতে লাগল, তখন আস্তে আস্তে লোক জড়ো হয়।

ওরা অবশ্য কেউই সে সময়ে রমেশকে দেখেনি। মনে হয় আগুন লাগাবার পর রমেশের হুঁশ হয় ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তাই বাঁচবার জন্যে পুলিশে গিয়ে সহদেবদের নামে দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।

শেষ রাতে বন্দুকের গুলির শব্দ কেন গ্রামের লোকেদের সতর্ক করেনি? তার সহজ ব্যাখ্যা সহদেবদের লোকরা দিল। গোলাতে রাখা ধান চাল, আর হাঁস মুরগি চুরির ব্যাপারে গৃহস্থরা মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করে গুলি চালায়, গ্রামে এটাও কোন নতুন ঘটনা নয়।

কিন্তু রমেশদের বাড়ির সদর দরজা কে ভাঙল? সেটার সদুত্তর কেউ দিতে পারল না। ক্ষীণ সূত্রে জানা গেল, মৃতদেহগুলো যখন পুড়ছিল তখন গ্রামের কিছু লোক রমেশদের বাড়ির লোকদের ডাকবার জন্যে ও কাজ করে থাকতে পারে।

পুলিশ ঝঘের মত লাফিয়ে পড়ল রমেশের ঘাড়ে। অসহায় অবস্থায় একা রমেশ সব কথা অস্বীকার করেছিল, কিন্তু শেষের দিকে অসহ্য জেরার চাপে নিজের ঘাড়ে দোষ নিল।

বিচার চলল, রমেশ আশা করেছিল যাদের ও সম্পত্তি দেখাশোনা করার ভার দিয়েছে তারা অন্তত এগিয়ে এসে সাক্ষ্য দেবে, সত্যি কথা বলবে।

মিথ্যেকে সত্যি বলে মেনে নিতে রমেশ যেমন বাধ্য হয়েছিল সুচতুর জেরার ফলে, ঠিক তেমনি রমেশের সম্পত্তির লোভের বশবর্তী হয়ে রমেশের ঐসব জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সত্যিকে চাপা দিল মিথ্যের ধামা দিয়ে।

রমেশের ফাঁসির হুকুম হল। নিশ্চয়ই এতদিনে রমেশের ফাঁসিও হয়ে গেছে। □

অতীন ঘোষ

সুকন্যা

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

সরাইখানার গায়িকা

বার রেস্টুরেন্টের গায়িকাদের সম্পর্কে সাধারণের একটা বিরূপ ধারণা রয়েছে। তাঁরা যেন এক নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা। অথচ শিক্ষায়, চিন্তাভাবনায় পরিশীলিত জীবনবোধে তাঁরা যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, তারই পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রতিবেদনে। কলকাতার নামকরা কয়েকটি বার, রেস্টুরেন্টের সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিত্তিতে রচনাটি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।



পুজোর বাজার কোথায় করবেন ?

পুজোর বাজার করা এক সাংঘাতিক সমস্যা। সকলেই এই সমস্যা নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতায় কোন দোকানে কেমন জিনিস পাওয়া যায়, কী করে সহজে আপনি পুজোর বাজার করতে পারবেন তারই খোঁজ-খবর পরিবেশন করা হচ্ছে বর্তমান রচনাটিতে। আশা করি এতে আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে।

কুমারটুলির প্রতিমারা

আমাদের পুজো-উৎসবে আনন্দের যোগানদার কুমারটুলির মৃৎশিল্পীরা। এই মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বহু মহিলা শিল্পী আছেন, যাঁদের একমাত্র রোজগার প্রতিমা তৈরি করা। জনসাধারণকে আলো-ঝলমলে আনন্দঘন মুহূর্ত উপহার দিতে গিয়ে তাঁরা অন্ধকার ঘরে কীভাবে অর্থাভাবে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তারই করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায়।

এম. পি. জায়া ঃ জয়া বচ্চন

চলচ্চিত্রাভিনেতা এম. পি. অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চন সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠেছেন তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তায়। দীর্ঘ একটি আন্তরিক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর জীবনের নানা কথা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, স্বামীর অভিনয় জীবন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন!

বন্দর থেকে সাগরে

মঞ্জু দে-র বহুমুখী কর্মমুখর জীবনের পরবর্তী অংশ। সিনেমা থেকে থিয়েটার হয়ে যাত্রাজগতে তাঁর স্থিতির ইতিহাস।

এ ছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনা

ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা-৭২

আহসান হাবীব ঃ তোমাকে শেষ প্রণাম, হে কবি

কোন কোন মৃত্যু আছে যা বহুগুণে উজ্জ্বল জীবনের চেয়ে। সেই মহান মৃত্যুর সৌভাগ্য হয় খুব কম মানুষের। মৃত্যুর অন্ধকার ঠেকিয়ে ব্যক্তি জীবনের দীপ্তি যেসব ব্যক্তিত্বকে ভাস্বর করে তোলে, সম্প্রতি প্রয়াত কবি আহসান হাবীব তাঁদেরই একজন।

বাংলাদেশের কবিতাঙ্গনের অন্যতম প্রধান পুরুষ, আধুনিকতার পথিকৃৎ, কবি আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করলেন ১০ জুলাই, বুধবার, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর মহাপ্রয়াণে খসে পড়ল বাংলা কবিতাঙ্গনের এমন এক পুরোধা নক্ষত্র, যিনি সুপ্রাচীন দেহ ধারণ করেও অত্যাধুনিক রীতির কবিতা চর্চায় মেতে ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। চল্লিশের দশকে যে দুজন কবির নাম অন্য সব নামের ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, বরং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল সমগ্র বাংলা কবিতায়, তাঁরা ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ এবং কবি আহসান হাবীব।

কবি ফররুখ আহমদের তিরোধান হয়েছিল বেশ আগে। কিন্তু জীবনের বোধ এবং দর্শনকে কলমের অ'াচড়ে জীবন্ত করে রাখতে আহসান হাবীব বেঁচে ছিলেন ৬৮ বছর বয়স পর্যন্ত। চল্লিশের যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা এবং তৎকালীন চক্রবৃদ্ধি বিনষ্টির মাঝখান থেকে জন্ম নিয়েছিলেন অজাতশত্রু এই কবি। বস্তুকে ধারণ না করে তিরিশ চল্লিশের অধিকাংশ কবিই যেমন ঝরাপাতার মত নিঃশেষিত হয়েছিলেন, কবি আহসান হাবীব তেমনটি হননি। তিনি কখন বিমুখ হননি প্রগতি বিশ্বাসে, যে বিশ্বাসকে তাঁর জয় করে নিতে হয়েছিল তাঁর চারপাশের মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

তিরিশের কবিদের গতানুগতিক উত্তরাধিকার বহন করেননি আহসান হাবীব। কাজী নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সুকান্তের সৃষ্ট বিপরীত ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন তিনি নিজেকে। আহসান হাবীব যদিও রৌদ্রস্নাত বাংলা কবিতার প্রধান ধারার সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু আপন অস্তিত্বকে কখনও কোথাও ম্লান হতে দেননি তিনি।



আহসান হাবীব, মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা আগে

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ৯টি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। প্রথম গ্রন্থ 'রাত্রি শেষ' (১৯৪৭) আর শেষটি 'প্রেমের কবিতা' (১৯৮১)। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ৪টি উপন্যাস তাঁর। এ ছাড়াও আছে ছোটদের জন্যে একাধিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কবিতা, যা গ্রন্থবদ্ধ করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি বরিশালের শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি। স্কুলে পড়াকালেই তাঁর কবিতা লেখার শুরু। কলেজে পড়বার সময়ে আর্থিক কারণে আহসান হাবীব কলকাতায় পাড়ি দেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক তকবির' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন তিনি। পরবর্তীকালে শহর কলকাতায় দৈনিক আজাদ, দৈনিক কৃষক, মাসিক সওগাত, দৈনিক ইত্তেহাজ ও আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি করেন তিনি ভারত বিভক্তি পর্যন্ত।

ঢাকার অন্যতম রুচিশীল দৈনিক কাগজ 'দৈনিক বাংলা'-র সৃষ্টিকাল থেকেই তার সাহিত্য সম্পাদক নিযুক্ত হন আহসান হাবীব এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, দু'যুগের অধিক কাল ধরে সে কাজেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি আহসান হাবীব ছিলেন এমন এক নির্মোহ ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যক্তিত্বকে সমালোচনা করেন এমন লোকের খোঁজ পাওয়া ভার।

কবি শামসুর রাহমান আহসান হাবীব সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমরা যারা সাহিত্য-চর্চা করি, সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী, তারা আজ শোকার্ত। কেননা, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে এমন এক ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম।' শামসুর রাহমানের ভাষায়, 'কবি আহসান হাবীব ছিলেন আধুনিকতা, প্রগতি ও কল্যাণের সপক্ষে। যা কিছু সুন্দর তার প্রতি ছিল তাঁর দুর্মর আকর্ষণ।...সব চেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন তারুণ্যের অনুরাগী। বার্ধক্য ক্রমান্বয়ে দখল করে ফেলেছিল তাঁকে, কিন্তু একজন তরুণকে লালন করেছিলেন তিনি মনের ভিতর।'

সাহিত্য জীবনে প্রচুর স্বীকৃতি পেয়েছেন আহসান হাবীব। পাকিস্তান আমলে আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখক সংঘ পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কার, আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, পদাবলি পুরস্কারসহ আরও অসংখ্য স্বীকৃতি। বোধকরি কবি আহসান হাবীবই একমাত্র সাহিত্যিক, বাংলাদেশে যিনি তাঁর জীবদ্দশায় সর্বাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রসঙ্গটি আজ সবার মধ্যে আলোচিত, তা হল ব্যক্তি আহসান হাবীব। একেবারে নির্মোহ ছিলেন তিনি। দিনের অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন ডি আই টি রোডের 'দৈনিক বাংলা' ভবনের ছোট্ট ঘরটিতে। সমকালীন বাংলাদেশি কবিদের 'কবির লড়াই'য়ে তাঁর অনুপস্থিতি ছিল শেষ পর্যন্ত। বাংলাদেশে আজ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি, তাঁদের অধিকাংশই 'দৈনিক বাংলার' সাহিত্য-সম্পাদক আহসান হাবীবের কাছে সৃজিত। এক কথায় তিনি ছিলেন নির্জন পরবাসের এমন এক কবিতা কর্মী, য'ার তুলনা সমকালীন বাংলাদেশে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ আহসান হাবীবের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন গভীরভাবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং বর্তমানে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেছেন, 'আত্মমর্যাদাবোধ এবং সততার জন্য শুরু থেকে এই বিরল কবি এবং মানুষটিকে আমি মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করেছি।' প্রবীণ কবি আবুল হোসেন বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মৃত্যু আমার জন্য বয়ে এনেছে মর্মান্তিক শোক। কেননা, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ এবং আমি লিখতে শুরু করেছিলাম একসাথে, এক ধারায়।'

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান বলেছেন, 'সবাই জানেন আহসান হাবীব অত্যন্ত চিমা লয় এবং নিম্নস্বরের কবি। কিন্তু আসলে তিনি এই পৃথিবীর মতই সর্বংসহা এবং ধূমায়িত অগ্নিগিরি।' কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেছেন, 'তাঁর মৃত্যুর পূর্বদিন বিকেলে হাসপাতালের রোগশয্যায় কিছুটা সময় আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে কাটাবার যে সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তাঁর নিষ্প্রাণ শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এ মুহূর্তে সেই শেষ দেখার স্মৃতি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি।'

বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই কবির দেহকে শুইয়ে রাখা হয়েছে বনানী গোরস্থানে, ১০ জুলাই বিকেলে। অগণিত ভক্তের উপহার দেওয়া ফুলের মালায় ভরে গেছে চিরনিদ্রায় শায়িত কবির কবর। □

ঢাকা থেকে হারুন হাবীব

ফটো ঃ নাসির আলী মামুন

রানাঘাটে মস্তানদেরও নিরাপত্তা নেই, সাধারণ মানুষ তো কোন ছার !

রানাঘাটে সাধারণ মানুষ তো নয়ই, জবরদস্ত মস্তান থেকে উঠতি মস্তান—কারুর নিরাপত্তা নেই। এ এক নেশা। রানাঘাটের মস্তানরা খুনের নেশায় মাতোয়ারা। রক্তের স্বাদ যতই নোনতা হোক, মস্তানদের পিপাসা মেটে না।

রানাঘাটের লোক বলে, এখানে মাটি খুঁড়লে হয়ত মৃতদেহ পাওয়া যাবে। গত সাত বছরে যে কত খুন হয়েছে কেউ বলতে পারে না। পুলিশ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনসাধারণ কেউ বলতে পারে না। শুধু মস্তান খুন হয়েছে প্রায় ষাটজন। লোকে মুখে মুখে নিহত অন্তত পঁচিশজন মস্তানের নাম বলতে পারে। অনেক মস্তান তার নিজের বিশ্বস্ত সাকরেদের হাতে খুন হয়েছে।

কিন্তু কেন এমন হল ? মস্তানরা মদত পায় কোথা থেকে ? কে বা কারা এদের এই অভিশপ্ত জীবনে টেনে আনল ? কেন ওরা জীবন নিয়ে জুয়া খেলে ? হঠাৎ মস্তানদের কেন এত মতিগতি ? রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী ?

রানাঘাটে ঘুরে সারাদিন যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের অর্ধেকের বেশি লোক বলেছে রানাঘাটে সমাজবিরোধীদের মদত দেয় কংগ্রেস। বেশির ভাগ সমাজ-বিরোধীই কংগ্রেসের আশ্রিত।

এটা তো রানাঘাট নয়, সব জেলাতেই কংগ্রেসের চার-পাঁচটা গোষ্ঠী। কোন না কোন গোষ্ঠী সমাজবিরোধীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু রানাঘাটে কংগ্রেসের চেয়ে সি পি আই (এম)-এর সংগঠন অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) কেন সোচ্চার নয় ?

রানাঘাট রীতিমত রহস্যময়। রানাঘাটের মানুষ সব জানে। নেপথ্য কাহিনী রোমাঞ্চকর। কেন মুখ খুলতে চান না ! যদি বা মুখ খোলেন তো নাম বলতে নারাজ। সমাজবিরোধীদের নেপথ্য নায়করা রহস্যময় পুরুষ। একজন ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও বটে। আর একজন তাত্ত্বিক, সুগায়ক, সুদর্শনও। আরও কয়েক-জন, যাঁরা রাজনৈতিক নেতা, দেশপ্রেমিক। এঁরা কথা বলেন রাজনৈতিক কায়দায়, সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে বাতচিত করেন 'কোড'-এ। জনাকয়েক পুলিশের লোক হাত মিলিয়ে চলে সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে।

রানাঘাটের সমাজবিরোধীদের সামনে প্রলোভন ছড়িয়ে দিয়েছিল ওয়াগন বোঝাই গম আর কয়লা। পুলিশের সামনে একের পর এক গম বোঝাই ওয়াগন লুঠ হতে লাগল। প্রতি সপ্তাহে কয়েক শো বস্তা গম ওঠে দু নম্বর গুদামে। একজন জবরদস্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তি—ফিফটি ফিফটি। বাজারে যা দাম তার অর্ধেক দামে গম কিনবে ব্যবসায়ীবাবু। কিন্তু পুলিশের ভাগ ? দু তরফ থেকেই কোটা পেল পুলিশের সেইসব পাহারাদাররা। বেশ চলছিল ব্যবসা।

হঠাৎ মঞ্চে নামলেন এক সুদর্শন যুবক-লিডার। লিডারের চোখের ওপর সবসময় কালো চশমার পর্দা। বেশ বড় ঘরের ছেলে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারায় কথা বলেন। একটু ইনটেলেকচুয়াল ভাব। এককালে নাকি নকশালপন্থী ছিলেন।

লিডার দেখলেন রানাঘাট দারুণ মার্কেট। বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে একটা দারুণ যোগাযোগ। ওয়াগন বোঝাই মাল—গম, চিনি, কয়লা। তার সঙ্গে অভাবী মেয়ে, ছিন্নমূল পরিবারের সোমত্ত মেয়ে। ব্যবসাটা ভাল জমবে। মেয়ে পাচারের ব্যবসা জমাতে খুব অসুবিধা নেই, কিন্তু সাকরেদ চাই। একেবারে র হলে চলবে না। ব্রেনটাকে কাজে লাগিয়ে মাল-গুলোকে দিয়ে ব্যবসাটা চালাতে হবে। নিজের মুখোশ যেমন আছে তেমনি থাকবে।

লিডার খুঁজে বের করলেন, জনাকয়েক পোড় খাওয়া নকশাল, কংগ্রেস-মার্কা জোয়ান আর সি পি আই (এম) থেকে তাড়ান কমরেড। গোড়ার দিকে সমাজবিরোধীদের আখড়া ছিল রানাঘাটের পূর্বদিকে। মস্তানদের মধ্যে তখন খুব নামডাক বরেনের। লিডার চুম্বকের মত টেনে আনলেন বরেনকে। বরেন থাকত চুনুরি পাড়ায়। দিনের বেলায় নাকি কংগ্রেস করত। আর সন্ধ্যে নামলেই আলাদা অস্তিত্ব। লিডার কিন্তু পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তে লাগলেন।



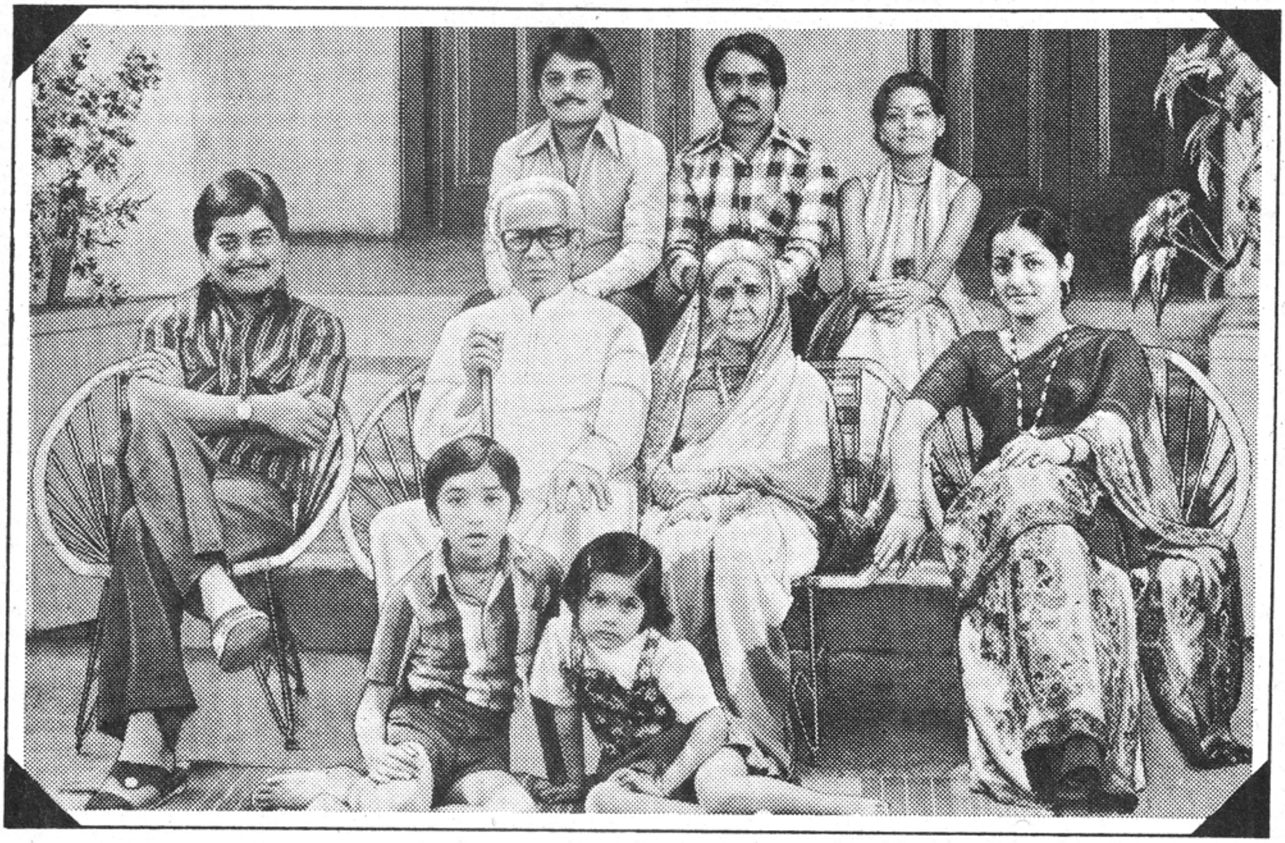
রেললাইনের ওপার থেকে মস্তানরা সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে ফেলল এপারে

বরেনের সঙ্গে গোলমাল বাঁধল এক 'সরকারের'। ওর ভাই মুকুল সরকার ছিল ডাকাবুকো ছেলে। লিডার জানত মুকুল সরকারকে তাঁবে রাখা যাবে না। বরেনকে দিয়ে কাজ হবে। কিন্তু মুকুল তো বরেনকে মাথা তুলতে দেবে না।

লিডারকে ভাবতে হচ্ছে। কাজ হাসিল করবে বরেন। কিন্তু বরেনের রাস্তা সাফ করে দিতে হবে। তখন বরেনের সঙ্গে ছিল শ্যামল। আর মুকুলের পার্টনার বাদল। পুলিশের অভিযোগ ছিল, ওয়াগন ভাঙা মাল বেচা টাকার ভাগ নিয়ে রেষারেষি শুরু হল বরেনের সঙ্গে শ্যামলের। সেই ১৯৭৮ সাল, রানাঘাট তখন উত্তপ্ত। যৌবনের লাল টকটকে রক্ত নিয়ে হোলি শুরু হয়েছে। সবসময় দাবার চাল দিতে গিয়ে লিডারের মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। রানাঘাট থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ কবির সাহেব তখন মস্তানদের যম। কবির সাহেব তার আগে অনেক ঘুঘুকে ফাঁদে ফেলেছেন।

তারই মধ্যে মুকুল সরকার খুন হয়ে গেল। লিডার দেখলেন, এবার বরেনের রাস্তা সাফ। বরেন এবার মাথা তুলতে পারবে। সত্যিই মাথা তুলল। বরেন বেপরোয়াভাবে কাজ শুরু করে দিল। ওয়াগন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চলল জোর করে চাঁদা তোলা, ব্যবসায়ীদের রিভলভার দেখিয়ে টাকা আদায় করা, বোমাবাজি নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠল। তার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি হামলা, মেয়েদের উপর হামলা। সোমত্ত মেয়ের বাপ-মার চোখে ঘুম নেই। চাপা ভারী গলার শব্দ শোনা যায়, 'মেয়েকে পাঠিয়ে দে, নইলে মায়ের ভোগে যেতে হবে। কোনটা চাস ?' কিছুদিন ধরে নতুন কৌশলে ধর্ষণ

এ ছবিতে জীবনবীমার এজেন্ট কে?-তা বলুন



আমরা নিশ্চিত জানি আপনি পারবেন না কেননা তিনি পরিবারেরই একজন

হাঁ। একজন পেশাদার জীবন বীমার এজেন্ট, বলতে গেলে, তাঁর পরিচিত পলিসিহোল্ডারদের পরিবারেরই একজন। কেননা, জীবন বীমার এজেন্ট জীবন বীমা করার, জীবন বীমা প্রকল্প থেকে নানাবিধ কর সম্পর্কে রেহাই পাবার এবং সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তুলতে নানাবিধ সুযোগসুবিধের বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শ দেন। এককথায়, যে কোন পরিবারের মুখ্য ভাবনাচিন্তার বিষয়েই আলোকপাত করেন।

এবার যখন আপনার এজেন্ট, যিনি আপনার পরিবারেরই একজন বন্ধু, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, তখন তাঁর সঙ্গে আপনি আলোচনা করে দেখবেন—কি ভাবে জীবন বীমা থেকে আপনার পরিবারের উপকার হয় এবং কি ভাবে জীবন বীমা আপনার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, কর্মজীবনে প্রস্তুতি, বিয়ে ইত্যাদির খরচ মেটাতে অথবা আপনার নিজের অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া কি ভাবে আপনার ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব ও খরচের সঙ্গে তাল রেখে জীবন বীমার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা করবেন।

আজই আপনার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
তিনি বাস্তবিকই আপনার প্রয়োজনে আপনারই বন্ধু।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
১৯৮৫-৮৬ এল. আই. সি-র এজেন্টের বছর

Pratibha-LIC-85-29 BEN

চলছে। চোদ্দ-পনের বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে বিক্ষোভ চাপা দেবার জন্য মস্তানরা বিয়ে করছে। এর মাসখানেক পরে মেয়েটিকে বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে।

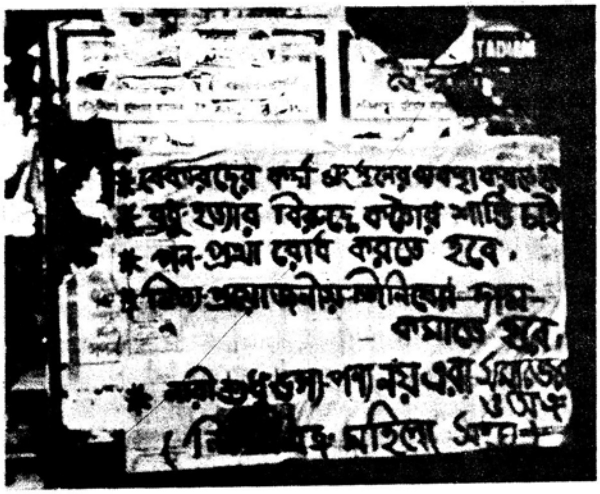
রানাঘাটে তখন দিনে-রাতে খুনোখুনি, বোমাবাজি, ছিনতাই, ছোট ছোট দোকানিদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় চলছে। পুরোপুরি সন্ত্রাস। রেললাইনের ওপার থেকে মস্তানরা সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ফেলল এপারে।

বলতে গেলে প্রতিদিন খুন, ধর্ষণ, বাড়ি থেকে রাস্তা থেকে স্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। লিডার কলকাঠি নাড়ছেন। চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই। মুকুলের পার্টনার বাদল মাথা তুলছে, বরেন হুঁশিয়ার। বাদল তখন কংগ্রেস ছেড়ে বামফ্রন্টের একটি শরিকদলে আশ্রয় নিয়েছে। সেই বাদলকে একদিন পার্টি অফিসের ভিতরে খুন করা হল।

এবার পুলিশের চোখকে আর ফাঁকি দিতে পারলেন না লিডার। পুলিশের ভয়ে বরেন রানাঘাট ছাড়লেন এটাও লিডারের [illegible] কিছু লোক রানাঘাটে থেকে অ্যাকশান কর আর কিছু লোক [illegible] ওপর পুলিশের কড়া নজর [illegible] ঢাকা দাও। তবে হাত গুটিয়ে বসে থেক না। [illegible] নাও, রানাঘাটে এসে অ্যাকশান করে চলে যাও।

মুকুল সরকারের লাশ পড়েছে, বাদলের রক্তে ওর পার্টি অফিসের মাটি ভিজে গিয়েছে। কিন্তু শ্যামল আছে, বিমল, কমল, অজয়…কার যে কখন পুলিশের খাতায় নাম ওঠে কেউ জানে না। যে যখন তিন-চারজন সাগরেদ পায় সেই ভাবে সে-ই রাজা, আমার ওপর টেক্কা দেনেওয়ালা কোই নেহি হ্যায় [illegible] হাজার হাজার টাকা রোজগার। কেউ চায় না অন্যে ভাগ বসায়। পুরো টাকা আমিই নেব।

কিছু শত্রু শেষ করতে গেলে জান-কবুল করতে হয়। সব মস্তানই জান-কবুল করতে এগিয়ে গিয়েছে। জান দিতে হয়েছে মস্তানদের। তবু সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। রানাঘাটে [illegible] কয়েকজন অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীর কাছে



মহিলা সংঘের পোস্টার। ফটো : লেখক

শুনছিলাম, রানাঘাটের মস্তান কাহিনী।

তারপর কী হল? রানাঘাট সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য, সোনার খনি। আর সাধারণ মানুষের পক্ষে পূর্বাঞ্চলের চম্বল। বলতে হবে না, মদত সবাই দিয়েছে। সর্বত্র অভিযোগ, শ্যামল ও বরেনকে দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল মদত দিয়েছে। আর পুলিশ? হ্যাঁ, পুলিশের একদল রানাঘাটকে মস্তানমুক্ত করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভূত ছিল সর্ষের মধ্যে, আজও আছে। পুলিশের লোক মস্তানদের মেসেজ পাঠিয়ে দিত, গা ঢাকা দাও। তবে পুলিশের সেই লোকেরাও বেইমানি বরদাস্ত করত না। মাসে বিশ হাজার একজন দিতে রাজি। কিন্তু আর একজন তিরিশ হাজার টাকা দিলে কী হবে? চূর্ণী নদীর ধারে আগের সেই মস্তানের লাশ পড়ে থাকবে।

বরেন, শ্যামল, বিমলের মত অন্তত জনা ষাটেক পুলিশের খাতায় যারা মস্তান তারা হয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা গিয়েছে, নয়তো পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু রানাঘাটে মস্তান-দের দাপট কমেনি, মস্তানদের যেন মৃত্যু নেই। লোকে বলে রানা-ঘাটের মস্তান হল রক্তবীজের ঝাড়।

পুলিশের একজন অফিসার কথায় কথায় বললেন, জানেন বরেন বলত আমাকে যে মারবে সে এখনও জন্মায়নি। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে যা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে বরেনকে মেরেছে ওর সাগরেদরা। যাকে বলে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। বিয়ে করে বরেন থাকত পায়রাডাঙায়। সেদিন ওর বউ-এর সাধ। মিষ্টি কিনতে



রানাঘাট স্টেশন

স্টেশনে গিয়েছিল। ওর সাগ-রেদরা খুন করল বরেনকে। ঠিক তার সাতদিন আগে শ্যামল মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। বরেন নাকি শ্যামলের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিল, রাজনীতিতে নামার ইচ্ছে ছিল।

রানাঘাট ১৯৮৩ আর ৮৪ সালে পুরোপুরি মস্তানদের কবলে চলে গিয়েছিল। যখন তখন বোমাবাজি চলছে। রিভলভার উঁচিয়ে ব্যবসায়ীর গদিতে, দোকানে, বাড়িতে ঢুকে গৃহস্থকে মোটা টাকা দিতে বাধ্য করেছে। চিঠি দিয়ে শাসিয়েছে, তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দাও, নইলে চূর্ণী নদীর ধারে লাশ পড়ে থাকবে। বহু লোক [illegible] বাঁচাতে বাস তুলে দিয়ে রানাঘাট থেকে। সন্ধ্যের আগেই দোকানপাট বন্ধ, রাস্তার ধারে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। মেয়েদের স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ। মেয়েরা যেন বাপ-মার যন্ত্রণা। কখন কার মেয়েকে কোন কৌশলে তুলে নিয়ে যাবে কেউ জানে না। কার লাশ কখন পড়বে কেউ জানে না।

রানাঘাট একটা বড় মোকাম। গ্রামের লোকের কাছে রানাঘাটই হল কলকাতা। ছোট ছোট দোকানি আগে মাল কিনতে আসত রানাঘাটে, এখন কম আসে। পাই-কারি বিক্রেতারা সাহস পান না আসতে। লরি থামিয়ে তোলা আদায় হয়, বাস-ট্রেন থেকে হাজার লোকের মাঝখানে ব্যবসায়ীকে পেটান হয়েছে।

সবার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। আবার অনেকেই বলে-ছেন, মহকুমা শাসক কান্তাপ্রসাদ সিনহা কঠোর হয়েছেন বলেই রানা-ঘাটের পুলিশ মস্তানদের সঙ্গে মাখামাখি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, মস্তানরাও আগের মত প্রতিদিন অবাধে রাজত্ব করতে পারছে না। কিন্তু রানাঘাট মস্তানমুক্ত নয়। এটা কি সম্ভব? সম্ভব হত যদি সব রাজনৈতিক দল, সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, দোকানি, ব্যবসায়ী শিক্ষক ছাত্র সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। অথচ কোন পাড়া নিরাপদ নয়। স্থানীয় এম এল এ এবং সি পি আই (এম)-এর প্রভাব-শালী নেতা গৌর কুণ্ডু সব সময় পুলিশের রিভলভারধারী দেহরক্ষী নিয়ে চলেছেন। গৌরবাবুর সঙ্গে

রানাঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওঁর একটা বিবৃতি চেয়েছিলাম। লিখিতভাবে কিছু বলতে রাজি হননি। এমন কী ফটো তুলতে অনুমতি দিতেও রাজি হননি।

কংগ্রেসের বিনয় চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিবচন্দ্র পাল এবং রানাঘাট কোর্টের আইনজীবী মিলন সরকার, দিলীপ চ্যাটার্জি এবং ধীরেন বসাকের সঙ্গে কথা বলেছি।

রানাঘাট বহুদিন থেকে একটা পুরনো ব্যবসাকেন্দ্র। পাওয়ার-লুম চলে কয়েক হাজার, তা ছাড়া আড়ৎদারি ব্যবসা। আগে গ্রামের লোক যদি শুনত অমুক রানাঘাট গিয়েছিল তাহলে তাকে দেখবার জন্য ভিড় জমে যেত। হ্যাঁ গো অমুকের পো নাকি রানাঘাট গিয়েছিল? সত্যি নাকি গো! কদিন ছেল্যো, কেমন তারা ছেইলে গো!

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে রানাঘাটের অনেক ছবি এঁকেছেন। রানাঘাটের কথা মনে হলেই বিভূতিভূষণের সেই আদর্শ হিন্দু হোটেল-এর ছবিটা ভেসে ওঠে। স্টেশনের সামনে যাত্রীদের হোটেলের লোকদের টানাটানি…।

আজকের রানাঘাট বিভূতিভূষণের সেই রানাঘাটের ছবি তছনছ করে দিয়েছে। রানাঘাটের মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। সি পি আই (এম), কংগ্রেস, আর এস পি, সি পি আই সব দল অনেকের হিসাবে শক্তিশালী। কিন্তু কোন দল আজ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয় কিংবা সমাজবিরোধীদের সুস্থ জীবনযাত্রার পথে টেনে আনতে



ধীরেন বসাক • ফটো • লেখক



শিবচন্দ্র পাল

আগ্রহী নয়। বরং যে দল পারছে সমাজবিরোধীদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করতে মস্তানদের উসকে দিচ্ছে। নিজেদের হাত নোংরা করতে চায় না।

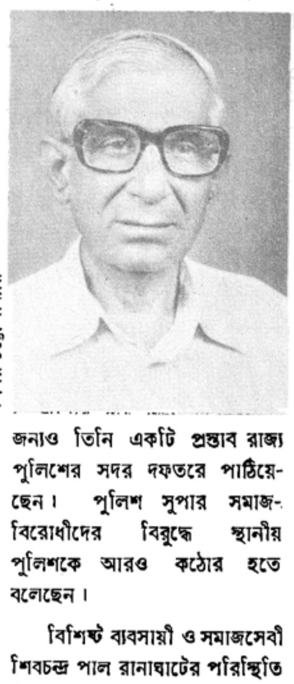
রানাঘাটে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু কংগ্রেসের মধ্যে নয়, সি পি আই (এম)-এর মধ্যেও যথেষ্ট। প্রত্যেকটি লোকাল কমিটিতে গোলমাল। এক নেতার ভয়ে আর এক নেতা রানাঘাট ছেড়ে কৃষ্ণনগরে ঠাঁই নিয়েছেন। রানাঘাটের লোক জানে রানাঘাট পুরসভায় কী চলছে, রানাঘাট কলেজে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে কোন নেতার মদতে?

তবু রানাঘাটের লোক মুখ খুলতে পারে না। মুখে কুলুপ আঁটা। সমাজবিরোধীদের এত দৌরাত্ম্য তবু কোন প্রতিবাদ নেই, কোথাও কোন দেওয়াল লেখা চোখে পড়েনি। সারা শহর কর্মচঞ্চল। কিন্তু তারই মধ্যে আছে ধিক্কার। ধিক্কার সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে যত না তার চেয়ে বেশি নেতা, সমাজসেবী আর জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ আর বিশ্বাস করে না যে, শুধু কংগ্রেসীরা সমাজবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক। ক্ষমতাসীন দল, পুলিশ, প্রশাসন কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ?

রানাঘাট কোর্টে গিয়ে দেখলাম দেয়ালে লেখা পোস্টার—মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। দেওয়ালে পোস্টার: 'বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, বধূহত্যার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি চাই, পণপ্রথা রোধ করতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমাতে হবে, নারী শুধু ভোগ্য পণ্য নয়, সমাজেরও অঙ্গ। —নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ।'

রানাঘাটে ১৯৮১ থেকে সমস্ত রকম অপরাধ বেড়ে গিয়েছে। বহু অপরাধের কোন রেকর্ড পুলিশ খতিয়ানে নেই। যেসব নিখোঁজ ব্যক্তির হদিশ মেলেনি বা পুলিশের গুলিতে কিংবা লক আপ-এ মারা গিয়েছে তাদের খুনের খতিয়ানে নাম নেই। তা সত্ত্বেও অপরাধের ক্ষেত্রে রানাঘাট সর্বকালীন রেকর্ড করেছে—চার বছরে মোট অপরাধ তিন হাজার একশো তেষট্টি। এর ভেতর খুন ১১৮, ডাকাতি ৩০, রাহাজানি ৫৮, দাঙ্গাহাঙ্গামা ৩৮২, চুরি ১৫৫৭ এবং অন্যান্য অপরাধ ৭২৫।

জেলার পুলিশ সুপার দীপক কুমার সিংহ রানাঘাটে অবিলম্বে আর একটি থানা এবং আড়ংঘাটা ও গাংনাপুরে দুটি পুলিশ ফাঁড়ির জন্য সুপারিশ করেছেন। তাছাড়া পুলিশের সংখ্যা বাড়ানর



বিনয় চট্টোপাধ্যায়

জন্যও তিনি একটি প্রস্তাব রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে পাঠিয়েছেন। পুলিশ সুপার সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশকে আরও কঠোর হতে বলেছেন।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শিবচন্দ্র পাল রানাঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে বললেন, 'আজকাল খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই খুন আর খুন; যেন সন্ত্রাসের রাজত্ব। কোন অঞ্চলকেই আজ নিরুপদ্রব বলা যায় না। সবাই দিশাহারা, কী প্রশাসন, কী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কী সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি—সকলের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। যা সুস্থ সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বর্তমানে মহকুমা শাসকের কর্মদক্ষতায় রানাঘাটে কিছুটা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। মহকুমা শাসক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

'তবে আজকের একশ্রেণীর যুবকের বিপথগামী হওয়ার মূলে রয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে এই অবস্থা চলতেই থাকবে। তবে আমরা স্থানীয় নাগরিক এবং ব্যবসায়ী মহল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছি।'

কংগ্রেস নেতা বিনয় চট্টোপাধ্যায় খোলাখুলিভাবেই বলেছেন, 'রানাঘাটের সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। অবাধে ছিনতাই চলছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। এর প্রতিকার কী? নাগরিক কমিটি বা সর্বদলীয় কমিটি গড়ার কোন চেষ্টাই হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠীর একটা ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা কোন তৎপরতা দেখাচ্ছেন না। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশেষ করে রানাঘাটের ব্যবসায়ীরা নানা ভাবে সমাজবিরোধীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে তা উদ্বেগজনক।'

আইনজীবী ধীরেন বসাক, মিলন সরকার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি একই কথা বলেছেন, দায়ী করেছেন পুলিশকে। 'সাট্টা, জুয়া মদ ছেয়ে গিয়েছে। দিনের বেলায় বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করে টাকা পয়সা দিতে বাধ্য করছে। কারুর কোন নিরাপত্তা নেই।'

নিরাপত্তা নেই গোটা রানাঘাটে স্থানীয় এম এল এ এবং সি পি আই (এম)-এর প্রভাবশালী নেতা গৌর কুণ্ডুর পাড়াতেই কি নিরাপত্তা আছে? গৌরবাবুর মত রাজনৈতিক দলের নেতা ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তি নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া চলাফেরা করতে ভরসা পান না।

মাঝে মাঝে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পুলিশকে নির্দেশ দেন, কঠোর হাতে সমাজবিরোধীদের দমন করুন। আগে রানাঘাটের মানুষ এসব নির্দেশের খবর শুনলে বুকে বল পেতেন। এখন আর না আঁচালে বিশ্বাস করেন না। রানাঘাটে পূর্ণিমাতেও যেন অন্ধকার মনে হয়। কে জানে কবে রাত ভোর হবে! ☐

বিশেষ প্রতিনিধি

ফটো: সংগৃহীত

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুভোঠাকুর চলে গেলেন

কমল মজুমদারের পর, এই শহর কলকাতার শেষ রঙিন মানুষটি চলে গেলেন গত ১৬ জুলাই ভোরে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রখ্যাত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক কলাসমালোচক ও শিল্প সংগ্রাহক সুভোঠাকুরের পোশাকী নাম—[illegible]নাথ ঠাকুর। জন্ম জোড়াসাঁকোয় ১৯১২ সালে। পিতা—[illegible]নাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের [illegible]।

ছেলেবেলা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গুরুগম্ভীর পরিবেশেই কাটে তাঁর। পড়াশোনার মতিগতি বরাবরই কম ছিল। জোড়াসাঁকো হাইস্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, স্কটিশ চার্চ স্কুল, রাণী [illegible] তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। পরে ভর্তি হন [illegible] আর্ট কলেজে। তার পরই [illegible] চলে যান। যদিও [illegible] পরেই ফিরে আসেন। কারণ [illegible] পত্তন হয় সেই সময়।

[illegible] সেই ছেলেবেলা থেকেই। প্রথম বই—মঞ্জরী ১২ বছর [illegible] ফসল। আর্ট কলেজে পড়ার সময় তিনি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ([illegible]-এর পত্রিকা নয়)। সেই সময়ের কবিতার বই—'[illegible] ও পিকো', '[illegible]', 'অলাতচক্র' প্রভৃতি। [illegible] কবিতার বই—'[illegible]'। পদ্যে [illegible] আদি-[illegible] চতুরঙ্গ ছাড়াও '[illegible]' একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে [illegible] 'মায়ামৃগ' [illegible] (মাসিক বসু[illegible] বই আকারে প্রকাশ [illegible] কিছু পরবর্তীকালে ইংরেজিতে তর্জমা হয়েছিল [illegible] উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি [illegible] একটি আর্ট [illegible] অঙ্গসজ্জা, [illegible] এককথায় [illegible] জগতে এক [illegible]। তিনি একটি উপন্যাস লেখেন, নাম 'নীলরক্ত লাল হয়ে গেল।'

একসময় ছবি এ'কেছিলেন অনেক। আর্ট কলেজে ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং চারুবাবুর কাছেই তার হাতে-খড়ি। বিলেত থেকে ফিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে আঁকতে শুরু করেন। এরপর ডিজাইন সেন্টারের ডিরেক্টর ছিলেন কিছুদিন। ভারত সরকারের হয়ে ১৯৫৪ সালে ভারতীয় শিল্প-সম্ভার নিয়ে ইউরোপে যান প্রদর্শনী করতে।

তবে শিল্প সংগ্রাহক হিসেবে তাঁর নাম সারা পৃথিবীব্যাপী। আর্ট ডিলার হিসাবে, পৃথিবীর শিল্প সমঝদারদের তিনি একজন। তাঁর সংগ্রহের তালিকায়—দোয়াত, পাইপ, কলম, ছাইদান, ক্রিস্টাল বা কাঁচের জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ। বিশেষ করে শাল এবং শাড়ি। বাংলার বালুচরীকে তিনিই বিদেশের বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়েছিলেন। বালুচরী ছাড়াও 'ডোকরা'কেও তিনি জন-প্রিয় করেছিলেন। আর ছিল বিভিন্ন লোকশিল্পের সংগ্রহশালা। ছিল কালীঘাটের পট, ড্যানিয়েল ছবি, গরানহাটার ছাপাই শিল্প, সমকালীনদেরও কিছু চিত্রকর্ম। সব মিলিয়ে তাঁকে ঘিরেই ছিল তাঁর চলমান সংগ্রহশালা।

এতকিছু কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তিনি ছিলেন ভীষণ বোহেমিয়ান, অদ্ভুতরকম রোমান্টিক। সাদা-দাড়ি, মেরুন জোব্বা আর গেরুয়া পাঞ্জাবিতে রবীন্দ্রনাথ মনে হলেও মানসিকতায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির 'কালাপাহাড়'।

আর মনটা ছিল সহজ সরল শিশুর মত। আন্তরিকতায় কখনও বা পিতার মত।

বর্তমানে আপনজন বলতে তিন ছেলেমেয়ে—সিদ্ধার্থ, সুন্দরম, চিত্র-লেখা আর অসংখ্য বন্ধুবান্ধব।

একদা সুভোঠাকুর লিখেছিলেন—

'টেনিসের বল যেন আছড়ে চলি,
আমরা যাহাকে হায় বরাত বলি
তাহারই র‍্যাকেটখানা
বারে বারে দেয় হানা—
মাটিতে আছড়ে মারে কানটা মলি।'

শিপ্রা আদিত্য

স্বাস্থ্য

আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল

শরীরকে রোগমুক্ত এবং সুস্থ রাখার একটি সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি হল আকুপ্রেসার থেরাপি। তিন হাজার বছর আগে ভারতের মাটিতেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল। আর আজ, বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশেই এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুত্থান ঘটানর সমস্ত কৃতিত্বই চীন এবং ভারতের।

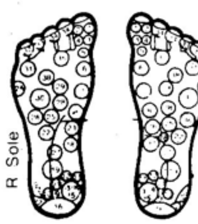
শরীরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ অব্যাহত রাখে। ফলে শরীরে কোন ব্যথা-বেদনা বা উপসর্গ দেখা দেয় না।

আকুপ্রেসার থেরাপি সব থেকে ভাল ফল দেয় যখন তা পায়ের পাতায় প্রয়োগ করা হয়। কারণ, পায়ের পাতায় রয়েছে আটত্রিশটি স্নায়ুমুখ—যার সঙ্গে দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির সংযোগ রয়েছে।

এই আকুপ্রেসার থেরাপির



Price Rs.89.95



ACUPRESSURE THERAPY HEALTH CENTRE
74, Park Street, Calcutta-700017.

মানব শরীর পাঁচটি মৌল উপাদানে গঠিত। বায়ো ইলেক্ট্রি-সিটি—একটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ হাতের তালু ও পায়ের পাতা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানব শরীরের এই পাঁচটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন এই তরঙ্গ শরীরের কোন বিশেষ অংশে গিয়ে পৌঁছয় না, তখনই শুরু হয় যন্ত্রণা এবং দেখা দেয় নানারকম উপসর্গ। আকুপ্রেসার থেরাপি এই রোগে এনে দেয় নিরাময়। বিশেষ কয়েকটি স্নায়ুমুখের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই থেরাপি সারা

ওপরই ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছে আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল। এটি পায়ে দিয়ে যখনই হাঁটবেন তখনই এ দারুণ কাজ দেবে। পায়ের মাপ অনুযায়ী তৈরি এই স্যাণ্ডাল পায়ের পাতায় স্নায়ুমুখগুলোকে ম্যাসাজ করার কাজ করবে। দিনে দুবার, সকালে এবং বিকেলে মাত্র ৭-৮ মিনিট এই স্যাণ্ডাল পরে চলাফেরা করলেই কাজ হবে। আকুপ্রেসার স্যাণ্ডাল স্নায়ুকে রাখবে সুস্থ, সবরকম পরিশ্রম ও উত্তেজনা থেকে দেহকে মুক্ত রাখবে। রক্ত সঞ্চালন ও হজম শক্তিকেও বাড়িয়ে তুলবে।

উদয়শংকর স্কুল অব ড্যান্স অ্যাণ্ড মিউজিক-এর অনুষ্ঠান

শিবপুরের 'উদয়শংকর স্কুল অব ড্যান্স অ্যাণ্ড মিউজিক'-এর বয়স এখন সাতাশ। প্রতিষ্ঠাতা অচ্যুতনারায়ণ ছিলেন উদয়শংকরের শিষ্য। উদয়শংকরের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যধারা এখনও যাঁরা বয়ে নিয়ে চলেছেন অচ্যুতনারায়ণ তাঁদের অন্যতম।

উদয়শংকরের নৃত্যধারা সম্পর্কে একদা কিছু অ-বিজ্ঞজন প্রচার করেছিলেন তাঁর স্টাইল নাকি নেহাৎই অশাস্ত্রীয়, ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যধারার সঙ্গে যোগসূত্রহীন। এ কথা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ তাঁর সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা, এবং আজও উদয়শংকর নৃত্যরীতির উত্তরসূরীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন।

নৃত্যশিল্পী অচ্যুতনারায়ণ দীর্ঘদিন উদয়শংকর স্যান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানটিও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সুপরিচিত।

'উদয়শংকর স্কুল অব ড্যান্স অ্যাণ্ড মিউজিক' গত ১১ আগস্ট '৮৫-তে শিবপুর ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হল-এ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৯০ জন শিল্পী। সবাই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী।

প্রথম অনুষ্ঠান ছোটদের 'প্রণাম'। তারপর দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে (হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে; এবং বিপদে মোরে রক্ষা করো···) বৃন্দনৃত্য।

'প্রকৃতি' অনুষ্ঠানটি ছিল ছয় ঋতুকে ঘিরে। সুগীত রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল একগুচ্ছ। এই সমবেত নৃত্যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখালেন যে তিনজন, তাঁরা হলেন শর্মিলা অধিকারী, সুমনা মুখার্জি এবং পল্লবী ব্যানার্জি। শর্মিলার সদা হাস্যময় মুখভঙ্গিমা প্রতি নৃত্যেই তার নিজস্বতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তেমনই সুমনা মুখার্জি দূর ভবিষ্যতে নৃত্যকলায় বিরল প্রতিভাদের একজন হতে পারেন সাধনা বজায় থাকলে। অচ্যুতনারায়ণ রচিত 'অস্পৃশ্য' নৃত্যনাট্যে



'কাল মৃগয়া' নৃত্যনাট্যে অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার / ফটো : তন্ময় কর্মকার

সুমনার হরিজন কন্যার ভূমিকা মনে রাখার মত। অচ্যুতনারায়ণের এই নৃত্যনাট্যটি নৃত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই উদয়শংকর ঘরানাকে বজায় রেখেছে কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু, কম্পোজিশন এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকাকে মনে পড়ায়। রাজদেউলে পুজোর আয়োজন। পুজোর ফুলের সন্ধানে চলেছে সখীর দল। এমন সময় সখী দলের সামনে পড়ে এক হরিজন কন্যা। ঘৃণায় সখীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাকে পথ ছাড়তে বলে। অপমানিতা হরিজন কন্যা ঈশ্বরকে জানায় তার আকুতি। ফুল তোলার পর সখীরা রাজদেউলে ফিরে যাবার সময় ঘটে এক অঘটন। প্রধান সহচরীর পায়ে কাঁটা ফুটল। তখন যন্ত্রণা-কাতর সখীর পা থেকে কাঁটা বার করে হরিজন কন্যা তাকে সুস্থ করে। যদিও কাঁটা বার করার আগে অন্য সহচরীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পরে তারা তাকে কাছে টেনে নেয়। এই আন্তরিকতায় হরিজন কন্যা কি ভেবেছিল যে তার অস্পৃশ্যতা কলঙ্ক মোচন হয়ে গেছে? তাই কি সে চলেছিল পুজোর অর্ঘ্য নিয়ে রাজদেউলে? কিন্তু হরিজন কন্যা পরিচয়ের জন্যে সেখানে সে অপমানিতা হয় রাজ পুরোহিতের দ্বারা। রাজ পুরোহিতের আঘাতে ভূলুণ্ঠিতা হল হরিজন কন্যা। ছত্রাকার হল তার অর্ঘ্য-থালি। কিন্তু এবার হরিজন কন্যার সহচরীর সঙ্গে ছুটে আসে রাজদেউলের সহচরীরাও। প্রতিবাদ জানায় তারা রাজ পুরোহিতের কাছে। এমন সময় আবির্ভাব হল এক সন্ন্যাসীর। তিনি শোনালেন সাম্যের বাণী।

এই সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অচ্যুতনারায়ণ অনন্য।

অচ্যুতনারায়ণের আর একটি নৃত্যাভিনয়ের কথ অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের 'কাল মৃগয়া'য় 'অন্ধ ঋষি' চরিত্রে। এই চরিত্রটির নৃত্যাভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয় সত্যিই বুঝি রামায়ণের অন্ধ মুনি এসে দাঁড়ালেন।

কাল মৃগয়াই ছিল অনুষ্ঠানের শেষ নৃত্যনাট্য। প্রদীপ দে-র দশরথের ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় অপূর্ব। ঋষিপুত্র এবং লীলার ভূমিকায় যথাক্রমে সুদীপ ব্যানার্জি এবং অর্পিতা পালের নৃত্যাভিনয় মনে রাখার মত।

অস্পৃশ্য নৃত্যনাট্যে প্রধান চরিত্র ছাড়া আর যাঁরা সুন্দর নৃত্যাভিনয় দেখালেন তাঁরা হলেন মঞ্জু মল্লিক, রীণা মিশ্র, ফাল্গুনি মুখার্জি, শিবানী ব্যানার্জি প্রমুখ। আবহসঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন অমিতাভনারায়ণ ও অরিন্দমনারায়ণ।

অরিন্দমনারায়ণের একটি একক অনুষ্ঠান 'তালবাদ্য' অপূর্ব। একসঙ্গে আটটি তবলা এবং মুখ, হাতের বিভিন্ন সুরেলা শব্দের সমাহার অনুষ্ঠানটিতে বৈচিত্র্য এনেছিল। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

'ত্রয়ী সাউথ' প্রযোজিত কমললতা

'শিমূলতালি গাঁয়ে গাছের পাতা বাতাস করে মাটির শীতল ছায়ে'। পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের এই কল্পলোকের পটভূমিতেই রচিত 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। এ কাব্যের দুই প্রধান চরিত্র—মুসলমানের ছেলে সোজন আর হিন্দুর মেয়ে কমললতা। অভিন্নহৃদয় দুটি সজীব প্রাণ। জাতপাতের সঙ্কীর্ণতা উপেক্ষা করে ভালবাসে একে অন্যকে। রূঢ় বাস্তব দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও প্রেমের যূপকাষ্ঠে আত্মবলির মধ্যে দিয়ে এরা মিলনের দীপকে শাশ্বত করে তোলে। প্রেম অমরত্ব লাভ করে।

এ রচনা একদিকে প্রেমের, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। নাট্য সম্ভাবনা এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক আরও কিছু চরিত্র রয়েছে এতে। কিছু চরিত্র সংযোজিতও হয়েছে এই প্রকল্পে। তপন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় 'ত্রয়ী সাউথ' নিবেদিত এবং গত ১ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে উপস্থাপিত এই নৃত্যনাট্যের সূচনা দৃশ্যটি খুবই শিল্পরুচিসম্মত। 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' মন্ত্রে হিন্দুরা যে সূর্যকে প্রণতি জানান, মুসলমানরাও সেই সূর্যোদয়েই আজান পাঠ করেন। সোজন-কমলের ছোটবেলার মেলামেশার দৃশ্যটিও সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক। গ্রামীণ জীবনের কয়েকটি দৃশ্যও সুপরিকল্পিত। গৃহত্যাগের দৃশ্যে জনৈকা বৃদ্ধার অভিব্যক্তিটি যথার্থই শৈল্পিক।

বিপত্তি ঘটিয়েছে এই প্রযোজনার সঙ্গীত, সংলাপ ও নৃত্য। মূল কাহিনী পাঁচের দশকেরই, তবে পূর্ব বাংলার চিত্রপটে অঙ্কিত। কাব্যে তাই ওপার বাংলার সহজবোধ্য প্রচলিত ভাষাই ব্যবহৃত। সে ক্ষেত্রে নৃত্যনাট্যের গীতে ব্যবহৃত ভাষা মোটেই খাপ খায়নি। বাংলার চিরন্তন লোকসঙ্গীতের প্রাণমাতান সুর প্রয়োগ করার এমন সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে এতে যে সুর ও যন্ত্রানুষঙ্গ প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে যথাযোগ্য পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। সঙ্গীত ও সংলাপের রেকর্ডিং আরও যত্ন নিয়ে করা উচিত ছিল। গ্রামীণ পরিবেশ, স্ত্রী-আচার, ঘর গেরস্থালীর মধ্যে যে সহজ শোভন সাংস্কৃতিক উপকরণ রয়েছে তার নান্দনিক ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু নাচে বা গানে লক্ষণীয়ভাবে তেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে আরও বোঝাপড়া দরকার। মহরমের মাঠে লাঠি খেলার নৃত্যপর্বে আবহসঙ্গীতের সঙ্গে তাল বজায় রাখলে ভাল হত। নায়েব ও (বেদের) সর্দার চরিত্রের রূপায়ণে ইচ্ছাপূরণের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে। সোজন চরিত্রে কৌশিক চক্রবর্তী সার্থক হলেও কমলের চরিত্রে আরও বালিকাসুলভ সারল্য অথচ শৈল্পিক সংযমবোধ আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সমাপ্তি দৃশ্যটি যাত্রানুসারী। এমন সম্ভাবনাময় সংস্কৃতির এ হাল কেন? □

বিশেষ প্রতিনিধি

মুক্তমঞ্চ নাট্য-সংঘ নিবেদিত নাট্যোৎসব

নাটককে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এবং এ রাজ্যের নাট্য আন্দোলনকে 'গণমুখী করতে, গণতীর্থে' পৌঁছে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দশটি গ্রুপ থিয়েটার মুক্তমঞ্চ নাট্য সংঘ তৈরি করেছেন। এই দশটি দল হল মাঙ্গলিক, ক্লাস থিয়েটার, নটনাটাম, রূপিক, সংলাপ (কলকাতা), নন্দক, প্রতিকৃতি, নাট্য. কালপুরুষ নাট্য সংস্থা এবং দ্বান্দ্বিক।

গত ২৫ জুলাই প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুক্তমঞ্চের তরফে সমীর বিশ্বাস জানান, '[illegible] ওয়াল ফর্মে এখন নাটক করা হবে। যদিও পশ্চাতের দেওয়ালটাও এখন রক্ষা করছি, প্রয়োজনের তাগিদে। তবে এর থেকেও মুক্ত হয়ে একেবারে চারিদিক খোলা মঞ্চে নাটক করার চেষ্টাও আমরা চলবে।'

মুক্তমঞ্চ নাট্য সংঘের জেলাভিত্তিক নাট্য উৎসবের শুরু হল হাওড়া জেলায় গত ৩১ জুলাই, চলেছে ১ আগস্ট পর্যন্ত। উৎসব শুরু হয় হাওড়া টাউন হলে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র আলোকদূত দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাওড়ার স্বনামধন্য [illegible] ব্রজমোহন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন নাট্য সমালোচক প্রবোধবন্ধু অধিকারী, অধ্যাপক [illegible] প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সায়ক 'ফেনার [illegible]ওয়ালা মানুষ' নাটকটি পরিবেশন করেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে কলকাতার চারদিক ঘেরা মঞ্চের নাটকগুলি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল [illegible] গ্রুপ থিয়েটারগুলি এতদিন কেন এই প্রয়াসে [illegible] হননি! দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার এমন [illegible] সান্নিধ্যে নাটক সহজেই হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

[illegible] নয়, মুক্তমঞ্চ নাট্য সংঘের তরফে [illegible] দাস জানান, 'সম্পূর্ণ পেশাদারি [illegible] নিয়ে আমরা কাজ করছি। শুধু নাটক করাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় মুক্তমঞ্চ স্থাপন, নাট্য [illegible] প্রতিষ্ঠা—এসবও আমাদের লক্ষ্য। [illegible] বিভিন্ন অভিনয়ের মাধ্যমে যে [illegible] সংগ্রহ করতে পারব, তা নাট্যকর্মীদের [illegible] করে দেব। কারণ, অর্থ ছাড়া দল চলতে পারে না। তবে এর মানে এই নয় যে, আমরা গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ থেকে সরে আসছি। [illegible] থিয়েটারের কাজ যাতে আরও বেশি করে করতে পারি তারই জন্যে এই প্রচেষ্টা।' □

সুখেন দাসের মিলন আসরে

[illegible] সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের চত্বরে [illegible] জগতের নামীদামী তারকা থেকে [illegible] সকলের ভিড়। বাইরে টিপ-[illegible] ভেতরে উদয়রাজের উদাত্ত কণ্ঠে গান [illegible] মনে নেই।' খাওয়া-দাওয়া, [illegible] সমারোহ, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বিয়ের আসর। কিন্তু আসলে এক অভিনব মিলন আসর। উদ্যোক্তা সুখেন দাস ও তাঁর বন্ধু [illegible] উপলক্ষ? সুখেন দাসের পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ! আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে অনেকেই অবাক, 'এই তো সেদিনের মাস্টার সুখেন! 'দাসীপুত্র' 'লালুভুলু'-র মাস্টার সুখেনের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি?'

সদাহাস্যময় প্রাণবন্ত সুখেন দাস অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। এই মিলন আসরে কে না এসেছেন! এসেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখার্জি, মাধবী মুখার্জি, স্বরূপ দত্ত, নির্মলকুমার, কালী ব্যানার্জি, তাপস পাল, প্রসেনজিৎ, শকুন্তলা বড়ুয়া, দেবশ্রী রায়, সঙ্গীত-শিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত, পিন্টু ভট্টাচার্য, সুরকার অজয় দাস, খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্য ও বিভিন্ন চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বহুবাজারের প্রখ্যাত শ্রীনাথ দাসের বংশধর সুখেনের মাথার উপর দিয়ে সাংসারিক জীবনের নানা বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঝড় বয়ে গেছে। সুখেন জীবনের পঞ্চাশ বছরে পা দিয়ে বললেন, 'জানেন, কতদিন গেছে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে কাটিয়েছি!' কিন্তু আজ বাংলা চলচ্চিত্র যে কজন পরিচালকদের জন্য কিছু পয়সার মুখ দর্শন করতে পেরেছে, তাঁদের মধ্যে সুখেন দাস অন্যতম।

তাই সেদিনের সেই বর্ণাঢ্য মিলন আসরে উপস্থিত সকলে এবং বহু অনুপস্থিতরাও শুভেচ্ছা-পত্রের মাধ্যমে সুখেন দাসের দীর্ঘজীবন ও তাঁর কর্মজীবনের আরও সাফল্য কামনা করেন। □

সঞ্জয় সিংহ

থিয়েটার সেন্টারের 'ভাসান'

দেখতে দেখতে 'থিয়েটার সেন্টার' তিরিশটা বছর পেছনে ফেলে এল। একটা নাট্য গোষ্ঠীর কাছে এ যেমন গর্বের, তেমনই নাট্যপ্রিয় দর্শকদের কাছেও এ কম আনন্দের কথা নয়। তাঁদের এই তিরিশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে থিয়েটার সেন্টার নিশ্চয়ই কলকাতার নাট্যামোদীদের কাছ থেকে পাবেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

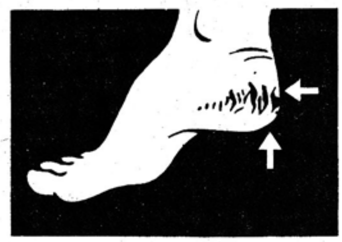
থিয়েটার সেন্টারের তিরিশ বছর পূর্তি উৎসবের শুভ সূচনা হল ১৪ আগস্ট। সেদিন রবীন্দ্র সদনে নামী একটি সিগারেট কোম্পানির সহযোগিতায় থিয়েটার সেন্টার নিবেদন করলেন তাঁদের সাম্প্রতিকতম নাটক 'ভাসান'। তিরিশ বছরে একটা নাট্যগোষ্ঠী যে নাট্য ভাবনায়, উপস্থাপনায় এবং উপলব্ধির কত গভীরে পৌঁছে যেতে পারে তার প্রমাণ থিয়েটার সেন্টারের এই সাম্প্রতিকতম নাটকটি। উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যের আঙ্গিকে 'ভাসান' নাটকের কাঠামো গড়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকটি আবর্তিত হয়েছে একেবারেই হাল আমলের ধূর্ত, লোলুপ রাজনীতিকে ঘিরে।

মালদহ শহরের কাছাকাছি কোন গ্রাম এ নাটকের পটভূমিকা। ঐ অঞ্চলেরই একটি গানের দলকে নিয়েই এই নাটক। এই দলের গম্ভীরা গান সরকারে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কারণ, গম্ভীরা গানে শিববন্দনার আড়ালে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীকেই তুলে ধরতে চায় এই দল। ফলে, সংঘাত বাঁধে গানের দলের সঙ্গে গ্রামের রাজনৈতিক পাণ্ডাদের। এই দলের কোন শিল্পী বিকিয়েও যায় রাজনৈতিক চাপের মুখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সংঘাতের ভেতর থেকে

প্রাথমিক অবস্থায় অর্শের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আরাম পেতে বিশ্বস্ত হ্যাডেনসা মলম ব্যবহার করুন-অস্ত্রোপচার না করলেও চলে!



আপনার গোড়ালিতে কষ্টকর ও বিশ্রী ফাটা?



লিচেনসা অয়েন্টমেন্টের স্নিগ্ধ পরশ নিরাপদে চটপট আরাম এনে দেয়!

এটি গোড়ালির ফাটায় বিশেষভাবে কার্যকরী। এছাড়া এই অয়েন্টমেন্ট কাটাছড়া ও ছোটখাট অভ্যন্তরীণ আঘাতেও ফলপ্রদ।

লিচেনসা অয়েন্টমেন্ট



90 BEN

উঠে আসে এমন কিছু চরিত্র, যারা আপসে বিশ্বাস করে না। মূল ঘটনার পাশাপাশি এসেছে দলের ভ্রান্ত রাজনীতিতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হওয়া সচ্চরিত্র একটি রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্রও।

নাটকটির প্রধান আকর্ষণ সঙ্গীত। প্রাচীন গম্ভীরা এবং ভাসান গান এই নাটকে এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। প্রতিটি গানই সুপ্রযুক্ত। নাটকের গতিকে বাড়িয়ে দিতে গানও যে কতখানি সহায়ক হতে পারে তার প্রমাণ বোধহয় 'ভাসান'-ই রাখল।

থিয়েটার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল, কাজেই দলগত অভিনয় তাদের ভাল হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবু এর ভেতর দোকড়ি চৌধুরী, শিবব্রত কর্মকার, তারাপদ সরকার এবং অশোক দাস-এর অভিনয় ভীষণ মন কাড়ে। তুলনায় অনেক বেশি আড়ষ্ট লেগেছে প্রণব ভট্টাচার্য, তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, মালতী দাস-কে। শেখর দাস-কে অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে। আলপনা গুপ্তা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় আগে বহুবার আমরা পেয়েছি। এখানেও তিনি আবার সেই ক্ষমতাই প্রমাণ করলেন।

সামান্য উপকরণে নাটকের মঞ্চসজ্জা অসাধারণ। বিশেষ করে ভাল লাগে দৃশ্যান্তরের পরিকল্পনাটি। তুলনায় আলো যেন অতটা মন ভরায় না।

লোকনাট্যের আঙ্গিকে এই নাটকটির রচয়িতা তথাগত চক্রবর্তী। তাঁর লেখার দোষে কিনা জানি না, তবু মাঝে মাঝে অভিনেতারা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে বলতে একেবারেই শহুরে ভাষা বলে ফেলেছেন। তবু নাট্যকারের ধন্যবাদ প্রাপ্য। কারণ, একেবারেই লোকনাট্যের আঙ্গিকে তিনি হাল আমলের সমস্যাকে সুন্দরভাবে ধরতে পেরেছেন; ধন্যবাদ আরো একজনের প্রাপ্য। তিনি সঙ্গীত পরিচালক শিবব্রত কর্মকার। সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার ছোঁয়া না থাকলে হয়ত নাটকের গতি যেত হারিয়ে।

আর সব থেকে বড় মাপের ধন্যবাদটি প্রাপ্য নাটকটির পরিচালক ও মঞ্চ-নির্দেশক দেবরাজ রায়ের। আগাগোড়া নাটকটিতে তাঁর নেপথ্য পদচারণা ও মননশীলতার ছাপ বার বারই ফুটে উঠেছে। □

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

শ্রাবণীর অনুষ্ঠান

সমস্ত ঋতুর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে সম্পর্ক আছে, তারই মাধুরী বহন করে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'শ্রাবণী' শিশির মঞ্চে শ্রাবণের প্রথম লগ্নে নিবেদন করলেন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান। মঞ্চের দু কোণে দুটি মঙ্গল কলস রজনীগন্ধার শোভায় সুসজ্জিত। পশ্চাৎপটে শ্রাবণীর লোগো এবং দুপাশে দুটি নারী মূর্তি। সব মিলিয়ে পর্দা উঠতেই সুরুচির ছোঁয়ায় মন ভরে ওঠে।

প্রথম অনুষ্ঠান শ্রাবণীর সম্পাদিকা এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সুমিত্রা সেন এবং ত্রিশজন যুবতীর সম্মেলক ৭টি রবীন্দ্রসঙ্গীত। শিরোনাম 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'। গানগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক থেকে চয়ন করা। এরপর মঞ্চে এলেন অর্ঘ্য সেন। বাছাই করা কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে শিল্পী অনুষ্ঠানটিকে গাম্ভীর্যের স্তরে উন্নীত করলেন।

বিরতির পর মূল অনুষ্ঠান নৃত্যগীতালেখ্য'প্রেমের মিলন দিনে'। প্রেমের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই নিবেদন। প্রতিটি গানই সুনির্বাচিত। গ্রন্থনাংশে সঙ্গতির সামান্য অভাব ছিল। সুমিত্রা সেনের কণ্ঠে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' বিশেষ অভিব্যক্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। শ্রীমতী সেন এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর দ্বৈতকণ্ঠে গীত 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' যথার্থ উত্তীর্ণ হয়নি। অন্যান্যদের মধ্যে নূতন মজুমদার, রীনা সাহা, দীপালি সুর, শ্রাবণী সেন, দেবনাথ চৌধুরী ও দিলীপ সরকার উল্লেখের দাবি রাখেন।

নৃত্যাংশে রেখা মৈত্র তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন এনেছিলেন। রাবীন্দ্রিক নৃত্য পরিবেশনের বিশেষত্বটি তিনি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অন্যদের মধ্যে চিররঞ্জন দাসের নাম করতেই হবে। মীনাক্ষী মুখার্জি, মলয় ভট্টাচার্য এবং মিমি বিশ্বাস নৃত্যে নিখুঁত ছিলেন।

নৃত্য পরিচালনা করেছেন রেখা মৈত্র। সঙ্গীত পরিচালনা সুমিত্রা সেনের। সহযোগী সঙ্গীত শিল্পীরা ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় মুখার্জি, কুমারেশ চন্দ, রামকৃষ্ণ পাল এবং বিপ্লব মণ্ডল।

গ্রন্থনায় ছিলেন জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু। গ্রন্থনাংশ কিছুটা দুর্বল হলেও শিল্পীদ্বয়ের আবেগ-মথিত কণ্ঠস্বরের এবং অভিনয়ের গুণে শুনতে ভাল লেগেছে।

কল্লোল ব্রহ্মচারী

সুধাসাগর তীরে

'শ্রবণী' নিবেদিত 'সুধাসাগর তীরে' অনুষ্ঠানে একক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন গোপাল পাত্র। ১৩ আগস্ট বিজন থিয়েটার হলের এই অনুষ্ঠানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ১৮টি নির্বাচিত গান গেয়ে শোনান।

প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীপাত্র কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য গান করেন না। তিনি মানসিক রোগীদের মধ্যে গানের প্রভাব নিয়েও গবেষণায় রত এবং সঙ্গীত জগতের বহু গুণী ব্যক্তিত্বের আশীর্বাদধন্য।

শিল্পীর নির্বাচিত গানের মধ্যে বর্ষাঋতুর গানের প্রাধান্য ছিল। তাঁর গাওয়া গানের মধ্যে, 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল', 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নীলাদ্রিশেখর বসুর গ্রন্থনায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রতিটি গানের রচনাকাল এবং কবি কী পরিস্থিতিতে গানগুলি রচনা করে-ছিলেন এবং গানগুলির স্বরলিপিকারই বা কে তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন। □

পরিমল চক্রবর্তী

মুখের রেখা

ফিল্মের টানে নাটকে এসেছিলাম ঃ প্রতাপ জয়সওয়াল

'নাটকে এসেছিলাম ফিল্মে হিরো হবার আশা নিয়ে। কিন্তু দু-তিনটে নাটকে অভিনয় করার পর, যখন নাটকটা সিরিয়াসলি করতে শুরু করলাম, তখন কিন্তু ওই ফিল্মের মোহটা কেমন কেটে গেল, নাটকই একমাত্র ধ্যান-ধারণা হয়ে উঠল।' তাই ব্যাঙ্কের চাকুরে প্রতাপ জয়সওয়াল এই নাটকের জন্য চাকরিতে প্রমোশন পর্যন্ত নেন না। কারণ 'প্রমোশন নিলে কর্তৃপক্ষ কলকাতার বাইরে পোস্টিং দিতে পারেন। তখন নাটক করা মুস্কিল হবে। আর নাটক না করতে পারলে আমি মরে যাব।'

বর্তমান হিন্দি নাটকের একজন দক্ষ অভিনেতা এবং বুদ্ধিমান নির্দেশক হিসাবে প্রতাপ জয়সওয়াল কলকাতার হিন্দি নাট্য দর্শকদের কাছে খুবই পরিচিত নাম। একদিন চলচ্চিত্রের গ্ল্যামারের টানে নাটক করতে এসেছিলেন, আজ কিন্তু বোম্বাই-এর হৃষীকেশ মুখার্জির মত পরিচালকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েও প্রতাপ কলকাতা ছাড়তে চাইছেন না। 'প্রথমত, সিনেমার জন্য নাটক ছাড়তে পারব না।



প্রতাপ জয়সওয়াল। ফটো ঃ সংগৃহীত

দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে বোম্বাইতে সেটল করা মুস্কিল, বিকজ আই হ্যাভ গট সার্টেন প্রবলেমস ইন মাই ফ্যামিলি।' যদিও প্রতাপ ইতিমধ্যেই একটি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন। বিপ্লব রায়-চৌধুরী পরিচালিত স্বর্ণকমল-বিজয়ী 'শোধ' ছবিতে।

প্রতাপের কাছে নাটক এখনও নেশার স্তরেই আছে। পেশা হয়ে ওঠেনি। তবু প্রতাপ একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী হিসাবে কাজ করতেই আগ্রহী। ১৯৭৫ থেকে সঙ্গীত কলামন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। এখন অবধি সঙ্গীত কলামন্দির প্রযোজিত আটটি হিন্দি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন। প্রতাপ বিশ্বাস করেন, এখনও যদি হিন্দি নাট্যকর্মীরা একত্রে কাজ করেন, তাহলে বাংলার মত হিন্দিতে আরও ভাল ভাল নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে এবং 'সমঝদার' দর্শকও তৈরি হতে পারে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন পুরস্কার পেয়েছেন কিনা? দীর্ঘদেহী প্রতাপ উদাত্ত হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, মানুষের যে ভালবাসা পেয়েছি সেটাই তো আমার পুরস্কার।' □

সঞ্জয় সিংহ

আপনার ভাগ্য

সেপ্টেম্বর ১৮ থেকে অকটোবর ১

মেষ ঃ আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ সৌভাগ্যের ইঙ্গিত। ক্ষেত্র বিশেষে সদ্‌ব্যয়। কর্মস্থলে অল্প-স্বল্প বাধা ও গুপ্ত শত্রুতার আশঙ্কা। ব্যবসায়ীদের ব্যয়-বাহুল্য ও মানসিক চাপ। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রেম প্রীতির প্রসার ঘটবে। মেয়েদের সন্তানের জন্য দুর্ভাবনা।

বৃষ ঃ আর্থিক অবস্থার আচমকা উন্নতি, কিন্তু অন্যের জন্য ভালরকম ব্যয়। কর্মক্ষেত্রে সময় অনুকূল হলেও কোন ব্যাপারে বিশেষ দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের মোটা লাভ। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা অনেকটা কমবে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য। ভ্রমণে ক্ষতির আশঙ্কা।

মিথুন ঃ আয় ও ব্যয় সমান তালে বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তর হতে পারে। ব্যবসায়ীদের অবস্থার পরিবর্তন। সাংসারিক নানান ব্যাপারে মেয়েদের দ্বারা বিশেষ লাভ। নিকটজন বিয়োগ সম্ভব। সম্পত্তি ক্রয় ব্যাপারে ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

কর্কট ঃ মোটামুটি ভালরকম আয় বৃদ্ধির যোগ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে নতুন প্রেরণা ও অগ্রগতি। ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও উত্তেজনা। পারিবারিক ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। সন্তানদের কারও কর্মসূত্রে ভ্রমণ ও লাভ। শরীর ভাল মন্দয় মিলিয়ে চলবে।

সিংহ ঃ আর্থিক অচলাবস্থা অনেকাংশে দূর হবে; বন্ধু-ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য। কর্মস্থলে মর্যাদা ও প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাভ। পারিবারিক কোন পুরনো প্রচেষ্টায় বিশেষ অশান্তি। শরীর ভাল চলবে না।

কন্যা ঃ আর্থিক ক্ষেত্রে সর্তকতার প্রয়োজন; আকস্মিক ক্ষতির যোগ। কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে বিশেষ উদ্বেগ, কারও প্রতীক্ষায় হতাশ। ব্যবসায়ীদের আইন-সংক্রান্ত ঝামেলা। সাংসারিক ব্যাপারে ভাই-বোনেদের জন্য অশান্তি। দূরের কোন সংবাদে মেয়েদের দুর্ভাবনা কেটে যাবে।

তুলা ঃ আর্থিক মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কর্মস্থলে মনের দুর্বলতা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ীদের আগের প্রয়াসে শুভ ফল। পারিবারিক কোন বন্ধুর আচরণ মর্মাহত করবে। লেনদেন কারবারীদের মোটা লাভ। অসুবিধে বাধা সত্ত্বেও মেয়েদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। শরীর মোটামুটি চলবে।

বৃশ্চিক ঃ প্রচণ্ড রকম ব্যয় বৃদ্ধি, ফলে মানসিক চাপ। কর্মস্থলে কোন সাফল্যের পথে অন্তরায় দূর। ব্যবসায়ীদের পুরনো ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের পরামর্শে সম্ভাব্য ক্ষতির আভাস। সন্তানদের কারও একগুঁয়েমিতে কর্মলাভের সুযোগ নষ্ট। শরীরের দিকে নজর দিন।

ধনু ঃ আর্থিক ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। কর্মস্থলে কারও আচরণ বিশেষ উত্যক্ত করবে। ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ অনেকটা সুগম হবে। পারিবারিক অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবার আশঙ্কা। সন্তানদের কারও ভাল বিবাহযোগ। মেয়েদের তীর্থভ্রমণ বা দীক্ষাদি। শরীর ভাল চলবে।

মকর ঃ অতিরিক্ত লাভের প্রচেষ্টায় বড় রকম ক্ষতি হতে পারে। কর্মস্থলে স্বীয় প্রচেষ্টায় কোন পরিবর্তন বা বদলি সম্ভব। ব্যবসায়ীদের সময় এখনও প্রতিকূল। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের মতামতকে প্রাধান্য দিলে নিজের ক্ষতি। স্ত্রীর পরামর্শে, সহযোগিতায় কোন সম্পত্তি ক্রয়। সপরিবার ভ্রমণ হতে পারে। শরীর অনেকটা সামলান যাবে।

কুম্ভ ঃ আর্থিক অচলাবস্থা খানিক সামলান যাবে; নতুন যোগাযোগ দ্রুত ফলপ্রসূ হতে পারে। কর্মস্থলে মানসিক চাপ সত্ত্বেও পরিকল্পনা মাফিক কাজের সুষ্ঠু রূপায়ণ। ব্যবসায়ীদের নৈরাশ্য। পারিবারিক ব্যাপারে সর্তকতা প্রয়োজন। সন্তানদের কোন বিরাট পরিবর্তন। মেয়েদের সৎ কাজে ব্যয়। শরীর মোটামুটি।

মীন ঃ আয় বাড়বে, তবে অল্প। ব্যয়ও হবে খুব সীমিত। কর্মক্ষেত্রে আপনার হিতৈষীদের সম্পর্কে সাবধান হোন। ব্যবসায়ীদের নতুন লগ্নীর ক্ষেত্রে বাধা। স্ত্রীর সঙ্গে নানা ব্যাপারে সমঝোতা। আপনার শরীর ও মেজাজ দুইই ভাল চলবে না।

কৃষ্ণা

মনের টনিক !



১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

কিশোর মন

মজাদার ভূতের সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভূত-ভূতুনির গল্প □ মায়া বসু

শুরু হল রোমাঞ্চকর রঙিন কমিকস

দানো মুখোস

এবং ধারাবাহিক উপন্যাস

এডগার রাইস বারোজ-এর অপরাজেয় সুপারহিরো

টারজন ফিরে এল

সুকুমার সেন-এর কৈশোরের মজার ঘটনা।

সুজন দাশগুপ্ত আমেরিকা থেকে পাঠাচ্ছেন

ধাঁধার ধন্ধ

ঘুড়ির নানা কথা

আকুপাংচার এক আজব চিকিৎসা

প্রচ্ছদ কাহিনী

সাত বাঘের গল্প

ভয়ঙ্কর বাঘদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য

রীতিমত লোমহর্ষক

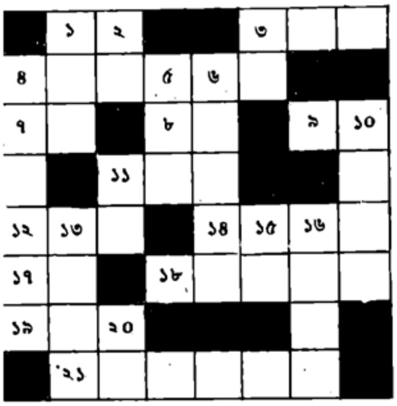
এছাড়াও সাড়া-জাগান ধারাবাহিক

আমার বাবা পি সি সরকার □ জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) ■ লস্ট আটলান্টিস ঃ দুহাজার বছরেও যে রহস্যের সমাধান হয়নি !

অনেক বেশি গল্প, কমিকস, লেখা

দাম ? মাত্র তিন টাকা

শব্দশৃঙ্খল—১৬৪



সূত্র ঃ পাশাপাশি

১। আকার পেল বর, পারলে শুয়োর ধর। ৩। সাগর জলে জাহাজ চলে, চালায় যারা তারা কারা? ৪। বিশাল আকাশ জুড়ে, উপগ্রহে চড়ে ঘোরে। ৭। অনেকে মিলে তৈরি করি, ফুলের মাঝে পাই পাপড়ি। ৮। গায়ের 'জোর' যদি চাহ, তবে হেথা কথা 'কহ'। ৯। ফল থেকে ফেলে খাই, আর কিছু নয় 'ছোবড়া'টাই। ১১। রাবণের আবদারে, সে রামের বাণে প্রাণে মরে। ১২। 'স্বর্ণমুদ্রা' যদি চাও, 'সিল' মেরে নিয়ে যাও। ১৪। 'লক্ষ্মণ' হিন্দি উচ্চারণে, ডাকলে পাবে এই খানে। ১৭। হইল হইতে ই গেলে, পাইতে পার 'লাঙলে'। ১৮। অরণ্যে তার বিচরণ, যশোদার প্রাণধন। ১৯। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা তার, '—' কান্তি কী বাহার। ২১। রবিবার সম্বন্ধীয়, সেই কথাটা বুঝে নিও।

সূত্র ঃ ওপর-নিচ

১। চাকরিতে 'নিযুক্ত' হবে, শেষে হাল খুঁজে পাবে। ২। আকাশে দেখ সে রাতে, চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমাতে। ৩। নরের তিনি, অর্ধাঙ্গিনী। ৪। কন্দর্প মুগ্ধকারী, মুরলী বাজায় বংশীধারী। ৫। প্রতীক্ষা যার রামের তরে, আজও লোকে স্মরণ করে। ৬। হাবভাব, কিংবা স্বভাব। ১০। সপ্ত লহরীর হারখানি, চাষীর বৌ চায় এখনি। ১১। তপস্যার বিঘ্নকারী, 'প্রহার' অর্থে ধরতে পারি। ১৩। 'বলরাম' ভাই, লাঙল ধরেছে তাই। ১৫। তুমি কি কেবলি '—' শুধু পটে লিখা। ১৬। মহান আশয় যার, সন্ধান পাবে তার। ২০। দিবাকর বা কবিবর।

সমাধান প্রকাশিত হবে পরিবর্তন ৯ অক্টোবর ৮৫ সংখ্যায়। সমাধানটি পরিবর্তন দপ্তরে অবশ্যই ৩০ সেপ্টেম্বর ৮৫-র মধ্যে পৌঁছতে হবে।

সমাধানের সঙ্গে পরিবর্তন-এ প্রকাশিত ছকটি (জেরক্স কপি নয়) অবশ্যই পাঠাতে হবে। বিভিন্ন সংখ্যার শব্দশৃঙ্খল একই খামে পাঠাবেন না। খামের ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। একটি খামে একজনই শব্দশৃঙ্খল পাঠাতে পারবেন।

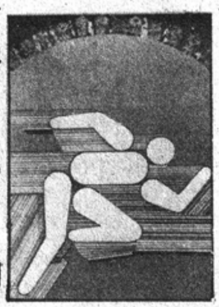
শব্দশৃঙ্খল-১৬০ (সমাধান)

প্রা	গৈ	তি	হা	সি	ক		পা
চী		লো		ত	র	বা	রি
ন	রো	ত্ত	ম		পু		শ্র
ত		মা	ল		ট	লে	মি
ম	ম		মা	ছি		শ	ক
	নি	বা	স		বৌ	মা	
আ	ব	রু		বা		ত্র	স্ত
লো		দ	হ	ন			ব

শব্দশৃঙ্খল-১৬০-এর জন্য সার্টিফিকেট পাবেন ঃ ১। কল্পনা পাল (কলকাতা-৫৪), ২। দুলালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (কলকাতা-১), ৩। দেবরাণী ভট্টাচার্য (কলকাতা-২৫), ৪। বাবুই মুখার্জি (গোন্দল পাড়া হুগলি), ৫। সুনীলকুমার সরকার (কলকাতা-১৩), ৬। কল্যাণকুমার মিত্র (কলকাতা-২৬), ৭। শান্তনু শঙ্কর দাস (কলকাতা-১২), ৮। নির্মল ঘোষ (হাওড়া-৬), ৯। রুমা চ্যাটার্জি (কলকাতা-২৭), ১০। অঞ্জনকুমার ভট্টাচার্য (কলকাতা-৭৫), ১১। নরেন্দ্র রঞ্জন মালস (রাসতলা পাড়া, বিষ্ণুপুর), ১২। জান্নাতুন খাতুন (বহড়ান, মুর্শিদাবাদ), ১৩। কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (কালীবাড়ি রোড, নিউ ব্যারাকপুর), ১৪। ভারতী বিশ্বাস (কলকাতা-২৭), ১৫। সুব্রতকুমার করণ (বাওয়ালী, ২৪ পরগণা), ১৬। টিটু ঘোষ (হাবড়া, ২৪ পরগণা), ১৭। নির্বাণ দাস (সে সি রি ট্রে ইন্সটিটিউট, বহরমপুর), ১৮। রেণুকা গোস্বামী (বেলারী, বর্ধমান), ১৯। অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়মিত্র পাড়া, কালনা), ২০। সুধাংশুশেখর রাউৎ (এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, মেদিনীপুর), ২১। বিমলকুমার গোস্বামী (রাণীগঞ্জ ৭১৩৩৪৭), ২২। জয়দেব মণ্ডল (কলকাতা-৮৯), ২৩। প্রবোধ দত্ত (মুরারই, বীরভূম), ২৪। কৃষ্ণদাস ঘোষ (রমেশ ব্যারাক,জলপাইগুড়ি)।

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ৭-১৩ আগস্ট '৮৫ সংখ্যার পরিবর্তন সঠিক সময়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছয়নি। তাই নির্ধারিত ২১ আগস্টের পরিবর্তে ২৬ আগস্ট অবধি যে সমস্ত প্রবেশপত্র আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে সঠিক উত্তরদাতাদের নামই এখানে প্রকাশ করা হল।

এবার অ-নে-ক বেশি
আকর্ষণীয়
শারদীয়
খেলার আসর



এবারেও থাকছে
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
আর একটি অনবদ্য উপন্যাস
গোলকিপার
মেয়ে ফুটবলারদের আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখকে ঘিরে লেখা ঐ উপন্যাস আলোড়ন তুলবেই।

●

উপন্যাস নয় কিন্তু উপন্যাসের মতই মর্মস্পর্শী কাহিনী লিখেছেন, অভিজ্ঞ পর্বতারোহন বিশেষজ্ঞ
ধ্রুব মজুমদার
যা তিনিই লিখতে পারেন। এবারে তার বিষয়—পাহাড় অভিযানে গিয়ে যারা শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারেননি, তাদের কয়েকজনের কথা।

ওদের ছেলেবেলার খেলাধুলো
একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতি সঞ্চয়ন। যাতে থাকবে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং যতীন চক্রবর্তীর ছেলেবেলার খেলাধুলোর কথা।
আরও একটি স্মৃতি
অনেকে জানেন না। জানলেও সবকিছু মনে রাখতে পারেননি উমাপতি কুমার। তবুও সেই প্রায় ভুলে যাওয়া যে কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন তার শিরোনাম
মোহন বাগানকে সেদিন হাত পা বেঁধে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল
এছাড়া অবশ্যই লিখছেন—চিরঞ্জীব, অতুল মুখার্জি, সুব্রত সরকার, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, আব্দুল তৌহীদ, রঘুনাথ রাউ, পবিত্র দাস, দীনবন্ধু আঢ্য, সুভাষ দত্ত, হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ দত্ত, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ ঘোষ এবং আরও অনেকে।
ছড়া লিখছেন—অমিতাভ চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নিতাই ঘোষ প্রমুখ।
দাম ঃ ১৬ টাকা
প্রকাশিত হবে মহালয়ার অনেক আগেই।
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, Telex 021-5092 IPPL IN.



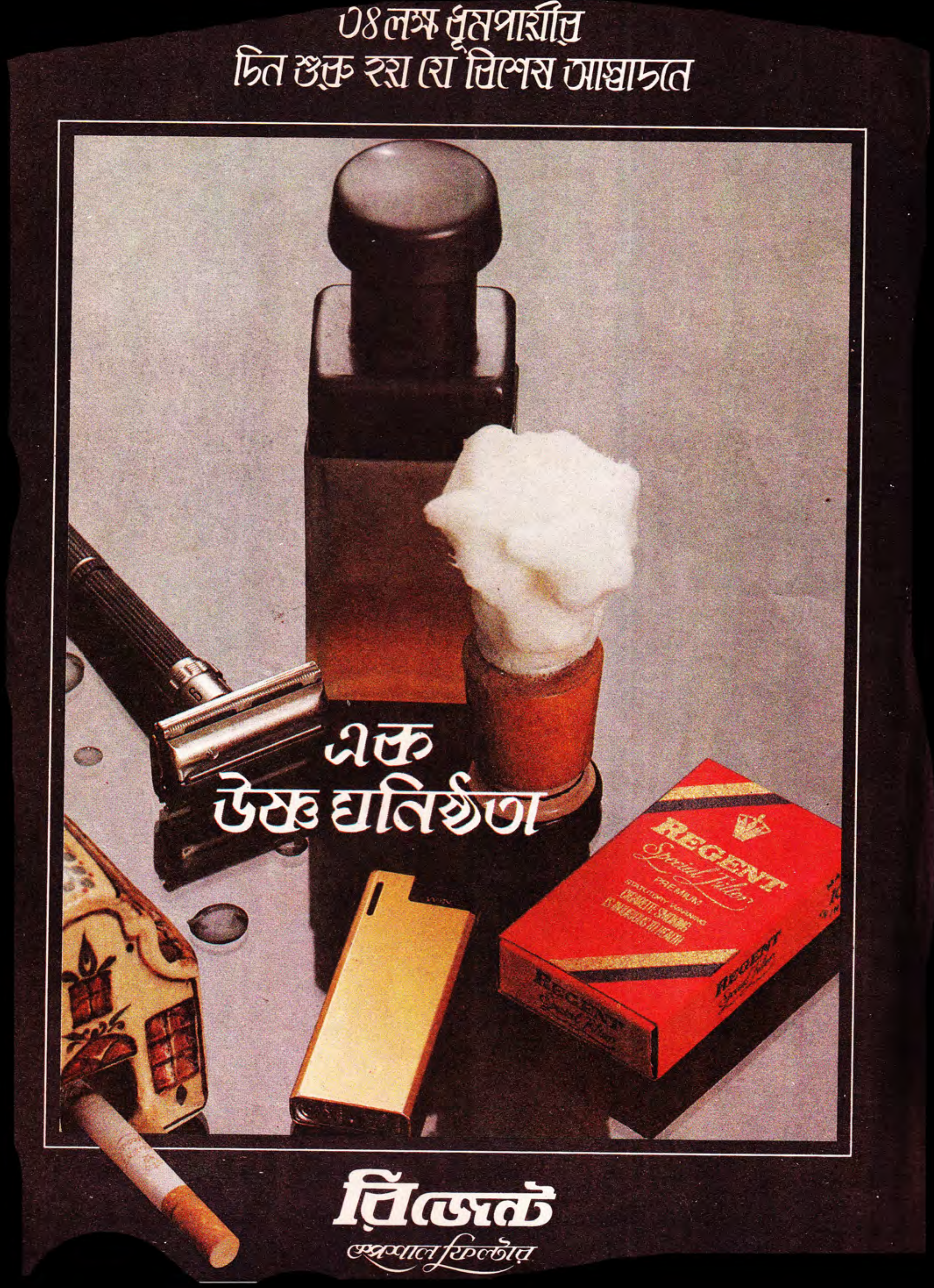
জ্যোতির্ময় ত্বক……এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল — আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ– কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2116 BG


৩৪ লক্ষ ধূমপায়ীর
দিন শুরু হয় যে বিশেষ আস্বাদনে
এক
উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা
REGENT
Special Filter
PREMIUM
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH
রিজেন্ট
স্পেশাল ফিল্টার